নিউজলেটার

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস ঢাকা-এর বুলেটিন

৪৩তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা
জানুয়ারি-জুন ২০২১ ইং
জমাদিউস সানি-জিলক্বদ ১৪৪২ হিজরি

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য
নূর হোসেন মজিদী
আবদুল মুকীত চৌধুরী
ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত
মোহাম্মদ আশিফুর রহমান
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
ড. আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

نیوزلتر بزرگسالان
نشریه رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در داکا
سال ۴۳، شماره ۱، ژانویه – ژوئن ۲۰۲۱
دی ۱۳۹۹– خرداد ۱۴۰۰

مدیر مسؤول وسردبیر :
دکتر سید حسن صحت
رایزن فرهنگی
سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکا

اعضای هیئت تحریریه :
نور حسین مجیدی
عبد المقیت چودری
دکتر سید حسن صحت
محمد آصف الرحمن
محمد سعید الاسلام
دکتر عبد القدوس بادشاه

মুদ্রণ : মাল্টি লিংক প্রিন্টার্স
৬৮, ফকিরাপুল, ইসলাম ভবন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১৯১৮১৮, E-mail : multilinkp@gmail.com

''যতদিন পর্যন্ত না 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' ধ্বনি সমগ্র পৃথিবীতে ধ্বনিত হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। পৃথিবীর যেখানেই জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম সেখানেই আমরা আছি।'' -ইমাম খোমেইনী (রহ.)

সূচিপত্র

- স্মরণীয় বাণী ▸▸ ০২
- সম্পাদকীয় ▸▸ ০৩
- ইমাম খোমেইনী (র.) ▸▸ ৪-১৫
  - ইমাম খোমেইনী : এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ▸▸ ০৪-৫
  - ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর ইসলামি বিপ্লব এখন অনেক বেশি শক্তিশালী : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ▸▸ ০৬
  - হযরত ইমাম খোমেইনী (র.)-এর চিন্তাধারায় মুস্তাক্বেরীন ও মুস্তায্'আফীন ▸▸ ০৭-১০
  - ইরানের ইসলামি বিপ্লবে ইমাম খোমেইনীর (র.) অবদান ▸▸ ১১-১২
  - ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ওয়েবিনার ▸▸ ১৩-১৫
- ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ▸▸ ১৬-৩১
  - ইসলামি বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ইসলামি ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থা ▸▸ ১৬-২০
  - ইসলামি বিপ্লবোত্তর ইরান : পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও অবস্থান ▸▸ ২১-২৭
  - করোনাভাইরাস মহামারিতে নওরোজে ভিন্ন আবহ ▸▸ ২৮-৩১
- আল-কুদ্স ▸▸ ৩২-৩৯
  - আল-কুদস দিবস, ইমাম খোমেইনী ও এবারের যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের বিজয় ▸▸ ৩২-৩৫
  - আন্তর্জাতিক আল-কুদ্স দিবস উপলক্ষে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত ▸▸ ৩৬-৩৯
- আদর্শ ▸▸ ৪০-৪৫
  - নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ▸▸ ৪০-৪৩
  - স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম ▸▸ ৪৪-৪৫
- অমর একুশে ও মাতৃভাষা ▸▸ ৪৬-৪৭
- সাহিত্য ▸▸ ৪৮-৮৩
  - শাহনামা কাব্যগ্রন্থ : আধ্যাত্মিকতা, প্রজ্ঞা ও আদর্শের সম্মিলন ▸▸ ৪৮-৫২
  - বাংলা সাহিত্য ফারসি রসে ঋদ্ধকরণে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান ▸▸ ৫৩-৫৬
  - শেখ সাদির কবিতার চিরন্তন আবেদন ▸▸ ৫৭-৬০
  - ফরিদ উদ্দিন আত্তার : ফারসি সাহিত্যে অধ্যাত্মচিন্তার আত্মা ▸▸ ৬১-৬৬
  - মাইকেল মধুসূদনের আত্মবিলাপ ▸▸ ৬৭-৬৯
  - পারভিন এতেসামির কাব্যে আধুনিকতা ও বিষয়বৈচিত্র্য ▸▸ ৭০-৭৪
  - ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় সংগীত * দিওয়ানে উবায়দি গযল নম্বর ৩০ * বিপ্লবের প্রতীক নিউজলেটার ▸▸ ৭৫
  - সভ্যতা বিনির্মাণে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানববিদ্যার ভূমিকা ▸▸ ৭৬-৮২
  - বই পরিচিতি ▸▸ ৮৩
- বাংলাদেশে ইরান স্টাডিজ : একটি পর্যালোচনা ▸▸ ৮৪-৮৫
- স্মরণীয় দিবস ▸▸ ৮৬

কিশোর নিউজলেটার সূচিপত্র

- সাহিত্য ▸▸ ৮৭-৯২
  - শিশু-কিশোরদের জন্য মহান আল্লাহর পরিচয় ▸▸ ৮৭
  - হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (সা.আ.) ▸▸ ৮৮-৮৯
  - পথিক ও ঘোড়সওয়ার ▸▸ ৯০
  - ছড়া কবিতা ▸▸ ৯১
  - রেডিও তেহরান ▸▸ ৯২

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা
বাড়ি নং-১৭, রোড নং-৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯৬১১৮৬৪, ৯৬১১৯৮৭
E-mail : dhaka.icro@gmail.com

স্মরণীয় বাণী

- মহানবী (সা.) এরশাদ করেন : 'কেউ যখন কল্যাণকর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে অথবা অন্যদেরকে তা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে তখন সে 'উমরাহ্‌র ও পূর্ণ হজ্বের প্রতিদান লাভ করবে।'
- হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) উত্তরাধিকারের আহ্‌কাম সম্বন্ধে এরশাদ করেন : 'তোমরা মীরাছ সংক্রান্ত বিষয়াদি শিক্ষা করো এবং তা লোকদেরকে শিক্ষা দাও। কারণ, আমি এ দুনিয়া থেকে চলে যাব.... এবং ফিতনাসমূহ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে মীরাছ সম্পর্কে মতপার্থক্য ঘটবে, কিন্তু তারা এমন কাউকে পাবে না যে তাদের মধ্যকার বিরোধের ফয়সালা করে দেবে।'
- রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : 'প্রতিটি মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয। অতএব, তোমরা এজন্য উপযুক্ত এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে তা শিক্ষা করো।'
- তিনি আরো এরশাদ করেন : 'যুল্ কারনাইনের ওয়াসীয়াত্‌সমূহের অন্যতম হচ্ছে এই : যে ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান থেকে কল্যাণ হাসিল্ করে নি তার কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করো না। কারণ, যার জ্ঞান তার নিজেকে কল্যাণ দান করে নি তা তোমাকেও কল্যাণ দান করবে না।'
- হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : 'প্রত্যুষে জাগরণ বরকতময় এবং তা সকল নে'আমত, বিশেষ করে রুযী নিয়ে আসে।'
- আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) এরশাদ করেন : 'হে মু'মিন! তোমার প্রাণের মূল্য হচ্ছে 'ইল্‌ম্ ও আদবে। অতএব, তা আয়ত্ত করার জন্য চেষ্টা করো। সুতরাং তোমার 'ইল্‌ম্ ও আদব যত বৃদ্ধি পাবে তোমার মূল্যও ততই বৃদ্ধি পাবে। কারণ, 'ইল্‌মের মাধ্যমে তুমি তোমার রবের দিকে অগ্রসর হবার পথ এবং আদবের মাধ্যমে উত্তমভাবে রবের খেদমত আঞ্জাম দিতে পারবে। আর খেদমতে এই আদবের মাধ্যমেই মানুষ বেলায়াত্ ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। অতএব, আমার নসীহত্ গ্রহণ করো, তাহলে আযাব থেকে রেহাই পাবে।'
- আমীরুল্ মু'মিনীন্ হযরত আলী (আ.) এরশাদ করেন : 'যুবক ও কিশোরদের জন্য শিক্ষণীয় সর্বোত্তম বিষয়গুলো হচ্ছে তা-ই বয়সকালে যা তাদের প্রয়োজন হবে।'
- হযরত ইমাম বাকের (আ.) এরশাদ করেন : 'আলসেমি দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।'
- হযরত ইমাম বাকের (আ.) এরশাদ করেন : 'আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নেয়ার ফলে আমলসমূহ পবিত্র হয়, সম্পদ বৃদ্ধি পায়, বালা-মুছীবত দূর হয়, হিসাব সহজ হয় ও মৃত্যু পিছিয়ে যায়।'
- হযরত ইমাম বাকের (আ.) আরো এরশাদ করেন : 'চারটি কাজের জন্য দ্রুত শাস্তি দেয়া হয় : ... এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণ।'
- হযরত ইমাম বাকের (আ.) এরশাদ করেন : হযরত মূসা বিন্ 'ইমরান্ (আ.) তিনবার আল্লাহ্‌র কাছে আরয করেন : 'হে আমার রব! আমাকে নসীহত করো।' পরম প্রমুক্ত আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বারই এরশাদ করেন : 'আমি তোমাকে আমার ব্যাপারে নসীহত করছি।' এরপর মূসা (আ.) আবার আরয করলেন : 'হে আমার রব! আমাকে নসীহত করো।' আল্লাহ্ এরশাদ করেন : 'তোমাকে তোমার মায়ের ব্যাপারে নসীহত করছি।' এরপর মূসা (আ.) আবার আরয করলেন : 'হে আমার রব! আমাকে নসীহত করো।' আল্লাহ্ এবারও এরশাদ করেন : 'তোমাকে তোমার মায়ের ব্যাপারে নসীহত করছি।' এরপর মূসা (আ.) আবার আরয করলেন : 'হে আমার রব! আমাকে নসীহত করো। এবার আল্লাহ্ এরশাদ করেন : 'তোমাকে তোমার পিতার ব্যাপারে নসীহত করছি।' ইমাম বাকের (আ.) বলেন : 'এ কারণেই বলা হয় যে, কল্যাণের অধিকার দুই তৃতীয়াংশ মাতার ও এক তৃতীয়াংশ পিতার।'
- ইমাম জাফর সাদিক (আ.) এরশাদ করেন : 'অকর্মণ্য হয়ো না যাতে তোমাকে যারা চেনে তারা তোমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে।'
- হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (আ.) এরশাদ করেন : 'রোগীর জন্য সাত দিনের বেশি পরহেয (চিকিৎসা না করানো) কল্যাণকর নয়।'
- হযরত ইমাম রেযা (আ.) এরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি তার পাকস্থলীকে কষ্ট দিতে চায় না সে যেন খাওয়ার মাঝখানে বা পর পরই পানি পান না করে, বরং যেন খাওয়ার কিছু পরে পানি পান করে। যে তা করে (খাওয়ার মাঝে বা পর পরই পানি পান করে) তার শরীরে ঠাণ্ডা ভাব তৈরি হয় এবং তার পাকস্থলী দুর্বল হয়ে যায় এবং তার রগসমূহ খাবার থেকে (ঠিকমতো) শক্তি সংগ্রহ করতে পারে না।'
- হযরত ইমাম রেযা (আ.) এরশাদ করেন : 'লোকেরা যখন প্রথম বারের মতো কোনো গুনাহ্‌র কাজ করে যা সে অতীতে করে নি তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নতুন ও অভূতপূর্ব সমস্যার কবলে নিক্ষেপ করেন।'
- হযরত ইমাম রেযা (আ.) এরশাদ করেন : 'ফুটানো পানি সবকিছুর জন্যই উপকারী এবং তাতে কোনোই ক্ষতি নিহিত নেই।'

(মাফাতীহুল্ হায়াত্ গ্রন্থ থেকে সংকলিত)
অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

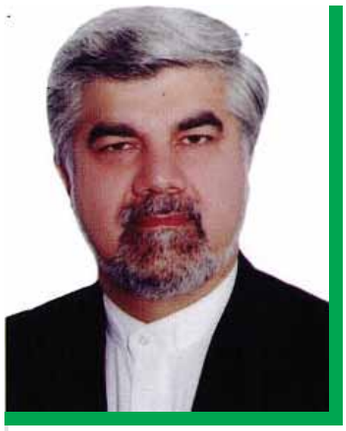

সম্পাদকীয়

ইমাম খোমেইনী (র.): যুগান্তকারী বিপ্লবের নেতা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

প্রত্যেক বছর খোরদাদ মাসের মাঝের তারিখটি (৪ জুন) মহান ইরানি জাতিকে এবং একই সাথে বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষকে এক অশেষ দুঃখ ও শোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ভোলার নয়। এই শোক এমন একজন মহান, সাহসী ও শক্তিশালী নেতাকে হারানোর শোক– যিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইরানি জাতিকে আড়াই হাজার বছরের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও বিজাতীয় আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অত্যন্ত রূঢ় বাস্তবতা ছিল এই যে, মহান ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বে ইরানের বুকে এমন এক সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল সংক্ষেপে যার চেতনা ছিল 'আমরা পারব না– আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' অর্থাৎ মনে করা হতো যে, পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভর করা ব্যতীত আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা– যিন্দেগী যাপন করা সম্ভব নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শাহী ইরানের সরকারি কর্তাব্যক্তিরা এমনকি দেশী বিশেষজ্ঞদেরকে শিল্পোৎপাদনের অনুমতি পর্যন্ত দিত না। ইসলামি বিপ্লব ইরানি সমাজে বিরাজমান সংস্কৃতির ও তার ভূমিকার ওপর বিরাট ও সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামি বিপ্লব ইরানি জনমনে এ প্রত্যয় সৃষ্টি করে যে, কোনো জাতিকে যা পরিবর্তন করে তা হচ্ছে তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এ কারণে হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) যে বিপ্লবে নেতৃত্ব প্রদান করেন তিনি সে বিপ্লবকে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি আত্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় ঈমানী চেতনা সহকারে মহান ইরানি জাতিকে তার স্বকীয় প্রকৃতির দিকে দিকনির্দেশ করেন।

এ কারণে ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর বিগত ৪২ বছরে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান কৃষি ও শিল্প সহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সামরিক, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি সহ অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে যে নজিরবিহীন উন্নতির অধিকারী হয়েছে তা হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) কর্তৃক ইরানি জাতিকে আত্মপরিচিতি ও আত্মবিশ্বাসে উৎসাহিতকরণের নিকট ঋণী।

হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) সাংস্কৃতিক বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন অসুস্থ সংস্কৃতি, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও পরনির্ভরশীলতার সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান করেন, তেমনি সঠিক সংস্কৃতিকে ঐশী সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করেন এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ওপরে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ব্যবহার, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক চিন্তার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর বার বার জোর গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) ভাষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার হেফাযত এবং নিজেদের ভাষায় বিজাতীয় পশ্চিমা শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার পরিহার করার জন্য তাকীদ করতেন। তিনি দেশী ভাষাসমূহে বিজাতীয় পশ্চিমা শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করাকে জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বরখেলাফ বলে গণ্য করতেন ঠিক যেভাবে আপনারা বাংলাদেশী জনগণ মাতৃভাষার হেফাযত ও মর্যাদার লক্ষ্যে অভ্যুত্থান করেছিলেন।

হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে এবং সাধারণ শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও দ্বীনী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ সহ সমাজের সংস্কৃতি বিনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে কোনো সমাজের সংশোধন ও সংস্কারের পথ ও মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতেন।

হযরত ইমাম খোমেইনীর দৃষ্টিতে স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস, আধিপত্য মেনে না নেয়া, সভ্যতা সৃষ্টিকারী বস্তুগত ও আত্মিক-মানসিক উন্নয়ন ও মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সম্মানবোধ– এগুলো হচ্ছে সংস্কৃতির প্রধান ও অপরিহার্য উপাদান।

হযরত ইমামের (র.) চিন্তাধারার মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর ঐশী সাংস্কৃতিক চিন্তা। তিনি সর্বাবস্থায় এদিকে দৃষ্টি রাখতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কী পছন্দ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের দাবি কী। এছাড়া তিনি সমাজের দুর্বল ও বঞ্চিত মুস্তায্'আফ্ শ্রেণির লোকদেরকে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করাকে অপরিহার্য কর্তব্য বলে গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করতেন এবং সব সময় এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন।

হযরত ইমাম খোমেইনীর (র.) ইন্তেকালের এ দুঃখজনক উপলক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের মসলিম ও মুস্তায্'আফ্ জনগণের প্রতি, বিশেষ করে নিউজলেটারের পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং এ মহান ইমামের বিদেহী নাফ্সের কল্যাণের জন্য দো'আ করছি; আমাদের এ প্রিয় নেতাকে জান্নাতের সমুন্নত ধামে স্থান দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। সেই সাথে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শুকরিয়া জানাচ্ছি যে, ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনীর (র.) ইন্তেকালের পর ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে হযরত ইমামের (র.) যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বর্তমান মহান রাহ্বার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর ন্যায় নেতৃত্ব লাভ করেছে– যিনি হযরত ইমামের (র.) প্রদর্শিত পথের ধারাবাহিকতাকে যথাযথভাবে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত
কালচারাল কাউন্সেলর
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস
ঢাকা, বাংলাদেশ ।

ইমাম খোমেইনী : এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

بسم الله الرحمان الرحيم

ثم الصّلاه و السّلام على سيّدنا و نبيّنا محمد صلى الله عليه و آله اجمعين

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

«و لقد كتبنا فى الزبورِ من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون»

অর্থাৎ আমি তাওরাতের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।

প্রথমে আমি সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সুধীমণ্ডলীর প্রতি সালাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যাঁরা ইসলামের গৌরব-মাহাত্ম্য, ইরানের ইসলামি বিপ্লব ও এর সুযোগ্য নেতা ইমাম খোমেইনী (র.)-কে হৃদয়ে ধারণ করেন।

প্রিয় বন্ধুরা! ফারসি মাসের ১৩ই খোরদাদ মোতাবেক ৩রা জুন এক অনবদ্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় প্রত্যয়ী আরেফ, মুক্তিকামী মানুষের নেতা, খোদাভীরু চিন্তাবিদ অর্থাৎ ইমাম খোমেইনী (র.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী। আজ থেকে বত্রিশ বছর আগের এমন এক দিনে শতাব্দীর বৃহত্তম বিপ্লবের নেতা–যাঁর নাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দাম্ভিক শক্তিগুলোর মনে কম্পন সৃষ্টি করতো–মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে এই ইহধাম ত্যাগ করেন।

একজন আদর্শবাদী জনপ্রিয় ইমাম, যিনি ছিলেন সদা জাগ্রত এক মহান নেতা, মুক্তি ও স্বাধীনতা এবং এই শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্বের জাগরণের অগ্রদূত, তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা বা বলা সত্যিই খুব কঠিন। আমি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দুঃখভারাক্রান্ত মনে এই দিনটিকে স্মরণ করছি এবং এই দিন উপলক্ষে বাংলাদেশের মুসলিম ভাই-বোনদের উদ্দেশে কিছু কথা বলার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রিয় বন্ধুরা! মহান ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন তাঁদের স্মৃতি-আদর্শের কথা সাধারণত মানুষ বছরের বিশেষ কোনো দিন, বিশেষ করে তাঁদের মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করে থাকেন। কিন্তু ইমাম খোমেইনী (র.) ছিলেন নিজেই একটি ইতিহাস এবং কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব।

তিনি এমন এক চরিত্র যা শাশ্বত ও চিরন্তন। সুতরাং মুক্তিকামী জাতিগুলোর চিন্তা-চেতনার জগতে ইমাম খোমেইনীর নাম সর্বদা জীবন্ত ও অম্লান হয়ে আছে। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা মিখাইল গর্বাচেভও ইমাম খোমেইনীর দূরদর্শিতা ও চিন্তার সর্বজনীনতার কথা স্বীকার করেছেন।

ইমাম খোমেইনী (র.) ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ, যিনি ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, ইরফান এবং রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন এক রসায়ন তৈরি করেছিলেন যার স্বাদ মানুষ এর আগে কখনই পায়নি। ইমাম খোমেইনী ছিলেন তৎকালীন সময়ের অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি বস্তুবাদ ও ধর্মবিদ্বেষের যুগে ধর্মের পুনর্জাগরণের পতাকা উড্ডয়ন করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী এতটাই আলোড়ন তৈরি করেছিলেন যে, এই শতাব্দীর সাথে তাঁর পবিত্র নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

ইমাম খোমেইনী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব কেবল ইরানের ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি ছিলেন গোটা মানবজাতি এবং মুসলিম বিশ্বের অমূল্য সম্পদ।

সম্মানিত উপস্থিতি! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইরানের ইসলামি বিপ্লব বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিস্মরণীয় একটি ঘটনা। যেই বিপ্লব ইসলামের জন্য স্বর্ণযুগ বয়ে এনেছে এবং মুসলমানদের জন্য পরিণত হয়েছে অনুকরণীয় আদর্শে। এই বিপ্লব পথহারা মুসলমানদেরকে দিয়েছে পথের দিশা, এভাবে এই বিপ্লব ঠাঁই করে নিয়েছে সত্যসন্ধানীদের হৃদয়ের গভীরে। বর্তমান প্রজন্মের যারা ইমাম খোমেইনীকে চিনতে বা বুঝতে সক্ষম হয় নি তাদের জন্য ইমাম খোমেইনীর উন্নত চিন্তাদর্শের সাথে পরিচিত হওয়া খুবই দরকার। ইমাম খোমেইনী (র.) ইসলামের যে শিক্ষা এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা 'মুহাম্মাদি ইসলামের' পূর্ণ রূপ, এটি অবশ্য অন্যান্য প্রচলিত ব্যাখ্যার চেয়ে পৃথক। তিনি বিমর্ষ ও মৃতপ্রায় ইসলামকে পুনরায় বিপ্লবী ইসলামে পরিণত করেন। এই মহান ও অলৌকিক কাজটি সাধন করা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য ও তাওফিক ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! ইমাম খোমেইনী কে ছিলেন? তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি নতুন বিশ্ব বিনির্মাণের বিষয়ে গভীরভাবে এবং নিবিড়ভাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর কর্ম ছিল নবীদের প্রয়াসেরই পুনরাবৃত্তি। যিনি ইবরাহীম (আ.)-এর মতো প্রতিমা (তাগুতিশক্তি) ভেঙ্গেছেন, যিনি মসিহ রুহুল্লাহর উদ্যম নিয়ে উম্মতকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছেন। যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতো আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ছিলেন সাথি-সঙ্গীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সদয় ও স্নেহশীল। আর আল্লাহর দ্বীনের শত্রুদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনমনীয় এবং অত্যন্ত

কঠোর। তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর চিন্তা ও দিকনির্দেশনা শুধু তাঁর জীবদ্দশায় নয়; বরং তাঁর মৃত্যুর পরও সমস্যার জট খুলতে সাহায্য করছে। যিনি ইমান ও ইখলাসের সাথে এবং অঙ্গুলির ইশারায় বিশ্বের বড় একটি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মীয় মাদ্রাসার মধ্যে পুনর্মিলন ও প্রীতির সম্পর্ক গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বিভিন্ন ধর্ম ও মাজহাবের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পথিকৃৎ। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি দর্শনশাস্ত্রের সাথে ইরফান ও নীতিশাস্ত্রেরও সম্মিলন ঘটিয়েছেন। তিনি ছিলেন জনহিতৈষী এবং মনে করতেন জনগণই সকল সম্পদের মালিক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি জনগণকে নিজের স্বার্থে অপব্যবহার করেন নি।

ইমাম খোমেইনী (র.)-এর বিপ্লবী চিন্তাদর্শ জীবন্ত ও অমর এবং তাঁর অনুপ্রেরণামূলক কথা ইরানের জনগণ ও বিশ্বের মুসলমানদের সতত অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ইমাম খোমেইনী (র.)-এর জীবনাদর্শে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার খোরাক রয়েছে। বিশ্বের সব অঞ্চলের মুসলিম জাতিগুলো যদি এই আধ্যাত্মিক নেতার দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে হাতে হাত রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

প্রিয় বুদ্ধিজীবিগণ! ইমাম খোমেইনী (র.)-এর কর্ম ও চিন্তাদর্শ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত মূল্যবান কাজ, তবে ইমাম খোমেইনীর মতাদর্শ গ্রন্থাগারে ফেলে রাখা গুরুত্ব বহন করতে পারে না।বর্তমান সময়ে ইমাম খোমেইনীর চিন্তাদর্শ সংরক্ষণ করা আমাদের বড় সাফল্য, শত্রুরা যা বছরের পর বছর ধরে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে। ইমাম খোমেইনীর স্মরণসভাগুলো প্রকৃতপক্ষে এই আধ্যাত্মিক নেতার চিন্তাদর্শ ও আলোকিত পথনির্দেশনা সংরক্ষণের একটি উপায়। বর্তমান সময়ে মুসলিম যুবকদেরকে ইমাম খোমেইনীর জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত করানো উচিত। ইসলামি বিপ্লবের ইশতেহার হিসেবে বিবেচিত ইমাম খোমেইনীর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হওয়া বর্তমান সময়ে বিশ্বের সকল বুদ্ধিজীবী ও আলেমের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হতে পারে। ইমাম খোমেইনীর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে না পারলে ইসলামি বিপ্লবকে সঠিকভাবে বুঝা অসম্ভব।

ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী যথার্থই বলেছেন, 'ইমাম খোমেইনীর নাম ছাড়া এই বিপ্লবকে পৃথিবীর কোথাও কেউ চেনে না।'

সবশেষে আমি বলতে চাই, আমাদের এখন ফিরে যাওয়া দরকার ইমাম খোমেইনী (র.)-এর যুগে– যে যুগের পতাকাটি এখন উড়ছে স্বাধীনচেতা, আধুনিক ইসলামি আইনবিদ (ফকিহ), নির্ভীক ও বিচক্ষণ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ীর হাতে।

ইমাম খোমেইনী (র.) এবং মুক্তি সংগ্রাম ও ইসলামি বিপ্লবের মহান শহিদদের আত্মার উদ্দেশ্যে সালাম ও দরুদ পেশ করছি এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[ইমাম খোমেইনী (র.)-এর ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৩ জুন ২০২১ ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত ওয়েবিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের মহামান্য রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ রেজা নাফারের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য]

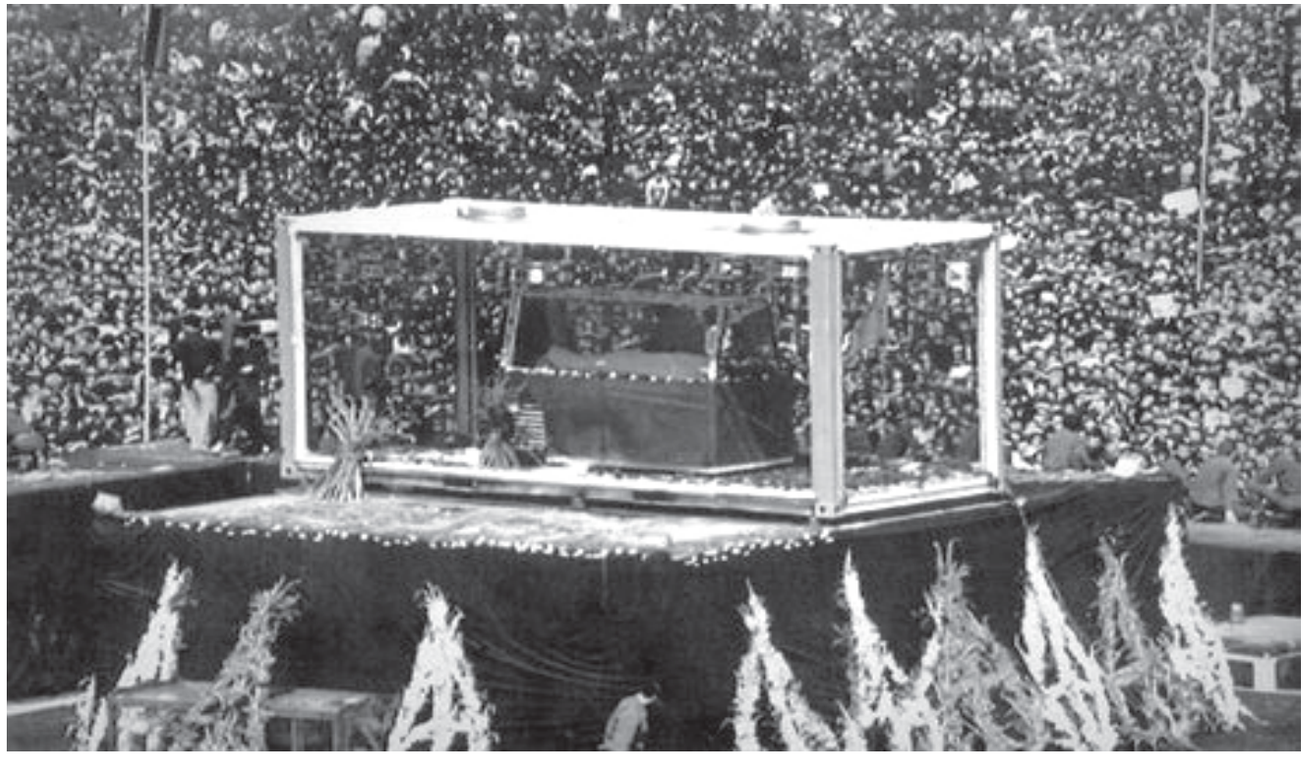

ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর ইসলামি বিপ্লব এখন অনেক বেশি শক্তিশালী : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের রূপকার ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৪ জুন রেডিও-টিভিতে সরাসরি ভাষণে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে এই দু'টি শব্দ : ইসলামি ও প্রজাতন্ত্র। হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.) মহান ও বিশাল যে কাজটি করেছেন তা হলো ইসলামি প্রজাতন্ত্রের তত্ত্ব উদ্ভাবন এবং তা বাস্তবায়ন। তাঁর এই তত্ত্বের ভিত্তি হলো পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও জনগণ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, গত এক-দুই শতাব্দীতে যেসব রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে আর কোনো ব্যবস্থার পতনের বিষয়ে এত বেশি পূর্বাভাস করা হয়নি যেমনটি করা হয়েছে ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিষয়ে।

তিনি বলেন, ইসলামি বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই এর বিরোধীরা যারা এই বিপ্লবকে সহ্য করতে পারছিল না তারা বলছিল এই বিপ্লব দু'মাস, ছয় মাস বা এক বছরের বেশি স্থায়ী হবে না। এক বা দু'বছর আগে আমেরিকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও বলেছিলেন যে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সুযোগ হবে না। কিন্তু আল্লাহর রহমতে ইমাম খোমেইনীর বিপ্লব ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন হয়নি; বরং তা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন আরও বেশি শক্তিশালী হচ্ছে।

এই বিপ্লব সব বাধা অতিক্রম করে অনেক বড় বড় সাফল্য এনে দিয়েছে বলে সর্বোচ্চ নেতা মন্তব্য করেন।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আসন্ন নির্বাচনে সবাইকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রত্যেকের উচিত নির্বাচনে অংশগ্রহণকে নিজের ওপর অর্পিত একটি দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা এবং নিজে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও পরামর্শ দেওয়া।

একই সঙ্গে প্রার্থীদেরকে পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চোরাচালান ও মাত্রাতিরিক্ত আমদানি ঠেকানোর বিষয়ে নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মনে করতে হবে। তাদেরকে এখন প্রতিশ্রুতিগুলো সুস্পষ্ট করতে হবে যাতে নির্বাচনে বিজয়ের পর প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে নজরদারির দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো জবাবদিহির সম্মুখীন করতে পারে।

হযরত ইমাম খোমেইনী (র.)-এর চিন্তাধারায় মুস্তাক্‌বেরীন ও মুস্তায্‌'আফীন

নূর হোসেন মজিদী

"মুস্তাক্‌বেরীন্" (مستكبرين) ও "মুস্তায্‌'আফীন্" (مستضعفين) কোরআন মজীদে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের অন্যতম। এ দু'টি পরিভাষা যথাক্রমে كبر (বড়ত্ব, অহঙ্কার) ও ضعف (দুর্বলতা) ক্রিয়ামূল (মাছ্দার্) থেকে নিষ্পন্ন। مستكبرين ও مستضعفين ছাড়াও উভয় ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন আরো বিভিন্ন শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ কোরআন মজীদের অনেকগুলো আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআন মজীদের শুরুর দিকেই ইব্‌লীস্ কর্তৃক হযরত আদমকে ('আ.) সিজ্‌দাহ্ না করার কারণ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে :

أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

'সে অস্বীকার করল ও অহঙ্কার প্রদর্শন করল; বস্তুত সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' (সূরা আল্-বাক্বারাহ্ : ৩৪)

এখানে যে اسْتَكْبَرَ ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে যার ক্রিয়ামূল (মাছ্দার্) হচ্ছে استكبار (ইস্তিক্‌বার্ – যা كبر থেকে নিষ্পন্ন) এবং এর কর্তাবাচক বিশেষ্য (ইস্‌মে ফা'এল্) مستكبر (বহুবচনে مستكبرون ও مستكبرين) – যার ব্যবহারিক তাৎপর্য 'দাম্ভিক' ও 'বলদর্পী' (অমার্জিত ভাষায় বললে 'মাস্তান্')।

আর ضعف ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন استضعاف -এর কর্মবাচক বিশেষ্য (ইস্‌মে মাফ্'উল্) مستضعف মানে 'দুর্বলকৃত/ যাকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে' (বহুবচনে مستضعفون ও مستضعفين)। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং মুস্তায্‌'আফীনের জন্য ....?' (সূরা আন্-নিসা' : ৭৫)

কোরআন মজীদে "মুস্তাক্‌বেরীন্" ও "মুস্তায্‌'আফীন্" পরিভাষা এবং অভিন্ন মূল থেকে নিষ্পন্ন বিভিন্ন ক্রিয়াপদ ও বিশেষ্য অনেকগুলো আয়াতে ব্যবহৃত হলেও এ বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) যেভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন তাঁর পূর্বে অন্য কোনো ইসলামি মনীষী সে ধরনের দৃষ্টি দিয়েছেন বলে জানা যায় না। বস্তুত ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের আগে-পরে সব সময়ই ইমামের বাণী ও ভাষণে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং "মুস্তাক্‌বেরীন্" ও "মুস্তায্‌'আফীন্" কা'রা, তাদের ভূমিকা কী, এ দু'টি শ্রেণির উদ্ভবের পিছনে নিহিত কারণ ও এ থেকে মানব প্রজাতির মুক্তির পন্থা কী সে সম্পর্কে তিনি বিশ্লেষণাত্মক মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা একটি গ্রন্থ রচনার

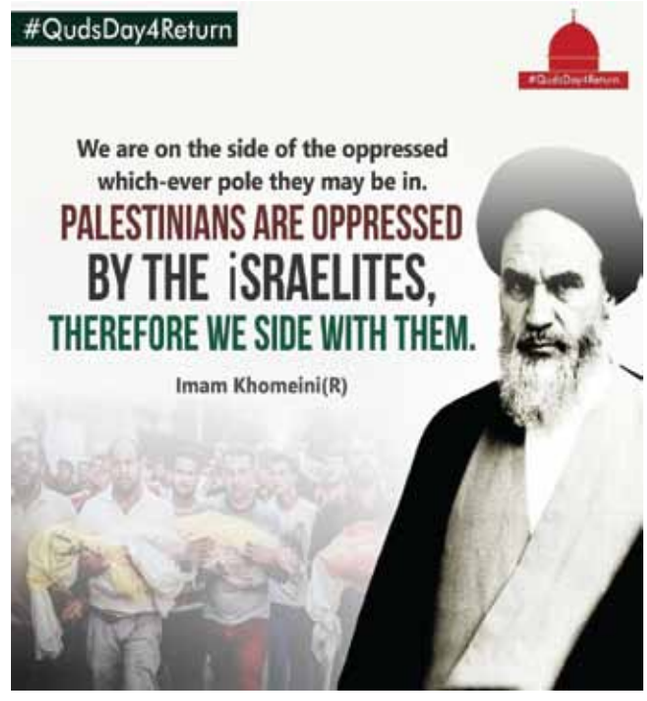

দাবি রাখে; এখানে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব।

সংক্ষেপে বলতে গেলে হযরত ইমামের দৃষ্টিতে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বিশেষে মুস্তাক্‌বেরীন্ হচ্ছে তারা যারা অন্যায়ভাবে ও জবরদস্তি করে সাধারণ জনগণের ওপর নিজেদের শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য চাপিয়ে দেয় এবং তাদেরকে শোষণ করে, প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে ও সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধা একচ্ছত্রভাবে ভোগ করে, অন্যদিকে মুস্তায্‌'আফীন্ হচ্ছে শোষিত-বঞ্চিত ও আধিপত্য কবলিত জনগণ – ক্ষেত্রবিশেষে যারা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপায়-উপকরণ থেকেও বঞ্চিত।

হযরত ইমামের (র.) দৃষ্টিতে মুস্তাক্‌বের্ হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে যাওয়া ও তার পরিবর্তে শয়তানের ও নাফ্‌সের পূজারী হওয়া। এ কারণেই তারা অন্যদের বিরুদ্ধে অন্যায়-অপরাধ ও যুলুম-শোষণের আশ্রয় নেয় এবং সমাজে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ কারণেই – আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার কথা ভুলে যাবার কারণেই – তারা অহঙ্কার ও

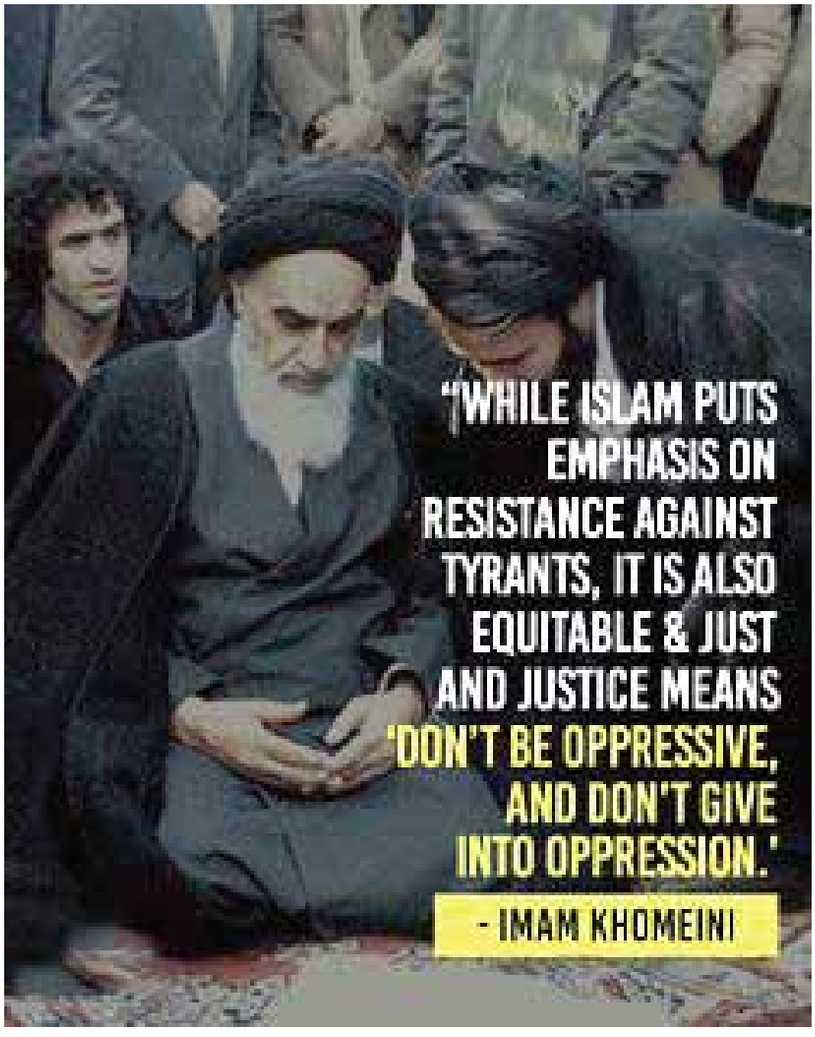

দাম্ভিকতার আশ্রয় নেয়। তারা তাদের সৃষ্ট যুলুমমূলক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে, বিশেষত তাদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণিতে বিভক্ত করে, স্বীয় পদতলে দাবিয়ে রেখে মুস্তায্'আফীনে পরিণত করেছে। অবশ্য স্বয়ং মুস্তাক্বেরীন্-এর মধ্যে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি রয়েছে, কিন্তু তাদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুলুম-শোষণ। অন্যদিকে মুস্তায্'আফীন্ শ্রেণির লোকেরা সাধারণত সৎ ও খোদাভীরু। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের সকলের অবস্থা এক রকম নয়, তবে সকলের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাদের সকলেই কম-বেশি মযলূম, শোষিত ও বঞ্চিত।

হযরত ইমামের মতে, যদিও কোরআন মজীদের উল্লেখ অনুযায়ী মানব প্রজাতির ইতিহাসে সব সময়ই মুস্তাক্বেরীন্ ও মুস্তায্'আফীনের অস্তিত্ব ছিল তবে মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহে উপনিবেশবাদীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়।

ইমাম খোমেইনী (র.) তাঁর এতদবিষয়ক মতামতে বিশেষভাবে ইসলামি বিপ্লব-পূর্ব ইরানি সমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করেন – যা থেকে বিশ্বের সকল দেশের অবস্থা সম্পর্কেই কম-বেশি ধারণা মেলে। তিনি সম্পদ ও ক্ষমতাকে মুস্তাক্বেরীনের ব্যবহৃত দু'টি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেন; একদিকে সম্পদ ক্ষমতায় উপনীত হওয়ার তথা ক্ষমতা ক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, অন্যদিকে ক্ষমতা সম্পদ হস্তগতকরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে সম্পদ ও ক্ষমতা একটি শ্রেণির কুক্ষিগত হয়ে যায়, অন্যদিকে ব্যাপক জনগণ শুধু ক্ষমতাহীন ও দরিদ্রই নয়, বরং সরকারি ব্যয়ে শিক্ষা লাভ ও সরকারি চাকরি থেকে শুরু করে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়; কেবল ব্যতিক্রম হিসেবে অসাধারণ প্রতিভার কারণে বা ঘটনাক্রমে সাধারণ মানুষের মধ্যকার কিছু লোক নিজেদেরকে উপরে তুলতে সক্ষম হয়।

ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বে সুযোগ-সুবিধার বিচারে ইরানি জনগণ সাধারণভাবে মোটামুটি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল : (১) শাহের পারিষদবর্গ ও তাঁবেদার গোষ্ঠী, পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ, বিদেশী (প্রধানত আমেরিকান) পুঁজি বিনিয়োগকারিগণ ও দেশী পুঁজিপতিগণ, (২) সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী, ছোটখাট ভূমি-মালিক ও পেশাজীবীসহ মধ্যবিত্ত শ্রেণি, (৩) কৃষিশ্রমিক, কারখানা-শ্রমিক, ক্ষুদ্র চাষী, বস্তিবাসী ও ঝুপড়িবাসীসহ সুবিধাবঞ্চিত ব্যাপক সাধারণ জনগণ।

হযরত ইমাম (র.) এর আলোকে সেই যুগে মুসলিম জাহানের অবস্থা সম্পর্কে বলেন : 'উপনিবেশবাদীরা জনগণের ওপর চেপে বসা তাদের রাজনৈতিক এজেন্টদের মাধ্যমে যুলুমমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে এবং এর ফলে জনগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে : যালেম ও মযলূম। একদিকে শত শত মিলিয়ন মুসলমান ক্ষুধা ও বঞ্চনা কবলিত, অন্যদিকে ধনী ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী স্বল্পসংখ্যক লোক ভোগ-বিলাসিতা, অপচয় ও পাপাচারে নিমজ্জিত। মযলূম বঞ্চিতরা সব সময়ই এই মুষ্টিমেয় সংখ্যকের আধিপত্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু যুলুমমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুক্তির পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে।'[১]

শাহের তথাকথিত সংস্কার পরিকল্পনার সমালোচনায় হযরত ইমাম (র.) বলেন : 'শাহ্ .... দেশের শিল্পায়নের বাহানায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে দেশী-বিদেশী পুঁজিবিনিয়োগকারীদের জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছে, ... আর এখন দেখতে পাচ্ছি, সরকারের

তাঁবেদার ইরানের সেই বড় বড় ভূমি-মালিকরা বিরাট বিরাট কারখানার মালিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।'[২] তিনি আরো বলেন : 'আমেরিকান পুঁজিপতিরা ইরানকে শোষণের উপযোগী সর্বোত্তম জায়গা হিসেবে গণ্য করে এবং বিভিন্নভাবে ইরানে তাদের পুঁজি ঢেলে দিয়েছে।'[৩] হযরত ইমাম (র.) সেই সাথে এদের সহযোগী জমিদার, ভূমিদস্যু, সরকারের তাঁবেদার, মাস্তান ও যারা বসে বসে অন্যদের শ্রমের ফল ভোগ করে তাদের কথাও উল্লেখ করেন।[৪]

ইমাম খোমেইনী তাঁর অন্তিম বাণীতে সারা দুনিয়ার মুস্তাক্‌বেরীন্ ও মুস্তায্‌'আফীনের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন : 'অন্তত বিগত একশ বছরে – যখন পর্যায়ক্রমে সকল মুসলিম-অধ্যুষিত দেশে ও অন্যান্য ছোট দেশে বিশ্বভুক বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রবেশ ঘটে – আমরা ও আপনারা প্রত্যক্ষ করেছি বা সঠিক ইতিহাস আমাদেরকে জানিয়েছে যে, এসব দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো সরকারই স্বীয় জাতির মুক্তি, স্বাধীনতা ও কল্যাণের চিন্তা করে নি ও করছে না; বরং তাদের প্রায় সকলেই স্বীয় জনগণের ওপর যুলুম ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে এবং তারা যা কিছুই করেছে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে এবং ধনিক ও বালাখানাবাসীদের জন্য করেছে; ঝুপড়িবাসী ও বস্তিবাসীরা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য সমস্ত উপকরণ থেকে, এমনকি পানি, রুটি ও কোনোমতে বেঁচে থাকার উপযোগী পুষ্টি থেকেও বঞ্চিত থেকে যায়, আর এই হতভাগাদেরকে ধনিক ও বিলাসী শ্রেণির স্বার্থে কাজে খাটানো হয়।'[৫]

ইমামের দৃষ্টিতে শক্তিশালী সরকারগুলো তাদের তাঁবেদার স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সকল জাতির সমস্ত জনগণকে মুস্তায্‌'আফে পরিণত করেছে। তিনি বিশেষভাবে ইসলামি বিপ্লব-পূর্ব ইরানের অবস্থা সম্পর্কে এক কথায় বলেন যে, শাহী সরকার ওলামা, গ্রামবাসী ও অন্যান্য শ্রেণির লোক নির্বিশেষে সর্ব স্তরের জনগণকে তার হুকুমবরদার হিসেবে গণ্য করত।[৬] তিনি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে মুস্তায্‌'আফ্ হিসেবে গণ্য করেন।[৭]

হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) তাঁর বিভিন্ন বাণী ও ভাষণে মুস্তাক্‌বেরীনের যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন তা হচ্ছে : তারা আধিপত্যবাদী, সীমালঙ্ঘনকারী, আক্রমণকারী, নিপীড়ক, আরাম-আয়েশপ্রিয়, ভোগবাদী, লোভী, মুফ্‌ত্‌খোর, পাপাচারী, সমাজে বিভেদ-অনৈক্য সৃষ্টিকারী, জনগণকে নিষ্পেষণকারী, নিষ্ঠুর, প্রতারক, চক্রান্তকারী, বর্ণবৈষম্যবাদী, সত্য ও বাস্তবতাকে অস্বীকারকারী, কাপুরুষ ইত্যাদি। এছাড়া তারা তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে চেষ্টা করে যাতে মুস্তায্‌'আফ্ জনগণ স্বনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হতে না পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর হতে না পারে।

অন্যদিকে হযরত ইমামের দৃষ্টিতে যারা প্রকৃত মুস্তায্‌'আফীন্ তারা বিপ্লবী, সংগ্রামী সাহসী, নিষ্ঠাবান মুসলমান, ইখলাছের অধিকারী, নৈতিক শক্তির অধিকারী, আত্মবিশ্বাসী, আশাবাদী, আত্মরক্ষাকারী, বাস্তবদর্শী ও পদ-পদবির লোভ থেকে মুক্ত।[৮] তিনি ইরানের ইসলামি বিপ্লবে মুস্তায্‌'আফ্ জনগণের অংশগ্রহণের কথার উল্লেখ করে বলেন, এই বঞ্চিত জনগণ, গ্রামবাসী ও শহরের অনুন্নত এলাকার জনগণের সাহসী অংশগ্রহণ ব্যতীত শাহী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হতো না।[৯]

কিন্তু তিনি মুস্তায্‌'আফীনের দুর্বলতাকেও অস্বীকার করেন নি। তিনি বলেন যে, মুস্তাক্‌বের্‌দের শাসনব্যবস্থায় মুস্তায্‌'আফীনের মধ্যকার কয়েক ধরনের লোক থাকে যারা সংগ্রামের ময়দানে নামে না অথবা উদাসীনতা, মুস্তাক্‌বেরীনের দ্বারা প্রতারিত হওয়া, ঈমান না থাকা বা ভয়ের কারণে মুস্তাক্‌বেরীনের যুলুমের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন : সাধারণ সরকারি কর্মচারী, সৈনিক এবং বিশ্বের সকল দেশেরই বিরাটসংখ্যক বেখবর জনগণ।[১০]

হযরত ইমাম (র.) যে কোনো সমাজের ওলামা, লেখক, বক্তা ও বুদ্ধিজীবীদেরকে সমাজের দায়িত্বশীল অংশ বলে গণ্য করেন এবং বলেন যে, তাঁদের অবশ্যই মুস্তায্‌'আফীনের পাশে থাকা উচিত।[১১]

ইমাম স্মরণ করিয়ে দেন যে, এ ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে লোকদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে তিনি 'রাজা-বাদশাহ্‌দের ইসলাম, পুঁজিপতিদের ইসলাম, হক্ব-বাত্বিলের সংমিশ্রিত ইসলাম ও আমেরিকান ইসলাম'-এর বিপরীতে খাঁটি মুহাম্মাদী (সা.) ইসলামকে তুলে ধরার জন্য বার বার তাকীদ করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে গুনাহ্-খাতা ও দোষ-ত্রুটি থাকতেই পারে, কিন্তু কতক আলেম নামধারী লোক মুস্তাক্‌বেরীনের সহযোগী হয়ে দ্বীনকে বিকৃত করছে; প্রবৃত্তির দাস এই সব আলেমের সহযোগিতায় মুস্তাক্‌বেরীন গোষ্ঠী জনগণের মধ্যে দ্বীনী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে স্থবিরতা সৃষ্টি করছে। তাই যে আধিপত্যবাদীরা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করছে তাদের তুলনায় ইসলামের জন্য এ ধরনের আলেমদের সৃষ্ট ক্ষতি অনেক বেশি গুরুতর।[১২] ফলত এ ধরনের আলেমরা কার্যত মুস্তাক্‌বেরীনের প্রশাসনের মধ্যেই শামিল।[১৩] হযরত ইমাম (র.) বলেন, যেসব আলেম মুস্তাক্‌বেরীনের খেদমতে আত্মনিয়োজিত তাদের পক্ষে যুলুম, শির্‌ক্ ও কুফ্‌রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়।[১৪]

ইমাম খোমেইনী (র.) বার বার স্মরণ করিয়ে দেন যে, নিষ্ঠাবান ওলামায়ে কেরাম, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শ্রমিক, গ্রামবাসী, ঝুপড়িবাসী, ছাত্র ও সমাজের অন্যান্য অবহেলিত গোষ্ঠীর লোকেরা – এক কথায়, মুস্তায্‌'আফীন্ ইসলামি বিপ্লবকে বিজয়ী করে।[১৫] তাই তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনসহ ইসলামি হুকূমাতের সর্ব স্তরে মুস্তায্‌'আফীনের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইসলামি হুকূমাতের অন্যতম গুরুদায়িত্ব হচ্ছে বঞ্চিত জনগণের বঞ্চনা দূর করা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে জনগণের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করা এবং পরাশক্তিবর্গকে ভয় না করে বিশ্বের মুস্তায্‌'আফীনের, বিশেষত মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো – যাতে তারা বৈশ্বিক ইসলামি হুকূমাত প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

একই সাথে তিনি মুস্তায্'আফীনের ঐক্যের এবং 'ইল্‌ম্ ও তাক্বওয়ার অস্ত্রে তাদের সজ্জিত হওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সতর্ক করে দেন যে, মুস্তায্'আফ্ লোকেরা যেন পদ-পদবির অধিকারী হলে ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদের কথা ভুলে না যায় এবং নিজেরা মুস্তাক্‌বেরের ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয়। তিনি ইসলামি সরকারকে সতর্ক করে দেন যে, মজুদদার, জোঁকের স্বভাববিশিষ্ট পুঁজিপতি ও অন্যান্য লোক যেন অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে বা স্বীয় অবস্থানের অপব্যবহার করে বিপুল সম্পদের মালিক হতে না পারে। তিনি বলেন, ইসলামের অন্যতম অবদান হচ্ছে বঞ্চিতদের বঞ্চনার অবসান ঘটানো ও সকল ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সুতরাং মুসলমানদের মধ্য থেকে যারাই শাসনক্ষমতায় আসুক না কেন, তারা যেন ভুলে না যায় যে, দেশের স্বাধীনতার সংরক্ষণ, আধিপত্যের ও শোষকদের শোষণের অবসান ঘটানো, সরকারি কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক ও সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য পবিত্র ও সুস্থ জীবন যাপন নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধন ইসলামি হুকূমাতের মূলনীতিসমূহের অন্যতম।[১৬]

এখানে যে কারো মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, তা হচ্ছে, একটি সমাজে বিপ্লবের মাধ্যমে মুস্তায্'আফীন্ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তারা যে, ঐ সব মূলনীতির অনুসরণ অব্যাহত রাখবেই তার কী নিশ্চয়তা আছে? এ সম্পর্কে ইমাম খোমেইনীর অভিমত এই যে, মুস্তাক্‌বেরীনের, ধর্মসম্পর্কহীনদের ও বিকৃত ধর্মানুসারীদের শাসনকাঠামোই এমন যে, তাতে যে কেউই অংশগ্রহণ করুক তার পক্ষে অনুরূপ স্বভাব পরিগ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তাই মুস্তায্'আফীনের শাসনকাঠামো অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে এতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য মুস্তাক্‌বের্ স্বভাব পরিগ্রহণের আশঙ্কা না থাকে। এ কারণে সুযোগ-সুবিধা বণ্টন, দায়িত্ব অর্পণ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনী মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মূল্যবোধকে তথা তাক্বওয়া ও আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টাসাধনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং প্রয়োজনে গতানুগতিকভাবে চলে আসা নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতিকে বদলে ফেলতে হবে।[১৭]

ওলামা ও সরকারি দায়িত্বশীলগণ যাতে পথচ্যুত না হন সে লক্ষ্যে হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) তাঁদের সম্পর্কে কতগুলো সাধারণ দিকনির্দেশনা প্রদান করতেও ভুলে যান নি। তিনি বলেন, সবকিছুর আগে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যথাযথ ঈমানই এ ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে। তিনি আরো বলেন : ওলামা ও সরকারি দায়িত্বশীলগণের পক্ষে কেবল তখনই বঞ্চিত জনগণের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সম্ভব যখন তাঁরা সাদাসিধা জীবন যাপন করবেন, জাঁকজমক পরিহার করবেন, আরাম-আয়েম ও ভোগ-বিলাসের পিছনে ছুটবেন না, জনগণের খেদমত করবেন, সুখে-দুঃখে জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন, ঝুপড়িবাসী ও বস্তিবাসীদের সাথে ওঠা-বসা করবেন, প্রাসাদবাসীদের থেকে দূরে থাকবেন, মুস্তায্'আফীনের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন, বায়তুল মাল্ ও স্বীয় পদ-ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না, ইসলামের অপব্যবহার করবেন না, কারণ, ইসলাম পকেট ভর্তি করার দ্বীন নয়, ঘন ঘন জনগণকে (টেলিভিশনের মাধ্যমে) চেহারা দেখাবেন না, সাদাসিধা উপায়-উপকরণ (যেমন : কম দামী গাড়ি) ব্যবহার করবেন।[১৮] তিনি বলেন, কিন্তু এগুলো সম্ভব নয় যদি না ব্যক্তি নিজেকে নাফ্‌সের প্রতি ভালোবাসা ও দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা থেকে মুক্ত করে, যদি না পদ-ক্ষমতাকে অস্থায়ী ও গুরুত্বহীন গণ্য করে এবং মনে রাখে যে, একদিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পদ-ক্ষমতার হিসাব দিতে হবে, ফলত প্রয়োজন হলে খুব সহজেই তা ছেড়ে দিতে পারে।

মুস্তাক্‌বেরীন্ ও মুস্তায্'আফীন্ সম্পর্কে ইমাম খোমেইনী (র.)-এর সমস্ত কথার নির্যাস হচ্ছে এই যে, প্রবৃত্তিপূজা ও দুনিয়া-প্রীতিই সমস্ত গোমরাহী ও পাপাচারের মূল এবং এটাই মানুষকে মুস্তাক্‌বের্ হওয়ার দিকে এগিয়ে দেয়। তাই সর্বাবস্থায় প্রবৃত্তিপূজা ও দুনিয়া-প্রীতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা তথা নাফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদই ইস্তিক্‌বার্ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

* * *

কৃতজ্ঞতা : হযরত ইমাম খোমেইনী (র.)-এর উদ্ধৃতিগুলো ড. আলী আছ্গ্বার্ মুক্বাদ্দাস্-এর مستكبرين و مستضعفين از ديدگاه امام خمينى শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

* * *

তথ্যসূত্র

[১] *বেলায়াতে ফাক্বীহ্* : ইমাম খোমেইনী (র.), এন্‌তেশারাতে আমীর কাবীর (১৯৮১), পৃ. ৪৩।

[২] *দার্ জুস্তজু আয্ রহে কালামে ইমাম*, প্রথম খণ্ড, এন্‌তেশারাতে আমীর কাবীর (১৯৮৪), পৃ. ৮১।

[৩] প্রাগুক্ত।

[৪] প্রাগুক্ত।

[৫] *ছাহীফায়ে ইমাম্*, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৪৪৬-৪৪৮।

[৬] প্রাগুক্ত, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৪২৫-৪২৬।

[৭] প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১৬-৩১৮।

[৮] প্রাগুক্ত, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

[৯] প্রাগুক্ত, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৪২৫-৪২৬।

[১০] প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩২-৩৩৩।

[১১] প্রাগুক্ত, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫০০-৫০১।

[১২] প্রাগুক্ত, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১১৯-১২০।

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫।

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০।

[১৫] প্রাগুক্ত, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭।

[১৬] প্রাগুক্ত, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

[১৭] প্রাগুক্ত, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১২।

[১৮] প্রাগুক্ত, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৩১৭-৩১৯।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবে ইমাম খোমেইনীর (র.) অবদান

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

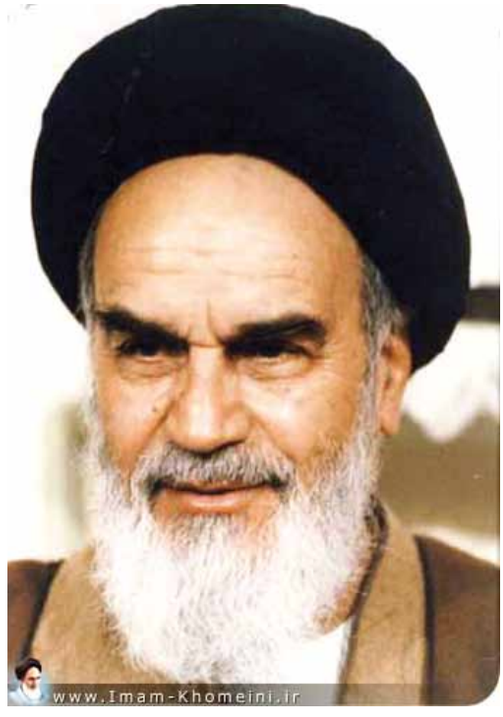

ইরানে ইসলামি বিপ্লব বিজয় লাভ করে ১৯৭৯ সালে। এ বিপ্লবের প্রধান স্লোগান ছিল : 'লা শার্‌কী ওয়া লা গার্‌বী, জমহুরিয়ে ইসলামি' – 'প্রাচ্যও নয়, পাশ্চাত্যও নয়, ইসলামি প্রজাতন্ত্র'। প্রাচ্য বলতে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এশিয়া, ইউরোপ, এমনকি আরব ও আফ্রিকার কোনো কোনো দেশও সোভিয়েত বলয়ভুক্ত ছিল। আর পাশ্চাত্য বা আমেরিকার বলয়ভুক্ত ছিল ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিশাল ভূখণ্ড। তখনকার বিশ্ব রাজনীতিতে এমন বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, এ দুই শক্তিবলয় বা পরাশক্তির বশ্যতা না মেনে পৃথিবীর কোথাও কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হতে পারে না। কিন্তু এই মিথ্যা ধারণা ও বিশ্বাসে পদাঘাত হেনে ইসলামি বিপ্লবের নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) এমন এক বিপ্লব সংগঠিত করেন যা ইতিহাসের অনেক হিসাব-নিকাশকে ভুল প্রমাণিত করে দেয় এবং এক সর্বাত্মক গণবিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লব বিজয় লাভ করে। ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখনো তা সগৌরবে বলবৎ আছে। এ কারণে এ বিপ্লব বিশ্বের তাবত মজলুম মানুষ, বিশেষ করে বঞ্চিত নিপীড়িত মুসলমানদের মনে আশার সঞ্চার করে। কারণ, ইরানের ইসলামি বিপ্লব দুটি বৃহৎ শক্তির বলয়বৃত্তে শৃঙ্খলিত মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে।

দীর্ঘকাল ধরে সর্বসাধারণের মাঝে বদ্ধমূল ধারণা ছিল ইসলাম একটি সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম হলেও কোনো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা ইসলামের নেই। অন্য কথায়, কোনো ইসলামি রাষ্ট্র আধুনিক যুগে চলতে পারে না। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) এ ধারণা ভুল প্রমাণ করে দেন। তিনি বাস্তবে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও এবং তাদের সব ধরনের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা সম্ভব। ইরানের সরকারব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় কাঠামো পর্যালোচনা করলে যে কেউ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এ ব্যবস্থা অত্যন্ত নিখুঁত, উন্নত, আধুনিক ইসলামি আদর্শের অনুসারী হওয়ার সাথে সাথে প্রগতিশীল। এতে সর্ব স্তরে জনগণের অংশগ্রহণ ও ইসলামি আদর্শের অনুসরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। ইরানের মজলিসে শুরায়ে ইসলামি (পার্লামেন্ট), সাংবিধানিক অভিভাবক পরিষদ, দেশের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদ, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ, বিচারব্যবস্থার উপর নজরদারির জন্য সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ প্রভৃতির বিন্যাস এতই নিখুঁত যে, এর ফলে ইসলামি বিপ্লবের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার সুযোগ নেই।

ইরানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শিয়া মাজহাবের অনুসারী। কাজেই ইরানের ইসলামি বিপ্লবে শিয়া মাজহাবের প্রভাব থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শিয়া মাজহাবের 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ী উম্মতের হেদায়তের জন্য ১২ জন ইমাম আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) পক্ষ হতে নির্ধারিত। বারো ইমামের সর্বশেষ যিনি তিনি ইমাম মাহদী ('আ.)। ইমাম মাহদী গায়েব হয়েছেন (আত্মগোপন করেছেন) অনেক আগে। ফলে বর্তমানে সামাজিক বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কোনো ইমাম নেই। এর ভিত্তিতে সাধারণভাবে মনে করা হতো যে, ইমামের অনুপস্থিতিতে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যখন ইমাম মাহদী ('আ.) পুনরায় আবির্ভূত হবেন তখন তিনি এ পৃথিবীকে সুবিচার ও সুশাসনে ভরে তুলবেন, ইসলামের সত্যিকার বাস্তবায়নে সমগ্র দুনিয়ায় শান্তি সুখের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে; কাজেই ইমাম মাহদী ('আ.) ও ইসলামি বিশ্ববিপ্লবের জন্য অপেক্ষায় থাকাই এখনকার সময়ের দাবি। হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) এ ধারণায় ভীষণভাবে নাড়া দেন বেলায়াতে ফকীহ তত্ত্ব উপস্থাপন করে। অর্থাৎ ইমাম মাহদীর ('আ.) আত্মগোপন অবস্থায় থাকাকালে ইসলামি সমাজ সঠিক নেতৃত্বশূন্য থাকতে পারে না, অন্য কথায়, খোদাদ্রোহী শক্তির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিয়ে কেউ নিছক ধর্মকর্ম নিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব হওয়ার মিথ্যা দাবি করতে পারে না।

বেলায়াতে ফকীহর দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করে হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) বলেন, যতদিন ইমামে যামান হযরত ইমাম মাহদী ('আ.) আবির্ভূত না হবেন ততদিন ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে একজন ফকীহর নেতৃত্বে। এই কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের নামই বেলায়াতে ফকীহ।

হযরত ইমাম খোমেইনীর (র.) নেতৃত্বের অভাবনীয় সাফল্য হলো, তিনি এ তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালনভূমি ইরানের গণমানুষকে একটি সর্বাত্মক আন্দোলনের জন্য উজ্জীবিত করেন এবং গোটা বিশ্বে তাক লাগানো গণবিপ্লবের মাধ্যমে আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে শতাব্দীর বিস্ময় ইসলামি

বিপ্লবকে বিজয়ী করেন। হযরত ইমাম খোমেইনীর (র.) এ তত্ত্ব এতই বাস্তব ও দূরদর্শী যে, এর কল্যাণেই এ বিপ্লব এখনও তার সঠিক গতিধারার উপর অবিচল আছে।

ইসলামের স্বর্ণযুগের পর থেকে সমাজে আলেমগণের ভূমিকা নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয় ও তাঁদেরকে কোণঠাসা করে রাখা হয়। সমাজের সর্বত্র এমন ধারণার বিস্তার ঘটানো হয় যে, সমাজের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা আলেমদের নেই। তাঁরা কেবল কবর ও পরজগত নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।। জন্মের সময়ে আজান দেওয়া আর মৃত্যুর সময় জানাযা পড়ানো ও নামায-কালামের বাইরে তাঁদের কাজ নেই। সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাঁদের নেই। সে ক্ষেত্রে হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) ইরানে ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে, আলেম সমাজ ইসলামি রাষ্ট্র পরিচলনার যোগ্যতা রাখেন। শুধু তা-ই নয়, যুগের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ইসলাম একটি বিজয়ী আদর্শ এবং আলেম সমাজই তার ঝাণ্ডাবাহী হতে পারে – তিনি এ সত্যকে বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে পেশ করেন।

ইসলামি জাহানের মূল সমস্যা ফিলিস্তিন এবং বায়তুল মোকাদ্দাস। দীর্ঘদিন হলো ইসলামের প্রথম কিবলাহ্ মসজিদুল আকছার স্বাধীনতা যায়নবাদী ইসরাইলের কব্জায় চলে গেছে, আর মজলুম ফিলিস্তিনি জনগণের উপর অবর্ণনীয় জুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এ কাজে যায়নবাদী ইসরাইল সরকারকে মদদ যোগাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া তথা বিশ্বের সকল পরাশক্তি। তার সঙ্গে আরব দেশসমূহের সরকার-প্রধানরা ইসরাইলের মোকাবিলায় বশ্যতার নীতি গ্রহণ করায় ফিলিস্তিন ও আল-কুদ্সের মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারছে না। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রধান বরকন্দায ছিল ইরানের শাহানশাহ মোহাম্মাদ রেযা পাহলাভী। যায়নবাদী ইসরাইলের সাথে ছিল তার আঁতাত। ইসলামি বিপ্লবের পর হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) প্রথম পদক্ষেপেই ইসরাইলের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তেহরানে অবস্থিত ইসরাইলি দূতাবাসকে ফিলিস্তিন দূতাবাসে রূপান্তরিত করেন। তাঁর এ পদক্ষেপ ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে নতুন আশাবাদের সঞ্চার করে।

হযরত ইমাম খোমেইনীর (র.) দৃষ্টিতে মসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহ যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ফিলিস্তিন ও আল-কুদস মুক্ত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ জন্য সর্বপ্রথম মুসলিম উম্মাহর মধ্যে জাগরণ আনতে হবে এবং আল-কুদস ইস্যুকে মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি পবিত্র মাহে রমজানের শেষ শুক্রবারকে বিশ্ব আল-কুদস দিবস হিসাবে পালনের ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঘোষণা যে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইরানে ইসলামি বিপ্লব বিজয় লাভের পর পরই দেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক অনেক তৎপরতা চালানোর পাশাপাশি ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে দিয়ে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। এরপর আমেরিকা ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের সকল পরাশক্তি সর্বপ্রকার যুদ্ধসরঞ্জাম দিয়ে সাদ্দামকে সহায়তা করে। প্রতিক্রিয়াশীল আরব শেখরা তাদের ধনভাণ্ডার সাদ্দামের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এ যুদ্ধ নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি বিপ্লবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে পারত। সেই যুদ্ধ দীর্ঘ আট বছর স্থায়ী হয়। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেইনীর (র.) বিচক্ষণতায় দুনিয়ার সকল পরাশক্তির পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। যুদ্ধের অবসান হয় এবং তাতে উন্নত শিরে বিজয়ী হন হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) ও ইরানের ইসলামি বিপ্লব।

ইসলামি বিপ্লবের আগে ইরান যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল আমেরিকার উপর। ইরানের শাহ ছিল এতদঞ্চলে আমেরিকার প্রধান এজেন্ট। সেনাবাহিনীতে প্রাধান্য ছিল ইসরাইলি সামরিক বিশেষজ্ঞদের এবং অস্ত্রশস্ত্রের যোগান আসত আমেরিকা ও ইসরাইল থেকে।

কিন্তু ইসলামি বিপ্লবের ফলে ইরান অন্যান্য খাতের ন্যায় অস্ত্র খাতেও আত্মনির্ভরশীল হয়। তার সামরিক শক্তি এতখানি মজবুত হয় যে, ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্টে সাদ্দামের মাধ্যমে প্রক্সি যুদ্ধে বলতে গেলে সকল পরাশক্তি ইরানের কাছে পরাভব মানে। বর্তমানে ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি এতখানি প্রবল যে, সকল পরাশক্তি এখন ইরানের সামরিক সক্ষমতাকে সমীহ করে চলছে। ইরান নিজস্ব প্রযুক্তিতে মহাশূন্যে উপগ্রহ পাঠিয়েছে এবং ক্ষেপণাস্ত্র শক্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

হযরত ইমাম খোমেইনীর (র.) নেতৃত্বে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের আরেকটি সাফল্য হলো নারীদের ক্ষমতায়ন। দীর্ঘদিন থেকে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, ইসলাম পর্দার বিধান দিয়ে নারীদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে এবং নারীর সাম্য, মুক্তি ও প্রগতির পথে পতিবন্ধকতা তৈরি করে। তাদের মুখরোচক স্লোগান হলো, হিজাব প্রগতির অন্তরায়। কিন্তু ইরানের ইসলামি বিপ্লব এ প্রচারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। ইরানি মহিলারা হিজাব সহকারে সমাজের সর্বস্তরে তাঁদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করেছেন যে, হিজাব প্রগতির অন্তরায় নয়। হিজাব সহকারে তাঁরা শিক্ষায়, গবেষণায়, অফিস-আদালতে, বিজ্ঞানচর্চায়, এমনকি ক্রীড়াঙ্গনে ও যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। তাঁরা বিশ্ব অলিম্পিকের বিভিন্ন ইভেন্টে বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইরানের সমাজে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে মহিলারা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন না।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের আরো একটি উজ্জ্বল দিক হলো, দেশের যুব সমাজকে ইসলাম ও জাতি গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। ইরানি যুবকদের মাঝে আত্মত্যাগের যে প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এখনো যা বলবৎ আছে, তা পৃথিবীর সব দেশের জন্য ঈর্ষণীয়। বিশ্বে অনেক দেশে বিপ্লব হয়, দেখা যায়, যারা বিপ্লব করেছে তারা কিছুদিন পরে বিপ্লবের গতিধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে বা ক্ষমতা তাদের হাতে থাকে না। এ ক্ষেত্রে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের দৃষ্টান্ত সবার জন্য অনুসরণীয়। বেলায়াতে ফকীহ বা রাহবারের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে বিপ্লবের শুরুতে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই এখনো এই বিপ্লবের কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করছেন। এটাও বিপ্লবের নায়ক ইমাম খোমেইনীর দূরদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ওয়েবিনার

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের রূপকার ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৩ জুন, বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ রেজা নাফার, সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, খুলনায় অবস্থিত ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ ইব্রাহীম খলিল রাজাভী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ আফতাব হোসাইন নাকাভী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ নূরে আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে অবস্থিত ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ড. আব্দুল কুদ্দুস বাদশা। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বিশিষ্ট ক্বারী এ কে এম ফিরোজ।

ওয়েবিনারে ইরানি রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মাদ রেজা নাফার বলেন, ইমাম খোমেইনী (র.) ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ, যিনি ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, ইরফান এবং রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন এক রসায়ন তৈরি করেছিলেন যার স্বাদ মানুষ এর আগে কখনই পায়নি। ইমাম খোমেইনী ছিলেন তৎকালীন সময়ের অন্যতম অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি বস্তুবাদ ও ধর্মবিদ্বেষের যুগে ধর্মের পুনর্জাগরণের পতাকা উড্ডয়ন করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী এতটাই আলোড়ন তৈরি করেছিলেন যে, এই শতাব্দীর সাথে তাঁর পবিত্র নামটিই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। ইমাম খোমেইনী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব কেবল ইরানের ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি ছিলেন গোটা মানবজাতি এবং মুসলিম বিশ্বের অমূল্য সম্পদ।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সময়ে ইমাম খোমেইনীর চিন্তাদর্শ সংরক্ষণ করা আমাদের বড় সাফল্য, শত্রুরা যা বছরের পর বছর ধরে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে। ইমাম খোমেইনীর স্মরণসভাগুলো প্রকৃতপক্ষে এই আধ্যাত্মিক নেতার চিন্তাদর্শ ও আলোকিত পথনির্দেশনা সংরক্ষণের একটি উপায়। বর্তমান সময়ে মুসলিম যুবকদেরকে ইমাম খোমেইনীর জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত করানো উচিত।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত বলেন, প্রত্যেক বছর খোরদাদ মাসের মাঝের তারিখটি মহান ইরানি জাতির জন্য এবং একই সাথে বিশ্বের সকল স্বাধীনচেতা মানুষের জন্য অশেষ দুঃখ ও শোকের বার্তা নিয়ে হাজির হয়, যে শোক কখনও ভোলার নয়। এ শোক এক মহান, অবিসংবাদিত, সাহসী ও প্রতাপশালী নেতাকে হারানোর শোক, যিনি বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম গণমানুষের বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের গোড়াপত্তন করেন। তিনি বলেন, ইমাম খোমেইনী আত্মমনোবল এবং গভীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ইরানের মহান জাতিকে তার আসল পরিচয়সত্তার প্রতি পথনির্দেশনা দান করেছেন। আর এ কারণেই ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান, ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর থেকে বিগত ৪২ বছরে অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রযুক্তিসহ অন্যান্য খাতে যত উন্নতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তা ইমাম খোমেইনীর ঐ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কাছে ঋণী ।

ড. আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ বলেন, ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা একটি স্বপ্ন ছিল। তৎকালীন বিশ্বে সমাজবাদ, পুঁজিবাদ ও

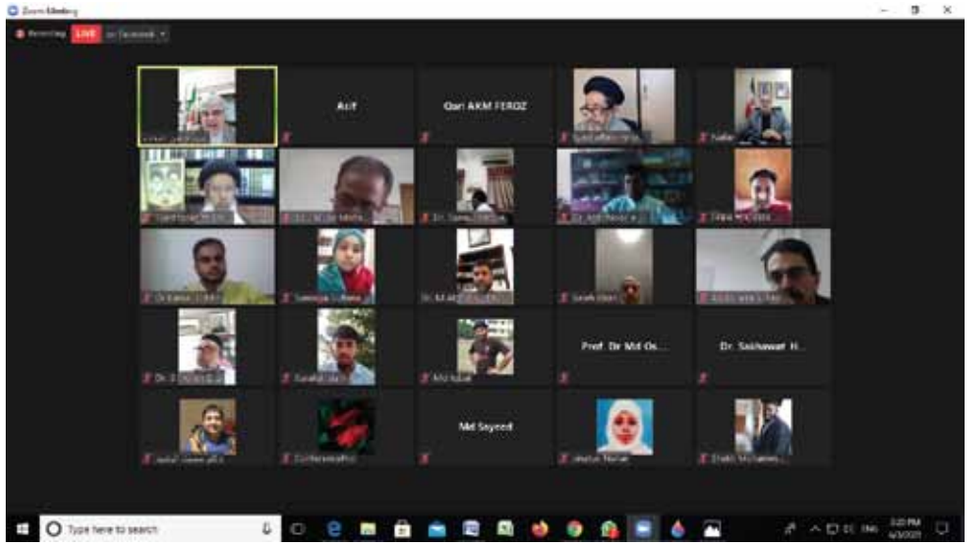

রাজনীতি ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে কেবল একজন অনন্য বিশ্বনেতাই ছিলেন না; বরং আইনবিজ্ঞান, ফিকাহশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, সুফিতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসাবেও ইসলামি বিশ্বের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সকল নেতার চেহারা থেকে অপমান, সংকীর্ণতা ও অলসতার চিহ্ন মুছে ফেলেছেন, মুসলিম ও অমুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করেছেন, বিশ্বের সকল মুক্তিকামী ও নির্যাতিত মানুষের হৃদয় আলোড়ন তুলেছেন। তিনি শুধু ইরানের নন, সারা বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নির্যাতিত মানুষের নেতা। তিনি যে বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল পৃথিবীর বুকে এক অলৌকিক ঘটনা।

গণতন্ত্রবাদের বাইরে একটি ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা সহজ কোনো বিষয় ছিল না। ইরানের তৎকালীন শাসক রেযা শাহ খুবই শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ইমাম খোমেইনী (র.) শোহাদায়ে কারবালার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লব করেন। একটি বিপ্লবের জন্য তিনটি উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ– তত্ত্ব, নেতৃত্ব ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা। ইমাম খোমেইনী বেলায়াতে ফকীহ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বিপ্লব সংগঠিত করেন; তিনি নিজে ছিলেন অসাধারণ নেতৃত্বের গুণে গুণান্বিত এবং তাঁর নেতৃত্বের অধীনে আয়াতুল্লাহ মোর্তজা মোতাহহারী, ড. আলী শরীয়তীর মতো অসংখ্য আলেম-বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন। আর ইরানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

ড. মো. নূরে আলম বলেন, ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পূর্বে যখন অত্যাচারী ও ইহুদী মার্কিনপন্থী রেযা শাহ পাহলভী ইরানের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, তিনি যখন দেশ থেকে ইসলামি আদর্শকে সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, দেশে যখন মদ, জুয়া ও অশ্লীলতা মারাত্মক আকার ধারণ করে, ইসলামের অনুসারিগণকে অমানুষিক জুলুম, নির্যাতন ও অত্যাচার করা হয়, আমেরিকানরা যখন মধ্যপ্রাচ্যকে তাদের ঘাঁটি মনে করত এবং ইরান থেকে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল, এ করুণ পরিস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করেন ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (র)। হযরত ইমাম খোমেইনী

হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ ইব্রাহীম খলিল রাজাভী বলেন, মুসলিম উম্মাহকে শোহাদায়ে কারবালার চেতনায় জালেমকে ঘৃণার কথা শিক্ষা দেওয়া হতো, কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ সেভাবে ছিল না। যা ইমাম খোমেইনী (রহ.) তাঁর বিপ্লবের মাধ্যমে বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। ইমাম খোমেইনী বলেন, মুহররম ও সফর ইসলামকে জাগ্রত রেখেছে। ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর বেলায়াতে ফকীহ তত্ত্ব এমন একটি তত্ত্ব যা বিপ্লবের পর বিপ্লবকে অব্যাহত রাখতে ভূমিকা রেখে চলেছে। এ বিপ্লবকে বুঝতে হলে বেলায়াতে ফকীহকে বুঝতে হবে, কারবালার চেতনাকে বুঝতে হবে, ইমাম খোমেইনীর ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিককে গভীরতার সাথে অনুধাবন করতে হবে। আর যে আহলে

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ইরানের বিপ্লব ছিল একটি নজিরবিহীন বিপ্লব, ইসলামের নামে এ ধরনের বিপ্লব আর দ্বিতীয়টি হয় নি। এ বিপ্লব সমগ্র বিশ্বের জন্য ছিল একটি বিস্ময়। যদিও ইরান একটি মুসলিম প্রধান দেশ ছিল, কিন্তু এর সংস্কৃতি হয়ে গিয়েছিল ইউরোপ-আমেরিকার মতো। ইমাম খোমেইনী ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে এতে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। আর এতে জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতাও ছিল ব্যাপক।

বাইতের খাদেম হিসেবে ইমাম খোমেইনী গর্ববোধ করতেন সেই আহলে বাইতকেও বুঝতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ইমাম খোমেইনী প্রতিষ্ঠিত এ রাষ্ট্রের নীতি হচ্ছে জালেমের বিপক্ষে আর মজলুমের পক্ষে। ফিলিস্তিনের পক্ষে ইরানের সুস্পষ্ট অবস্থান এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করেছে।

ড. মো. কামাল উদ্দিন বলেন, ইমাম খোমেইনী এমন এক ব্যক্তি যিনি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থেকে ইরানের বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বিপ্লবকে সফল করেছেন। এতেই তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পরিচয় ফুঠে ওঠে। ইরানের জনগণকে দীর্ঘদিন ইসলামবিরোধী শক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছে, তারা কখনই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নি। অবশেষে ইমাম খোমেইনী (র.) কর্তৃক সংঘটিত ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে। ইমাম খোমেইনী বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন। বিপ্লবের পূর্বে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন একটি দোকান বলা হতো যেখানে পাশ্চাত্য পণ্য বিক্রি হয়। অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা সকল কিছু পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর ইমাম খোমেইনী এমন এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করেন এবং নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করেন যার ফলে সকল বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান আজো মাথা উঁচু করে টিকে আছে।

অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান বলেন, ইমাম খোমেইনী (র.) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের ধর্মহীন শাসনব্যবস্থা ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত করেছেন। বিপ্লব সফল হওয়ার পর বিপ্লবকে নস্যাৎ করার জন্য ইরাক কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে নি। কিন্তু ইসলামি বিপ্লব স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থেকে যায়। ইমাম খোমেইনী একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন। তিনি একটি জাতিকে আত্মমর্যাদাবোধ, শালীনতা, শিষ্টাচার ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন।

বিপ্লবের পর ইরাক সরকার কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শক্তি চেয়েছিল ইরানের বিপ্লবকে ধ্বংস করতে, কিন্তু ইরানিদের জাতীয় চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তারা তাতে সফল হয়নি।

ইমাম খোমেইনী অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালন এর প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেছিলেন, আমরা ইহুদিদের বিরোধী নই, তবে আমরা যায়নবাদীদের বিরোধী।

বর্তমান ইরানের কথা উল্লেখ করে জনাব সাখাওয়াত বলেন, ইরান একটি আধুনিক ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। ইরানের অবকাঠামোগত অগ্রগতি ইউরোপের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ইরান একটি পরিচ্ছন্ন দেশ। একটি দেশের উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন সকল কিছু ইরানে বিদ্যমান। ইরানে নারী নিরাপত্তার বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। অনেক রাতেও নারীরা নিরাপদে চলাচল করতে পারে। ইরানে দুর্নীতি নেই বললেই চলে। ইরানিরা খুবই উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড চেতনা কাজ করে। তিনি আরো বলেন, ইরানিরা তাদের অতীত ইতিহাসকে মুছে ফেলেনি। তারা সেগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখেছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ আফতাব হোসেন নাকাভী বলেন, ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়া অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যোগ্য নেতার যথাযথ অনুসরণ। ইসলামি বিপ্লব শিক্ষা দেয় যে, শুধু নামায, রোযা, হজ, যাকাত নয়; বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ধরনের কর্মকাণ্ড ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীনে হওয়া আবশ্যক। রাজনীতির সাথে ধর্মের কোন বিরোধ নেই, বরং রাজনীতি ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এ রাজনীতি মিথ্যা ওয়াদা, ধোঁকা দেয়া, অন্যায়-অবিচার করার রাজনীতি নয়; এ রাজনীতি পবিত্র বিষয়, এটি একটি ইবাদত।

ইসলামি বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ইসলামি ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থা

নূর হোসেন মজিদী

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর ৪২ বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তৎকালীন বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তিসহ কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের বিদায় এবং আরো বহু দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও শাসনপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান বলদর্পী সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও তার বশংবদদের দুশমনি উপেক্ষা করে সগৌরবে মাথা উঁচু করে টিকে আছে এবং সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই অনেকের মনেই সবিস্ময় জিজ্ঞাসা : এটা কীভাবে সম্ভব হলো? এর রহস্য কী?

এক কথায় জবাব দিতে হলে বলতে হয়, এর রহস্য ইসলামি বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি, এ বিপ্লবের বিজয়প্রক্রিয়া ও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত – যে বিষয়গুলো সম্পর্কে বহির্বিশ্বে খুব কমই চিন্তা-গবেষণা করা হয়েছে।

ইসলামি হুকুমাতের সংজ্ঞা

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইসলামি হুকুমাতের সংজ্ঞা কী? এটা শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সকল মুসলমানের মধ্যে বিরাজমান অভিন্ন প্রশ্ন। ইতিপূর্বে এ প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক ও বাস্তবসম্মত অভিন্ন জবাব ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) এ প্রশ্নের অকাট্য জবাব প্রদান করেন যার সাথে দ্বিমত করার অবকাশ নেই। তিনি হযরত ইমাম মাহ্দীর আত্মপ্রকাশ-পূর্ব ইসলামি হুকুমাতকে 'বেলায়াতে ফাক্বীহ্' (ولایت فقیه) বলে সংজ্ঞায়িত করেন। তবে তিনি প্রথম বারের মতো এ সংজ্ঞা প্রদান করলেও এটি তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত কোনো অভিনব তত্ত্ব নয়; বরং এ বিষয়টি ইসলামের অকাট্য জ্ঞানসূত্রে পূর্ব থেকেই নিহিত আছে– যার প্রতি তাঁর পূর্বে কেউ সেভাবে দৃষ্টি প্রদান করেন নি।

এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, কোনো নবী-রাসূলের (আ.) উপস্থিতিতে তাঁর প্রতি ঈমানদারগণ হুকুমাতের অধিকারী হলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে মনোনীত প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে তিনিই হবেন তার প্রধান এবং আইনগত মতামত প্রদান ও রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র হকদার; তিনি অন্যদের মতামত গ্রহণ করবেন কার্যত রাষ্ট্রপরিচালনার এখতিয়ারি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত এখতিয়ার তাঁরই। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন :

شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

'(রাষ্ট্রীয়) কাজকর্মের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, অতঃপর যখন আপনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তখন আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল করুন।' (সূরা আলে 'ইমরান : ১৫৯)

অধিকন্তু যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ততার প্রশ্নে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে মনোনীত মাসুম ইমাম (আ.)-এর ইমামতের আকিদা পোষণ করে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্র নেতৃত্বাধীন হুকুমাতে তাঁর যে এখতিয়ার মাসুম ইমামের নেতৃত্বে হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে মাসুম ইমামের একই এখতিয়ার।

অন্যদিকে শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে মুসলমানরা এ মর্মে অভিন্ন আকিদা পোষণ করে যে, শেষ যামানায় হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আত্মপ্রকাশ করবেন ও বিশ্বব্যাপী ইসলামি হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করবেন, যদিও তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যারা ইমামতের আকিদা পোষণ করে না তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে ও যারা মাসুম ইমামের (আ.) ইমামতের আকিদা পোষণ করে তাদের জন্য হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আত্মগোপনের পরে, তাঁর আত্মপ্রকাশ-পূর্ববর্তী হুকুমাতি ক্ষেত্রে করণীয় কী? এ মেয়াদে মুসলমানরা কি দীনী হুকুমাতবিহীন থাকবে ও হযরত ইমাম মাহ্দীর আত্মপ্রকাশের জন্য অপেক্ষা করবে, নাকি সম্ভব ক্ষেত্রে তারা অন্তর্বর্তীকালীন ইসলামি হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করবে? করলে তার সংজ্ঞা কী হবে তথা তার এখতিয়ার ও সীমারেখা কী হবে?

প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্নের জবাব ইসলামের অকাট্য জ্ঞানসূত্রেই নিহিত রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অত্র নিবন্ধের সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়; এখানে সংক্ষেপে এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, কোরআন মজীদে আলেমদের প্রশংসা করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই তাঁকে যথার্থভাবে ভয় করেন, যার কাছে হেদায়াত আছে তিনিই অর্থাৎ আলেমই অনুসৃত হবার হকদার। প্রশ্ন হচ্ছে সে আলেমের সংজ্ঞা কী?

কোরআন মজীদে মুসলমানদের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীনের ব্যাপারে গভীর সমঝের (يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) অধিকারী কতক লোক গড়ে ওঠার ওপর এতই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, তাঁদেরকে, এমনকি দীনী হুকুমাতের প্রতিরক্ষা যুদ্ধে গমনের দায়িত্ব থেকেও রেহাই দেয়া হয়েছে (সূরা আত্-তাওবাহ্ : ১২২) – যার মানে হচ্ছে সমাজে এ ধরনের আলেমের উপস্থিতি ফরযে কেফায়ী। আর 'দীনের ব্যাপারে গভীর সমঝের অধিকারী' কথাটি কেবল চিন্তা, কথা ও আচরণে ভারসাম্যের অধিকারী এমন যুগসচেতন দূরদর্শী আলেমদের বেলায়ই প্রযোজ্য– যাঁদেরকে পারিভাষিকভাবে মুজতাহিদ বা ফাক্বীহ্ বলা হয়।

শিয়া-সুন্নি উভয় ধারায় বর্ণিত একটি হাদিস অনুযায়ী আলেমগণ নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারী। এছাড়া শিয়া সূত্রে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে মাসুম ইমামের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে যে কোনো বিষয়ে আলেমদের দ্বারস্থ হবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) এ উপসংহারে উপনীত হন যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশের পূর্বে মুসলমানদের পক্ষে দীনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ পরিবেশ তৈরি হলে তারপরও তারা তা প্রতিষ্ঠা না করে অনৈসলামি হুকুমাত অব্যাহত থাকতে দেবে এবং তাঁর আত্মপ্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে– এটা ঠিক নয়; বরং তারা চিন্তা, কথা ও আচরণে ভারসাম্যের অধিকারী যুগসচেতন দূরদর্শী মুজতাহিদগণের নেতৃত্বে দীনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং উক্ত মুজতাহিদগণ তাঁদের এখতিয়ারের হুকুমাতি কর্তৃত্ব প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে একজন মুজতাহিদগণের কাছে ন্যস্ত করবেন। এ ধরনের হুকুমাত হবে হযরত ইমাম মাহ্‌দীর আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী। হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) এ হুকুমাতের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায়ন করেন : বেলায়াতে ফাক্বীহ্ (ولايت فقيه) অর্থাৎ মুজতাহিদের শাসনকর্তৃত্ব।

ইসলামি হুকুমাত প্রতিষ্ঠার পথ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের হুকুমাত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? মুজতাহিদগণ কি কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করে জনগণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে তাঁদের হাতে হুকুমাতের ক্ষমতা অর্পণের জন্য আহ্বান জানাবেন এবং ক্ষমতালাভের জন্য অন্যান্য দলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন?

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রক্ষমতা কামনা করা জায়েয নেই (সূরা আল্-ক্বাছাছ্ : ৮৩ ও সূরা আল্-গ্বাশিয়াহ্ : ২১-২২)। নবী-রাসূলগণের মূল দায়িত্ব ছিল মানুষের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক পরিচয় তুলে ধরা। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ 'রাসূলের ওপর পৌঁছে দেয়া ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই।' (সূরা আল্-মায়েদাহ্ : ৯৯)

দীনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পরিস্থিতিনির্ভর; আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক পরিচয় ও দীনের সঠিক রূপ মানুষের কাছে তুলে ধরার ফলে যদি যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ তা গ্রহণ করে নিজেদেরকে যথাযথভাবে দীনী আমল ও নৈতিকতায় ভূষিত করে তোলে এবং ভিতর-বাইরের পরিস্থিতি দীনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল হয় কেবল তখনই দীনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ কারণেই–যথাযথ পরিস্থিতি না পাওয়ায়–সমস্ত নবী-রাসূলের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত মাসুম ইমামের পক্ষ থেকে দীনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি।

যেভাবে বিপ্লব বিজয়ী হলো

নবী-রাসূলগণ (আ.) ও মাসুম ইমামগণ (আ.) অনুসৃত এ কর্মপদ্ধতি অনুসরণে ইরানি মুজতাহিদগণ, বিশেষত হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) ও তাঁর অনুসারী মুজতাহিদগণ সরকারি সংশ্লিষ্টতাবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের দীনী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে দীনী জ্ঞানগবেষণার কাজে এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য ও রাজনৈতিক দল ব্যতীত মানুষের মাঝে দীনের সঠিক শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন। আর যেহেতু যুগজিজ্ঞাসার দীনী জবাব প্রদানের লক্ষ্যে মুজতাহিদের জন্য সমসাময়িক বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকসহ সকল দিক সম্পর্কে অবগত থাকা অপরিহার্য সেহেতু তাঁরা সার্বিকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সদা ওয়াকিফহাল থেকে সকল বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতেন ও দিকনির্দেশ প্রদান করতেন। তাঁরা জাতীয় ক্রান্তিকালসমূহে একদিকে যেমন জনগণকে পথনির্দেশ দিতেন অন্যদিকে সরকারকে সংশোধনের

জন্য নসিহত করতেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইরানে যে সাংবিধানিক বিপ্লব হয়– যার ফলে নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও মজলিসে মিল্লি (ন্যাশনাল পার্লামেন্টে)-এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়– তাতেও মুজতাহিদগণ নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। তখন মুজতাহিদগণ শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন নি, তবে মজলিসের সিদ্ধান্তের শার'ঈ বৈধাবৈধতা নির্ণয়ের জন্য মজলিসে মুজতাহিদগণের জন্য সংরক্ষিত কোটা ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ তাঁবেদার রেযা খান ক্ষমতা দখল করে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে এবং কার্যত দেশকে ব্রিটেনের অঘোষিত উপনিবেশে পরিণত করে ও সেই সাথে ইরানি জনগণের ওপর জোর করে ইসলামবিরোধী পশ্চিমা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষমতাসীন তার পুত্র মোহাম্মাদ রেযা পাহ্লাভীও একই নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখে। মজলিসে মিল্লি তেল শিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে ইরানের ওপর থেকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ খর্ব করার উদ্যোগ নিলে ১৯৫৩ সালে শাহ্ বিদেশে পালিয়ে যায় এবং সিআইএ-র মদদে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের পর পুনরায় দেশে ফিরে আসে। তখন থেকে ইরান আমেরিকার অঘোষিত উপনিবেশে পরিণত হয়।

শাহ্ ১৯৬৩-র শুরুতে আমেরিকার নির্দেশে ইরানি কৃষকদের কৃষি জমির ওপর বাধ্যতামূলক যৌথ খামার পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়ে কার্যত শহরবাসী জমিদারদেরকে সকল কৃষি জমির মালিকে পরিণতকরণ ও সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো ব্যক্তিমালিকদের কাছে বিক্রিকরণসহ 'শ্বেতবিপ্লব' নাম দিয়ে ছয়-দফাভিত্তিক একটি কর্মসূচি চাপিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিলে হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) তার বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং তাকে ইসলামের দুশমন হিসেবে অভিহিত করেন। এ বিষয়ে অন্য মুজতাহিদগণও হযরত ইমামের অনুসরণ করেন। এ অবস্থায় ৩রা জুন ইমাম খোমেইনীকে গ্রেফতার করা হলে ৫ই জুন দেশব্যাপী এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান হয়– যা নির্মমভাবে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে দমন করা হয়। পরে ১৯৬৪-র এপ্রিলে ইমামকে মুক্তি দেয়া হয়।

ইতিমধ্যে শাহ্ ইরানে অবস্থানরত আমেরিকান সৈন্যদের কোনো অপরাধের বিচার ইরানি আদালতে করা হবে না মর্মে একটি আইন পাশ করে যা 'ক্যাপিচুলেশন আইন' নামে কুখ্যাত। হযরত ইমাম (র.) ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৪ তারিখে প্রদত্ত এক ভাষণে এর বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা জানালে তাঁকে ৪ঠা নভেম্বর গ্রেফতার করে তুরস্কে নির্বাসিত করা হয়। তাঁর ওপর নযরদারির সুবিধার্থে প্রায় এক বছর পর তাঁকে সেখান থেকে ইরাকের নাজাফে এনে রাখা হয় এবং সেখানে তিনি আরো তেরো বছর থাকেন। তবে বিভিন্নভাবে ইরানে অবস্থানরত স্বীয় ভক্ত-অনুসারীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। নাজাফে থাকাকালেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বেলায়াতে ফাক্বীহ্' রচনা করেন।

ইরানি জনগণের মধ্যে শাহ্বিরোধী ও ইসলামি চেতনা ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকে। যদিও ইরানে তখন পাশ্চাত্যপন্থী ন্যাশনাল ফ্রন্ট, কমিউনিস্ট তুদেহ্ পার্টি, শাহ্ সমর্থক রাস্তাখীয্ পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সক্রিয় ছিল, কিন্তু মুজতাহিদগণের কোনো দল ছিল না; বরং তাঁদের নেতৃত্বের আসন ছিল জনগণের অন্তঃকরণে এবং তার স্বরূপ ছিল কোনোরূপ আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার ব্যতীতই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের অনুসরণ ও আনুগত্য এবং তাঁদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা। এ কারণেই ১৯৭৭-এর নভেম্বরে নাজাফে শাহের গোয়েন্দা সংস্থা সাভাক কর্তৃক হযরত ইমামের পুত্র মোস্তাফা খোমেইনী নিহত হওয়ার পর সারা ইরানে লাগাতার গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘট তথা বিপ্লব শুরু হলে মুজতাহিদগণের কোনো সংগঠন না থাকায় সিআইএ ও সাভাকের পক্ষে বিপ্লবী জনতার মধ্যে অনুপ্রবেশ তো দূরের কথা, শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করেও এ বিপ্লবকে দমন করা সম্ভব হয় নি। কারণ, জনগণের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে কারা এ বিপ্লবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদেরকে হাজারো চেষ্টা করেও খুঁজে বের করা সম্ভব হয় নি। দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ব্যাক্গ্রাউন্ডবিহীন সাধারণ লোকেরা গণমিছিলসমূহের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে; তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হলে পরদিন অন্য অখ্যাত লোকেরা নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকায় সিআইএ, সাভাক্, পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনীর লোকেরা উপর্যুপরি হত্যা নিষ্ফল প্রত্যক্ষ করে হতাশ

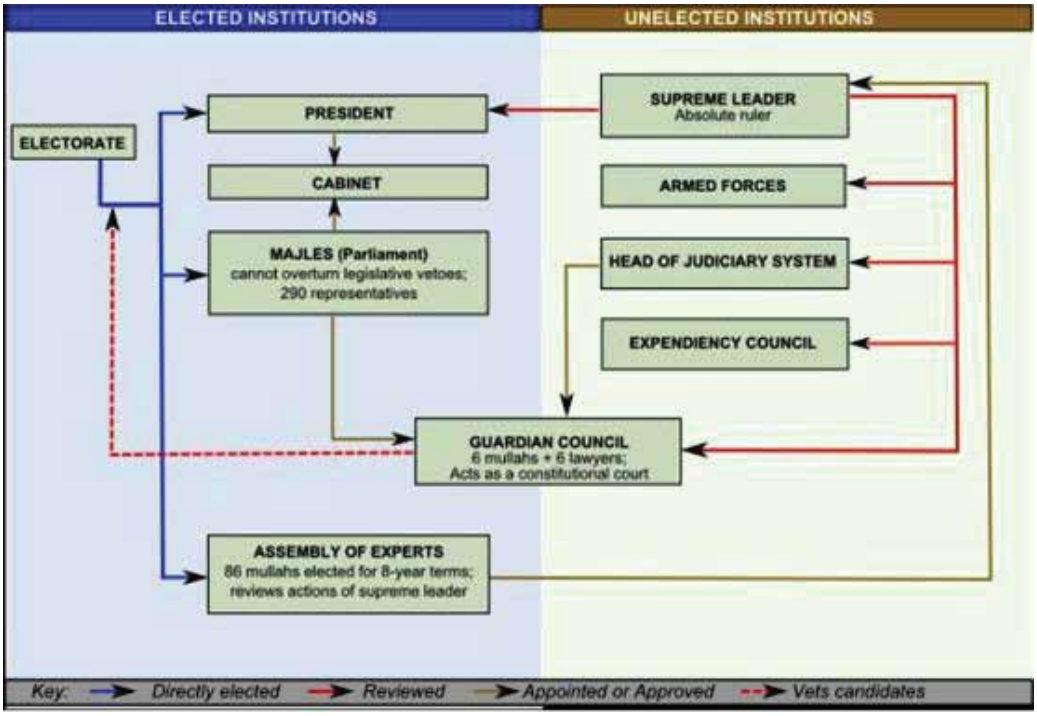

হয়ে ময়দান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় শাহ্ দেশের জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী শাপুর বাখতিয়ারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ১৯৭৯-র ১৬ই জানুয়ারি দেশ থেকে পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে শাহের অনুরোধে ইরাক সরকার হযরত ইমাম খোমেইনীকে ইরাক থেকে বহিষ্কার করলে তিনি কুয়েতে যাবার চেষ্টা করেন, কুয়েত সরকার তাঁকে সে দেশে প্রবেশ করতে না দিলে তিনি ১১ই অক্টোবর ১৯৭৮ তারিখে প্যারিসে চলে যান এবং সেখান থেকে ১৯৭৯-র ১লা ফেব্রুয়ারি ইরানে ফিরে আসেন।

ইমাম খোমেইনী (র.) ইরানের মাটিতে নেমেই শাহের মনোনীত সরকারকে বরখাস্তের ঘোষণা দিয়ে নতুন সরকার গঠন করেন। এরপর, দীনী চেতনায় উদ্দীপিত গোটা বিমান বাহিনী এবং কতক ব্যতিক্রম বাদে গোটা সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও প্রশাসন নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে– যার ফলে অনুল্লেখযোগ্য নামমাত্র সংঘর্ষের পর শাহের অনুগত সামরিক বাহিনীর লোকেরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় ঘটে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুজতাহিদগণ কর্তৃক যুগজিজ্ঞাসার জবাব দানসহ অরাজনৈতিক পন্থায় দীনী শিক্ষা প্রচারের ফলে তার ঢেউ কেবল ইরানের সর্বস্তরের সাধারণ জনগণের মধ্যেই পৌঁছে নি, প্রশাসন ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল এবং এ ব্যাপারে শাহের প্রচার কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। অন্যথায় ইসলামি বিপ্লবের বিজয় হয়তো আদৌ সম্ভব হতো না।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থা

৩০ ও ৩১শে মার্চ (১৯৭৯) অনুষ্ঠিত গণভোটে শতকরা ৯৮ ভাগেরও বেশি ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত দিলে হযরত ইমাম (র.) ১লা এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে ইরানের নাম ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ঘোষণা করেন।

এরপর ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জন্য বিশেষজ্ঞদের তৈরি সংবিধান গণভোটে অনুমোদিত হয়– যা কেবল ইসলামি সংবিধান হিসেবেই নয়, সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য শ্রেষ্ঠতম ভারসাম্যমূলক ও সুবিচারমূলক সংবিধানের দৃষ্টান্তও বটে।

এ সংবিধানে রাহ্বার পদ নির্ধারণের লক্ষ্যে জনগণের ভোটে প্রতি আট বছর পর পর নির্বাচিতব্য মুজ্তাহিদ্ আলেমগণের ৮৪ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ পরিষদ প্রার্থিতাবিহীনভাবে নিজেদের ভিতর বা বাইরে থেকে যাঁকে উপযুক্ত মনে করবেন এমন কাউকে রাহ্বার মনোনীত করবেন, তাঁর কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং প্রয়োজনে তাঁকে অপসারণ করবেন। যেহেতু মুজ্তাহিদ্ আলেমগণ তাত্ত্বিকভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও মাসুম ইমামগণের (আ.) প্রতিনিধি এবং এ কারণে দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাঁদের (আ.) হুকুমাতি এখতিয়ারেরও অধিকারী, সেহেতু এ পরিষদের সদস্যগণ হুকুমাতি এখতিয়ারের অধিকারী এবং তাঁরা স্বীয় হুকুমাতি এখতিয়ার আমানত হিসেবে রাহ্বারের কাছে অর্পণ করেন।

রাহ্বার হুকুমাতের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে যথাযথ বিশেষজ্ঞ বা জনপ্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং জনগণের যেসব কাজ আদর্শিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় সেসব কাজ সরাসরি জনপ্রতিনিধিগণ আঞ্জাম দেন। তবে রাহ্বার স্বয়ং কোনো প্রকল্পে বা বাজেটে স্বাক্ষর প্রদান করেন না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যদিও তাত্ত্বিক বিচারে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ও মাসুম ইমামের (আ.) প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইসলামি হুকুমাতের সমস্ত ক্ষমতাই রাহ্বারের, কিন্তু যেহেতু তিনি মাসুম নন বিধায় ভুলের ঊর্ধ্বে নন সেহেতু এবং সেই সাথে ইসলামের দুশমনরা যাতে তাঁর ব্যাপারে ভিত্তিহীন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে ও তাঁকে বিতর্কিত করতে না পারে সে লক্ষ্যে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান-প্রণেতাগণ যথার্থভাবেই তাঁকে সরাসরি আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের ঊর্ধ্বে দিকনির্দেশক হিসেবে রাখাকেই সঙ্গত গণ্য করেছেন। একইভাবে নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদকেও একই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে শতকরা একশ ভাগ ক্ষমতার বিভাজন করা হয়েছে এবং প্রশাসন, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী ও জাতীয় সম্প্রচার বিভাগ (রাষ্ট্রীয় রেডিও-টিভি) পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ফলে প্রশাসন বা সরকারের পক্ষে স্বৈরাচারী হবার কোনোই সুযোগ নেই।

রাহ্বার ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত করেন এবং তিনি হন প্রশাসনের প্রধান; মন্ত্রিগণ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত এবং পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ দায়িত্ব লাভ করেন, কিন্তু পার্লামেন্টের সদস্য নন। রাহ্বার সর্বোচ্চ বিচার পরিষদের সাথে পরামর্শ করে বিচার বিভাগের প্রধান ও সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারকদের মনোনীত করেন। অনুরূপভাবে তিনি সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে তিন সশস্ত্র বাহিনীর ও ইসলামি বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর তিন বিভাগের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদগুলোতে এবং পুলিশ বাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগ দেন। প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত জাতীয় সম্প্রচার পরিষদের প্রধান পদেও তিনি নিয়োগ দেন। এছাড়া আইন বিভাগের (মজ্লিসে শূরায়ে ইসলামি/পার্লামেন্ট)-এর অনুমোদিত বিলগুলোতে ইসলামি শারী'আহ্ ও সংবিধান লঙ্ঘিত না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিলগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য গঠিত বারো সদস্যের অভিভাবক পরিষদের ছয়জন আইন-বিশেষজ্ঞ সদস্য বিচার বিভাগ থেকে মনোনয়ন দেয়া হয় ও পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হলে তাঁরা দায়িত্ব লাভ করেন এবং ছয় জন মুজ্তাহিদ্ সদস্য রাহ্বার কর্তৃক মনোনীত হন। কোনো বিষয়ে পার্লামেন্ট ও অভিভাবক পরিষদের মধ্যে অচলাবস্থা দেখা দিলে তার নিরসনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদ গঠিত হয় এবং রাহ্বার সে পরিষদের প্রধানকে ও এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনীত করেন। রাহ্বার সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন ও সন্ধির সিদ্ধান্ত নেবেন। পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন সাধনসহ যে কোনো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশাসন ও পার্লামেন্ট রাহ্বারের অনুমোদন ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। এছাড়াও রাহ্বার যে কোনো পরামর্শ দিলে তা মেনে চলতে হবে।

এসবের বাইরে অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও উন্নয়নসহ জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে প্রশাসন কাজ করে যায় এবং কতক কাজ নির্বাচিত স্থানীয় সরকারগুলো আঞ্জাম দেয়।

এভাবে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে রাহ্বার ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কর্মবণ্টনে কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে :

شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

'কাজকর্মের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, অতঃপর যখন আপনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তখন আল্লাহ্র ওপরে ভরসা করুন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

এবং মুসলিম জনগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য :

أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

'তাদের কাজ তাদের (নিজেদের) মধ্যে পরামর্শকরণ।' (সূরা আশ্-শূরা : ৩৮)

প্রথমোক্ত আয়াতটিতে নবী করীম (সা.)-কে তাঁর হুকুমাতি দায়িত্বের ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে তাঁকেই; পরামর্শদাতাদের সংখ্যাগুরুর, এমনকি তাঁদের সকলের মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয় নি। অন্যদিকে যেসব সামষ্টিক কাজ রাসূলের হুকুমাতি দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় সেগুলোতে অধিকতর বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়ার ও তা থেকে উপকৃত হবার জন্য স্বভাবতঃই মুসলমানরা পরস্পর পরামর্শ করে থাকে; এসব ক্ষেত্রে রাসূলের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য নয়, যদিও এসব ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শ লোকদেরকে উপকৃত করতে পারে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দল ব্যবস্থা

সমিতি, সংস্থা ও রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতাকে ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়; যদিও রাজনৈতিক দল গঠন করা কারো জন্য অপরিহার্য নয়, তবে তা গঠনের অধিকার বা স্বাধীনতা থাকতে হবে। রাজতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক দেশ ব্যতীত সকল দেশেই এ স্বাধীনতা আছে। তাই চিন্তা ও মত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতার এবং সংঘবদ্ধতার স্বাধীনতার হেফাযতকারী দীনের অনুবর্তী ইসলামি হুকুমাত্ হিসেবে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানেও এ স্বাধীনতা আছে। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে যেভাবে রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক মর্যাদা আছে– যার দ্বারা জনপ্রতিনিধিদের স্বাধীনতাকে এবং পরোক্ষভাবে কার্যত জনগণের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়, ইরানে সেভাবে সংবিধানে দলের জন্য কোনো মর্যাদা সংরক্ষিত নেই। সেখানে যে কেউ দল ও জোট গঠন করতে পারে এবং নির্বাচনগুলোতে যে কোনো দল যে কোনো প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারে, কিন্তু সংবিধান ও আইনের দৃষ্টিতে প্রার্থিগণ ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন। ফলে একই প্রার্থীকে একাধিক দল সমর্থন করতে পারে, অন্যদিকে নির্বাচিত পেসিডেন্ট বা পার্লামেন্ট সদস্য স্বীয় কাজকর্মের ব্যাপারে সংবিধান, আইন ও জনগণের কাছে দায়ী থাকেন, কোনো দলের কাছে দায়ী থাকেন না। তাই একজন পার্লামেন্ট সদস্য সরকারের কোনো বিলের বিরোধিতা করার ও কোনো বিলের সমর্থন করার ব্যাপারে এবং যে কোনো বিষয়ে নিজ দলের অবস্থানের বিপরীত অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারেও পুরোপুরি স্বাধীন।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধর্ম ও মাযহাবের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা-ও ইসলামি বিপ্লবের স্থায়িত্বের পিছনে একটি বিরাট কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে ইহুদি, খ্রিস্টান ও জরাথুস্ত্রীদের জন্য মজ্লিসে শূরায়ে ইসলামিতে (পার্লামেন্টে) জনসংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেরা ভোট দিয়ে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। অন্যদিকে ফৌজদারি অপরাধের বিচার ও সামাজিক নৈতিকতা সম্পর্কে সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে ইসলাম রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং গোটা জাতির সামষ্টিক কাজকর্মে তারই প্রতিফলন ঘটবে, তবে প্রত্যেক ধর্মের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারে, যেমন : চিন্তা-বিশ্বাস ও ইবাদত্-উপাসনায় তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু কোনো শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু কোনো গোষ্ঠী সংখ্যাগুরু হলে সেখানে দুই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যকার কোনো বিষয় সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে সেখানকার সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিধান প্রাধান্য লাভ করবে।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা একান্ত নিজস্ব বিষয়াদিতে নিজ নিজ মাযহাবের অনুসরণ করবে, কিন্তু কোনো শহরে দুই মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যকার বিরোধ নিরসনে সেখানকার সংখ্যাগুরু মাযহাবের বিধান অনুসৃত হবে।

বৈশ্বিক ইসলামি হুকুমাতের দিকনির্দেশ

বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যারাই ইসলামি হুকুমাত্ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাদের সকলেরই একটি অভিন্ন ধারণা এই যে, শেষ পর্যন্ত বিশ্বে একটিমাত্র ইসলামি হুকুমাত্ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং অনেকেই মনে করে যে, একই সময় বিশ্বের বুকে একাধিক ইসলামি হুকুমাতের অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সেই সাথে একটি প্রশ্ন জাগে যে, নবী বা মাসুম ইমামের (আ.) নেতৃত্ব ব্যতীত এ ধরনের একক ইসলামি হুকুমাতে বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতির মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখা সম্ভব হবে কিনা।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্.) এ সংশয়ের নিরসন ঘটিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর অন্তিম বাণীতে (অসিয়তনামায়) মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি এই বলে আহ্বান জানিয়েছেন : 'স্বাধীন প্রজাতন্ত্রসমূহের সমন্বয়ে একটি ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যান।'

ইমাম খোমেইনীর এ অতি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে এ তাৎপর্যই নিহিত রয়েছে যে, একক ইসলামি হুকুমাতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মূল কাজ হবে হুকুমাতের আদর্শিক নিয়ন্ত্রণ ও দিকনির্দেশনা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি 'স্বাধীন প্রজাতন্ত্র'সমূহের হাতে থাকবে, ফলে প্রতিটি জাতি ও জনগোষ্ঠী স্বীয় ন্যায্য পার্থিব স্বার্থের হেফাযত্ করতে সক্ষম হবে এবং কোনো জাতি কোনো জাতির বিরুদ্ধে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে ও অপরকে শোষণ করতে পারবে না।

বস্তুত বৈশ্বিক ইসলামি হুকুমাতের জন্য এর চেয়ে অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যোপযোগী বাস্তবানুগ পরিকল্পনার কথা আদৌ চিন্তা করা সম্ভব নয়।

ইসলামি বিপ্লবোত্তর ইরান : পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও অবস্থান

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ইরানের ইতিহাসে ১৯৭৯ সাল একটি মোড় পরিবর্তনকারী সন। এ সনের ১১ ফেব্রুয়ারি প্রখ্যাত মার্জায়ে তাকলিদ বিশ্বব্যাপী ইমাম খোমেইনী নামে সুপরিচিত হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল্-উয্মা রুহুল্লাহ্ আল্-মুসাভী (রহ.)-এর প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ইরানে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়। মানব ইতিহাসের এ নজিরবিহীন ও অভূতপূর্ব বিপ্লবের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাঁবেদার মুহাম্মদ রেজাশাহ পাহলভী (১৯১৯-৮০ খ্রি.) ও তাঁর সরকার উৎখাত হয়। এতে কেবল পাহলভী রাজবংশ (১৯২৫-৭৯ খ্রি.) নয়; বরং আড়াই হাজার বছর ধরে চলমান রাজতন্ত্রেরও বিলুপ্তি ঘটে। স্বৈরাচারী খোদাদ্রোহী রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্তির পরপরই ইরানি জনগণ প্রায় সর্বসম্মত রায়ে ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। চলতি বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো ইসলামি বিপ্লবের ৪২তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিপ্লব পরবর্তী এ চার দশকেরও বেশি সময়ে ইরানের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিখাতসহ সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ইরানের বৈশ্বিক অবস্থান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্র অঙ্কন এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ়করণ

বলা হয় যে, ইরানের ইসলামি বিপ্লব ছিল হাজার বছরের সেরা আদর্শিক বিপ্লব। এ বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ছিল অভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি, বহিঃশক্তির তাঁবেদারির নাগপাশ ছিন্ন করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করা, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ও ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

এ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইরানে পাহলভী স্বৈরতন্ত্রের অবাসন ঘটে। পাহলভী স্বৈরশাসকদের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী পশ্চিমা পরাশক্তিসমূহ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লিপনার অবসান হয়। ফলে ইরানি জনগণের বহুল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়। তবে এ স্বাধীনতা রক্ষা করা ছিল ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানি বিপ্লবী সরকারের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ সুদীর্ঘ কাল ধরে ইরানের উপর যে কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করেছিল ইসলামি বিপ্লবের ফলে তা নস্যাৎ হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার মিত্র পশ্চিমা শক্তিগুলো ইরানকে পদানত ও তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। ইসলামি বিপ্লব ও ইরানের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারযুদ্ধ চালিয়েছে। ইরানকে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে দুর্বল করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধসহ সবধরনের অপচেষ্টা করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের কোনো অপকৌশলই

এ যাবৎ কাজে আসেনি। বিপ্লবের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুদের সর্বাত্মক অপপ্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে ইতোমধ্যে ইরানের জনগণ বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ও নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণের লক্ষ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জন করেছে। আগ্রাসী শক্তির কাছে নতজানু না হয়ে তারা নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখায় অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মুসলিম দেশগুলোর বেশিরভাগ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসর পশ্চিমা এবং অন্য বৃহৎশক্তির তাঁবেদারে পরিণত হয়েছে, সেখানে ইরান শত প্রতিকূলতার মুখেও স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে বস্তুত ঈমানী শক্তি ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে ইসলামি বিপ্লবের অনুসারীরা একের পর এক বাধা অতিক্রম করে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছে।

শাসনব্যবস্থা ও সরকার পদ্ধতি

ইসলামি বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের পরিবর্তে একটি ইসলামি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা– যেখানে সবাই স্বাধীনভাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিপ্লব সফল হওয়ার পরপরই ঐতিহাসিক গণভোটের মাধ্যমে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে (৯৮.২%) ইরানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক নয়। ১৯৭৯ সালে বিপ্লবী সরকার যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিল এর অধীনে ইরানে এমন একটি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় যে সরকার ব্যবস্থায় একজন ন্যায়পরায়ণ ইসলামি ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ 'রাহবার' বা সর্বোচ্চ নেতা সরকার ও প্রশাসনের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করেন। ইসলামি আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অভিভাবক পরিষদ ইসলামি মানদণ্ডের ভিত্তিতে এবং পার্লামেন্টের অনুমোদিত

আইন অনুযায়ী তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। ইরানে প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার চালু আছে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে চার বছরের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একটি কেবিনেট সরকার পরিচালনায় প্রেসিডেন্টকে সহায়তা করে। ইরানের আইন পরিষদ– 'মজলিশে শুরায়ে-এসলামি' এক কক্ষবিশিষ্ট এবং এর সদস্য সংখ্যা ২৯০। ইরানের সরকার পরিচালিত হয় ইসলামি শরীয়া আইন ও এর সাথে সঙ্গতি রেখে পার্লামেন্টে প্রণীত আইন দ্বারা।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান উদীয়মান অর্থনীতির এক সম্ভাবনাময় দেশ। ইরানি বিপ্লবের পর থেকে সরকারের দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যসমূহ ছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও জনসাধারণের আরামদায়ক জীবনযাত্রার মান নিশ্চিতকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র ইরানের উপর নানা রকমের বিধি-নিষেধ ও বাধা-বিপত্তি আরোপ করতে থাকায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য অর্জন অনেক কঠিন এক চ্যালেঞ্জ ছিল। এতদসত্ত্বেও গত চার দশকে অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে ইরান ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে এবং ইতোমধ্যে দেশটি মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত হয়েছে।

ইরানের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো খনিজ তেল ও গ্যাস। এ দুটি প্রাকৃতিক সম্পদ ইরানকে energy superpower এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তেল (বিশ্বের ১০%) ও খনিজ গ্যাস (বিশ্বের ১৫%) ইরানের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হলেও বর্তমান বিশ্ববাস্তবতা এবং সময়ের দাবি বিবেচনায় ইরান সরকার তেলনির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে নতুন নতুন খাত নির্ধারণ করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে ইরানের অর্থনীতিতে ক্রমশ শিল্প, কৃষি ও সেবা খাতের বিকাশ ঘটায় অর্থনীতির মৌলিক কাঠামো অনেকটাই বদলে গেছে।

তেহরান স্টক এক্সচেঞ্জ বিশ্বের অন্যতম সফল স্টক এক্সচেঞ্জ। বর্তমানে এতে চল্লিশের অধিক শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ইরানের জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ২ হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং আর্থিক প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ১২ শতাংশের উপরে। মার্কিন অবরোধ ও কোভিড মহামারি সত্ত্বেও ইরানের অর্থনীতির অগ্রগতি অব্যাহত আছে। সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক 'ম্যানেজিং ডিভারজেন্ট রিকভারিস' প্রতিবেদনে বলেছে গত বছরের তুলনায় ইরানের প্রবৃদ্ধি আরো এক শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। গত বছর আইএমএফ'র হিসেবে ইরানের প্রবৃদ্ধি ছিল দেড় শতাংশ। এ বছর তা বেড়ে দাঁড়াবে ২.৫ শতাংশে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যেই ইরানের প্রবৃদ্ধি পশ্চিম ও সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশগুলোর প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে।

জাতিসংঘের অধীনস্থ বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক কর্তৃপক্ষ আঙ্কটাড ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইরানকে একটি সফল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের সেরা বাণিজ্য সম্পাদনকারী ৪০টি দেশের তালিকায় ইরান ইতোমধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলো রপ্তানি খাত। এ খাতের সাফল্য একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও ইঙ্গিত দেয়। রপ্তানি খাতে ইরানের অর্জন উল্লেখ করার মতো। ইরানের রপ্তানি পণ্যের অন্যতম প্রধান হলো তেল। দেশটির কাস্টমস প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী গত ফারসি অর্থ বছরে দেশটির তেল থেকে অর্জিত রপ্তানি আয় ছিল সাড়ে ৩৪ বিলিয়ন ডলার। একই সময় তেলবহির্ভূত বাণিজ্য আয় ছিল ৭৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। চলতি বছর ইতোমধ্যেই গত বছরের তুলনায় তেলবহির্ভূত রপ্তানি বেড়েছে ৪৬%। তেলবহির্ভূত যেসব পণ্য ইরান রপ্তানি করে থাকে তার মধ্যে রেয়েছে পেট্রোকেমিক্যাল, প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত পণ্য, আয়রন ও স্টিল, কপার, রাসায়নিক ও জৈব সার, বিভিন্ন রকমের কৃষি ও খাদ্যপণ্য, খনিজ, অটোশিল্প পণ্য, গালিচা ও ওষধি পণ্য ইত্যাদি। ইরানের প্রযুক্তিভিত্তিক রপ্তানিও বেড়েছে লক্ষ্যণীয় মাত্রায়। অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগে বৈচিত্র্য আনার সক্ষমতাও অর্জন করেছে দেশটি। ইতোমধ্যে দেশটির পানি ও বিদ্যুৎ খাতে বড় রকমের বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পেরেছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট স্থিতিশীল বলে ইউরোপ, চীন, আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতসহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলো দেশটিতে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। ইরানের অর্থনীতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য খাত হলো কৃষি। কৃষিখাতে বিপ্লবোত্তর ইরানের অগ্রগতির চিত্রও রীতিমত বিস্ময়কর।

ইসলামি বিপ্লবের পর নানা প্রতিবন্ধকতা জয় করে ইরানের অর্থনীতিতে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যে নতুন ধারা সূচিত হয়েছে এতে দেশটি বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে (২০১৮ সালে ইরানের অবস্থান ছিল ১৮ এবং বর্তমানে সম্ভবত ১৫ তম)। প্রেসিডেন্ট ড. হাসান রুহানি আশা প্রকাশ করেছেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে ইরান বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির প্রধান ১০টি দেশের মধ্যে স্থান কওে নেবে। ইতোমধ্যে ইরান মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফিকা অঞ্চলে অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে দেশটি এ ধরনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করবে বলে গ্লোবাল রিস্ক ইনসাইটস আভাস দিয়েছে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা ফাও'র তথ্য মতে, ইরান হচ্ছে বিশ্বের প্রধান পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি যে দেশটি কমলা, মাল্টা ও লেবুজাতীয় ফল উৎপাদনে সেরা অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া শশা, ক্ষীরা, খেজুর, বেগুন, ডুমুর, পেস্তা, নাশপাতি, আখরোট ও তরমুজ উৎপাদনে বিশ্বের সেরা পাঁচ দেশের মধ্যে রয়েছে ইরান। খাদ্য ও কৃষিপণ্য উৎপাদন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে অগ্রগামী দেশ ইরান।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি

ইসলামি বিপ্লবোত্তরকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে ইরান। শিক্ষা এক সময় এলিটদের ভূষণ থাকলেও বিপ্লবোত্তর ইরানে সাধারণ ও প্রান্তিক জনমানুষকে এর আওতায় নিয়ে আসা হয়। শুধু তাই নয়, ইসলামি বিপ্লবপূর্ব সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে ইসলামের চেতনায় ঐশী আলোয় আলোকিত হয়। পশ্চিমা বস্তুবাদী শিক্ষার দাপটে প্রায় হারিয়ে যেতে বসা ইবনে সিনা, আল-তুসী, জামী, ওমর খাইয়্যাম ও হাফিজের মতো ক্ষণজন্মা বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিকর্ম ইসলামি বিপ্লবের পর পুনরুদ্ধারের সর্বাত্মক চেষ্টা গৃহীত হয়। ইরানে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৯৬.৬ শতাংশ।

ইসলামি শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিতে দেশের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করাসহ কিছু মৌলিক দর্শনের ভিত্তিতে ইরানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালিত হয় Ministry of Education এর তত্ত্বাবধানে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কার্যক্রম, চিকিৎসা শিক্ষা ও কমিউনিটি কলেজ শিক্ষার সমন্বয়ে গড়া ইরানের উচ্চশিক্ষা পরিচালিত হয় Ministry of Science and Technology ও Ministry of Health and Medical Education এর তদারকিতে। তথ্যসূত্র মতে, শিক্ষা ইরান সরকারের অন্যতম প্রাগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত। সরকার জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ এবং বার্ষিক সরকারি ব্যয়ের প্রায় ২০ শতাংশ এ খাতে ব্যয় করে। ইরান সরকার শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর এ কারণেই ইরানের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বদরবারে স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইরানে ১৫৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৮টি পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, ৫৬৭টি বেসরকারি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ৩৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শাংহাই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত অ্যাকাডেমিক র‍্যাঙ্কিং অব ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিজ (এআরডাব্লিউইউ) ২০২০-এর তথ্য অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল ও ইসলামি দেশগুলোর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যায় র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে ইরান। টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) এর ২০২০ সালের বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকাশিত তালিকায় ইরানের ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। উচ্চশিক্ষার গুণগত মানের কারণে বর্তমানে ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২৯টি দেশের ৪০ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন

টেকনোলজির উদ্ভাবন, ব্যবহার ও এর যৌক্তিক মাত্রা নির্ণয়ে বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের পশ্চাদপদতা মোটা দাগে চোখে পড়ার মতো। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় বিপ্লবোত্তর ইরানের অগ্রগতি এককথায় বিস্ময়কর। নানা রকমের বাধা-বিপত্তি, পাশ্চাত্যের অসহযোগিতা ও অর্থনৈতিক অবরোধ সত্ত্বেও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ইরানি বিজ্ঞানীরা চরম আত্মত্যাগ ও সাধনার পরিচয় দেওয়ায় দেশটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বৈপ্লবিক উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করেছে। বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ইরানের বিজ্ঞানীদের অগ্রগতি সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীদের গড় অগ্রগতির চেয়ে ১১ গুণ দ্রুততর। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্রুত অগ্রগতি বা প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইরান শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী বৈজ্ঞানিক গবেষকদের তালিকায় ১০ জনের

অধিক ইরানি বিজ্ঞানীর নাম রয়েছে। অ্যারোস্পেইস সায়েন্স গবেষণায় ইরান আঞ্চলিক ক্ষেত্রে প্রথম এবং বিশ্বে ১৫তম অবস্থানে রয়েছে। মহাশূন্যে নিজস্ব প্রযুক্তিতে নির্মিত স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে সক্ষম দেশের মধ্যে ইরানের অবস্থান নবম এবং মহাকাশযানে প্রাণী পাঠানোর ক্ষেত্রে ইরানের অবস্থান ষষ্ঠ। ইরানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্কের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০০২ সালে যেখানে মাত্র ১টি পার্ক ছিল এখন সেখানে রয়েছে ৮০টিরও বেশি।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইরান বিগত দু'দশকে বায়োটেকনোলজি বিষয়ে লক্ষ্যণীয় উন্নতি সাধন করেছে। বর্তমানে ইরানে দেড় শতাধিক সরকারি গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দু'শতাধিক বেসরকারি সেন্টার ও কোম্পানি বায়োটেকনোলজি গবেষণা এবং উৎপাদন খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে ইরানের অবস্থান প্রথম এবং এশিয়ায় ১ম সারির ৫টি দেশের অন্যতম। Bio-tech drug উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইরান প্রথম ১২টি দেশের মাঝে অবস্থান করছে।

ন্যানোটেকনোলজি খাতে ইরানের অগ্রগতি বিস্ময়কর। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ন্যানোপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে পাঁচ অগ্রগামী রাষ্ট্রের মধ্যে অদম্য অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে ইরান। তেহরান টাইমস এর সূত্র মতে, বিশ্বের মোট ন্যানোপ্রযুক্তি নিবন্ধে ইরানের ৬ শতাংশ অবদান রয়েছে।। বর্তমানে ইরানে ৩৭০টিরও অধিক কোম্পানি স্বাস্থ্য, নির্মাণ, কৃষি ও প্যাকেজিং, পেট্রোলিয়াম, বস্ত্র এবং যানবাহন নির্মাণ শিল্পে ন্যানোটেকনোলজির প্রয়োগ নিয়ে কাজ করছে। স্বল্প সময়ে ন্যানোটেকনোলজি প্রয়োগ করে এসব খাতে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে।

কম্পিউটার সায়েন্স ও রোবোটিক্স খাতেও ইরানের সাফল্য উল্লেখ করার মতো। ২০১০ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব প্রযুক্তিতে Sorena-2 নামক রোবট তৈরি করে যা IEEE কর্তৃক বিশ্বের ৫টি সর্বোচ্চ প্রযুক্তির রোবটের মাঝে স্থান পায়। একই ধারাবাহিকতায় ইরানের automotive industry দশটি রোবট তৈরি করে। ২০১৫ সালে ইরানের বিজ্ঞানীরা নিজস্ব প্রযুক্তিতে রিমোট বা টেলি সার্জারির কাজে ব্যবহৃত ইবনে সিনা নামের রোবট উন্মোচন করেছেন। ইরান তার নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইতোমধ্যে সুপার কম্পিউটার তৈরিতেও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

মোটর গাড়ি শিল্প আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম বড় মাধ্যম। এখাতেও ইরান উল্লেখযোগ্য সফল্য অর্জন করেছে। দেশটি এখন মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশি গাড়ি নির্মাণকারী দেশ। ইরানে নির্মিত গাড়ি ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি হচ্ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে সাফল্য

গত প্রায় চারদশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইরানের অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। বিপ্লবের আগে যে দেশটির অনেক শহরে ইরানি ডাক্তার খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল, সে ইরানের নাম এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায়। বিশ্বের সেরা ১ ভাগ চিকিৎসা গবেষকদের মধ্যে ৪০ জনের মতো জন ইরানি গবেষক স্থান করে নিয়েছেন। ইরান বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ওষুধ উৎপাদনকারী দেশের একটি। দেশটি বর্তমানে জার্মানি ও ইতালিসহ বিশ্বের ৪৪টি দেশে চিকিৎসা সরঞ্জাম রপ্তানি করছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক ও জটিল পরমাণু প্রযুক্তির ব্যবহারেও ইরানি বিজ্ঞানীরা দর্শনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। ক্যান্সার চিকিৎসায়ও ইরানি বিজ্ঞানীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও ইরানি চিকিৎসকদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরান হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন ও হৃদরোগ চিকিৎসায় শীর্ষে অবস্থান করছে ইরান। অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও কিডনি প্রতিস্থাপনেও ইরানি চিকিৎসকদের দক্ষতা প্রশংসনীয় পর্যায়ের। স্টেমসেল গবেষণার ক্ষেত্রে ইরান প্রথম সারির ১০টি দেশের মাঝে অবস্থান করছে। স্টেমসেল রিপ্লেস করার ক্ষেত্রে বিশ্বে ইরানের অবস্থান দ্বিতীয়। স্বল্প খরচে বিশ্বের আধুনিক ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট মেথড অনুসরণের মাধ্যমে নিঃসন্তান দম্পতিদের সেবা দিচ্ছে। পারস্য উপসাগরের দেশগুলো থেকে অনেক নিঃসন্তান দম্পত্তি ইরানে চিকিৎসা নিতে আসছেন। ইরানি গবেষকগণ 'কোভিরান বারেকাত' নামক করোনাভাইরাসের একটি ভ্যাকসিন আবিস্কার করেছেন। এর মানব পর্যায়ে তৃতীয় ট্রায়াল শুরু হয়েছে।

বর্তমানে এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে মেডিক্যাল ট্যুরিজম ক্ষেত্রে কঠোর প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় ইরানের অবস্থান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশটি দেশের মধ্যে রয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। বিদ্যুৎ সভ্যতা ও আধুনিকতার প্রধান নিয়ামক। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধিও উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সবিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং এরই মধ্যে এ খাতেও ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতার দিক থেকে আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম ইরান। বর্তমানে ইরানের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৮০ হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি। ইরানের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৭৫ ভাগের বেশি হয় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। বাকি বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ইরানে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট, জেনারেশন পাওয়ার প্লান্ট ও রিনিউবেল এনার্জি পাওয়ার প্লান্ট থেকে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরানের অবস্থান এক নম্বর। পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে পর্যায়ক্রমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে দেশটি। নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম উল্লেখযোগ্য উৎস ফুয়েল সেল বা জ্বালানি কোষের প্রোটন বিনিময় ঝিল্লি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন ইরানি বিজ্ঞানীরা। উল্লেখ্য যে, দেশটি বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ খাতে কেবল পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে তাই নয়, একই সাথে দেশটিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এখন অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

জ্বালানি খাতেও ইরানের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ইরান কয়েকটি পেট্রোকেমিক্যাল ও শোধনালয় উন্নয়ন প্রকল্প আছে। এসব প্রকল্পে উৎপাদিত পরিশোধিত পেট্রোল বা বেঞ্জিন এখন বিদেশে রপ্তানি করছে। ইরান বিশ্বের প্রথম সারির চারটি দেশের মধ্যে রয়েছে যারা V 94.2 গ্যাস টারবাইন তৈরি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। তরল গ্যাস তৈরির (GTL) প্রযুক্তি অর্জনে ইরান প্রথম তিনটি দেশের মাঝে রয়েছে। ইরান দেশীয়ভাবে রিফাইনারি, তেল-ট্যাংকার, তেলকূপ খনন, Offshore platform এবং তেল উত্তোলনের ৭০ ভাগ সক্ষমতা অর্জন করেছে। গভীর পানিতে তেলকূপ খনন প্রযুক্তিতে ইরান বিশ্বের অল্প কয়েকটি দেশের মাঝে রয়েছে।

শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগতি

সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনবোধ বিনির্মাণের কলাকৌশল, মানব জীবনের একটি শৈল্পিক প্রকাশ। ইসলাম সুস্থ ও মানবিক চিন্তার বিকাশের পথে সাংস্কৃতিক চর্চার বিরোধী তো নয়ই, বরং সংস্কৃতির উন্নত সংস্করণ উপহার দিতে সক্ষম– এটাই প্রমাণ করেছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান। ইরানে বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে নওরোজসহ সকল স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন ও জোরালো উদ্‌যাপন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মানুষের সুকৃতি আচরণকে বিকশিত করার জন্য ইরান সকল শিল্পমাধ্যমকেই ব্যবহার করছে। এর মধ্যে ইরানি চলচ্চিত্র অন্যতম। ইরানি চলচ্চিত্র আজ বিশ্বে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অস্কারসহ পৃথিবীর সকল ফিল্ম ফেস্টিভালে দাপটের সাথে বিচরণ করছে ইরানি চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের সকল ফেস্টিভালে ইরানি চলচ্চিত্রের সাবলীল বিচরণ দেখা যায়। বাংলায় ডাবিংকৃত ইরানি চলচ্চিত্র বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়। ইরানি চলচ্চিত্রে সচরাচর ধর্মীয় কোনো নির্দেশনা বা ডায়ালগ থাকে না। তবে উপন্যাস ও চরিত্রনির্ভর প্রতিটি ফিল্ম থেকে মানুষ কিছু না কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে যা পৃথিবীর অনেক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি বিশ্বকে দিতে পারেনি। শক্তিশালী চিত্রনাট্য, অসাধারণ ও অভূতপূর্ব অভিনয়, কলাকুশলির মনকাড়া আবেদন ছাড়াও বিশ্বমানের কারিগরি কৌশলের কারণে বিশ্বের সর্বত্র আজ ইরানি সিনেমা ব্যাপকভাবে দর্শক সমাদৃত হচ্ছে। সেইসাথে পুরস্কৃত হচ্ছে শীর্ষ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গনে সবচেয়ে আলোচিত ও সম্মানজনক পুরস্কার অস্কার থেকে শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঘরে তুলে নিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটি।

শুধু চলচ্চিত্র নয়, পেইন্টিংস, ক্যালিগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, মিউজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রকেও ইরানি বিপ্লব ধারণ করেছে এবং লালন করছে। মুসলিম বিশ্বে আর্ট ও পেইন্টিং-এর যে স্বতন্ত্র ধারা চালু হয়, এর কৃতিত্ব অনেকাংশেই ইরান দাবি করতেই পারে। তাদের এ ধারা বিশেষ কোনো প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়; বরং Classical, Traditional, Revolutionary & Modern সকল ক্ষেত্রেই সমানভাবে বিরাজমান। মানুষের সুস্থ বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম খেলাধুলা। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি মানুষের সুস্থ বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি জনগণের ব্যাপক আগ্রহের কারণে খেলাধুলায় ইরানের খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া। ফুটবল থেকে শুরু করে খেলাধুলার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে চলেছেন ইরানি খেলোয়াড়রা। আধুনিক ও বিশেষায়িত পার্ক ও দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য কীর্তি ইত্যাদির কারণে ইরান এখন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণস্থল। দেশটি এখন বিভিন্ন ফেস্টিভাল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, এক্সপো ও আন্তর্জাতিক কার্নিভালের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ইসলামি বিপ্লবের আগে ইরানের প্রতিরক্ষা বা সমর শিল্প ছিল পুরোপুরি পাশ্চাত্যনির্ভর। ইসলামি বিপ্লবের প্রায় দেড় বছর পর পাশ্চাত্যের ইশারায় ইরানের উপর চাপিয়ে দেয়া দীর্ঘ ৮ বছরের যুদ্ধের সময় বিকশিত হয় ইরানের প্রতিরক্ষা বা সমর শিল্প। ইরানের প্রায় ছয় লাখ সক্রিয় সেনা সদস্য ও তিন লক্ষাধিক রিজার্ভ সেনাসহ দশ লাখেরও বেশি 'বাসিজ' নামক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী রয়েছে। প্রচলিত সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্র-শস্ত্রে ইরান এখন পুরোপুরি স্বনির্ভর, এমনকি অপ্রচলিত বা অত্যাধুনিক অনেক সমর-সম্ভারেও প্রায় স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। ইরানের রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপক নৌযান ও রাডারসহ অনেক অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সফ্‌ট প্রযুক্তির অধিকারী ইরান। ইরান বিমান প্রতিরক্ষা তথা বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ও রাডার সিস্টেম

খাতেও ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে ইরান সুপারফাস্ট এন্টি সাবমেরিন তৈরি করেছে। লেজার টার্গেটিং প্রযুক্তির অস্ত্রের ক্ষেত্রে ইরান বিশ্বের পাঁচটি দেশের অন্যতম– যাদের চালকবিহীন বিমান (ড্রোন) নির্মাণ সক্ষমতা রয়েছে। সম্প্রতি ইরান বড় আকারের কৌশগত ড্রোন 'গাজা' উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ড্রোন শক্তিতে আরও এক ধাপ এগোল। এই ড্রোন একটানা ৩৫ ঘণ্টা আকাশে উড়তে পারবে।

ইরানের আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষা কৌশলের প্রধান স্তম্ভ হলো অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র। ক্ষেপণাস্ত্র শক্তিতে দেশটির অবস্থান এখন বিশ্বে চতুর্থ। ইরানের হাতে রয়েছে 'ইমাদ' ও 'ফজর' এর মতো উন্নত প্রযুক্তির ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। সম্প্রতি দেশটি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'নাইন দেই' ও রাডার ব্যবস্থা 'কুদ্‌স' উদ্বোধন করেছে। নাইন দেই শত্রুর ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান, বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা এবং ড্রোন ধ্বংস করতে সক্ষম। আর কুদ্‌স রাডার ব্যবস্থা সহজে মোতায়েন ও স্থানান্তরযোগ্য। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এই রাডার অত্যন্ত কার্যকরী হবে বলে সমর বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম স্টিল্‌থ ধরনের অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমান 'কাহের-৩১৩' সহ ইরানের নিজেদের তৈরি অনেক যুদ্ধ বিমান রয়েছে। অবরোধ ও নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে গত চার দশকের বেশি সময় ধরে ইরান প্রতিরক্ষা খাতে যে সক্ষমতা অর্জন করেছে সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা শক্তির ভালোই ধারণা রয়েছে। এ কারণেই ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে যতই আস্ফালন করুক না কেন তারা ইরানকে সরাসরি আক্রমণ করতে সাহস করেনি।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি

ইরান একটি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। তবে ইসলামি বিপ্লবের পর মার্কিন সহায়তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও প্রজাতন্ত্রী সরকার এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। ইসলামি সরকারের সম্পূর্ণ শান্তিপুর্ণ পরমাণবিক কর্মসূচির স্লোগান হলো : 'Neuclear energy for all, Neuclear weapon for none.' ইরান পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আইএই এর সদস্য হিসেবে এবং এনপিটি বা পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ। জ্বালানি তৈরি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে দেশটি পারমাণবিক গবেষণা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ইরান পারমাণবিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণসহ পরমাণু রশ্মি বা শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবন ও সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি; খাদ্য সামগ্রির স্টেরিয়ালাইজেশান ও স্বাস্থ্যসম্মত করা; পশু টিকা তৈরি, সংকোচনযোগ্য পলিমারের পাইপ নির্মাণ; বিভিন্ন ধরনের লেজার রশ্মি ব্যবহার এবং হাত-পায়ের ছাপ নির্ণয়ের মতো প্রযুক্তি আয়ত্ত করেছে। এ ছাড়াও আলোক-রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় রশ্মির মতো বিভিন্ন রশ্মির মাধ্যমে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি, দেশকে বাইরের সীমান্ত থেকে আসা পারমাণবিক রশ্মির নিঃস্বরণ বা হামলা থেকে রক্ষা ইত্যাদি কাজে পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। পরমাণু ক্ষেত্রে ইরানি বিজ্ঞানীদের একের পর এক নতুন সাফল্যে দিশাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের দোসর ইউরোপীয় শক্তিবর্গ দেশটির বিরুদ্ধে নানা ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রভাব খাটিয়ে তেহরানের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চলছে। তবে এতদসত্ত্বেও ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে এক চুলও সরে আসেনি; বরং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ অব্যাহত রাখে এবং ২০ সালা পরিকল্পনায় ২০টির বেশি নতুন পরমাণু চুল্লি নির্মাণ এবং অন্তত ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের টার্গেট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইরান ইতোমধ্যে পারমাণবিক গলনযন্ত্র নির্মাণে সফল হয়েছে। এছাড়া, ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড উৎপাদন ও পুরো 'পরমাণু জ্বালানি চক্র' নিয়ন্ত্রণে সক্ষম এলিট ক্লাবের সদস্য দেশ ইরান।

পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে ইরানকে নিবৃত করতে ব্যর্থ হয়ে পশ্চিমা মোড়লেরা শেষ পর্যন্ত তার সাথে একটি চুক্তিতে আসতে বাধ্য হয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য ও জার্মানিকে নিয়ে গঠিত ৫+১ গ্রুপ ২০১৫ সালে জেনেভায় ইরানের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। ২০১৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে ইরানের উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করায় এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আর ইরানও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করা হলে চুক্তির শর্ত রক্ষা বা আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানায়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইরানের সাথে পরমাণু বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

নারীর ক্ষমতায়ন

বর্তমান বিশ্বকে বলা হয় নারীর ক্ষমতায়নের যুগ। এ যুগে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে ইরানের অবস্থান বিশ্বের অগ্রগামী দেশগুলোর মধ্যে প্রথম কাতারে রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলাসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানের নারীদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। ইরানের প্রায় মোট জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ সাক্ষর মানুষের মধ্যে ৪৬ শতাংশ নারী। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী ইরানিদের প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। অথচ বিপ্লবপূর্ব ১৯৭৮ সালে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে নারীর অবস্থান ৫

শতাংশের বেশি ছিল না। উচ্চশিক্ষার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে ইরানি নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয় পর্যায়ে বেড়েছে। ২০০০ সালে যেখানে ইরানি নারীদের অংশগ্রহণের হার ছিল ২৭ শতাংশ বর্তমানে এ হার ৪০ শতাংশেরও বেশি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিপক্ষদের বহুদূর ছাড়িয়ে গেছেন দেশটির নারীরা। বিশ্বে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী বিজ্ঞানীর তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান। ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (সংক্ষেপে এসটিইএম) বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই নারী। কর্মক্ষেত্রে ইরানি নারীদের সাফল্যও চোখে পড়ার মতো। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের কর্মক্ষেত্রে ইরানি নারীদের রয়েছে সরব উপস্থিতি। তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, ইরানে সকল পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পদে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। তিন বছর আগে ইরানে ব্যবস্থাপনা পদে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ। বর্তমানে তা প্রায় ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারি বেসরকারি চাকরির বাজারেও দেশটির নারীদের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন শাখায় নারী কর্মচারীদের সংখ্যাও পূর্বে তুলনায় অনেক বেড়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবীদের প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। কৃষি পণ্যের প্রায় ৪০ শতাংশই উৎপাদন হয় পল্লি নারীদের শ্রমে। ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানি নারীদের গৃহস্থালি কাজেরও মূল্য বেড়েছে। জানা যায় যে, ইরানের বর্তমান মোট দেশীয় উৎপাদন বা জিডিপিতে গৃহিণীদের অবদান ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। উদ্যোক্তা পর্যায়েও নারীরা সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

সার্বিক দিক পর্যালোচনায় বলা যায় যে, ইরানি নারীদের জীবনমানের সূচক, জীবন প্রত্যাশা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অর্জন প্রমাণ করেছে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর দেশটির নারীদের জীবনমান ব্যাপকভাবে বেড়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা যেখানে আজ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোরও এক বড় সমস্যা সেখানে ইরানে নারীর সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নজির সৃষ্টি করেছে। একজন নারী কিংবা তরুণী যদি একাকী রাতের বেলায় পথে হেঁটে যায় তাকেও আলাদা করে ভাবতে হয় না নিরাপত্তার কথা। এটি নারীর সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক বড় সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

সামাজিক সুরক্ষা

গ্লোবালাইজেশনের এ যুগে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা একটি বড় ইস্যু। যে কোনো দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিষয়টি অনেকাংশই নির্ভর করে সেই দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার উপর। ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর দেশটির সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এক্ষেত্রে ইরানের অর্জন দৃষ্টান্তমূলক ও অন্য অনেক দেশের জন্য অনুসরণীয়। যেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো উন্নত দেশের মানুষ সারাক্ষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয় অস্ত্র বহন করতে, বর্ণবৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ, খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, চরম নৈতিক অবক্ষয়, গভীর পারিবারিক সংকট প্রভৃতি যেখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, সেখানে ইরানে বিরাজ করছে উল্টো চিত্র। শিশু ও নারী নির্যাতন, লুটপাট, খুন-খারাবি ও সাইবার ক্রাইম থেকে ইরান অনেকটা মুক্ত। ইরানে বর্তমানে সামাজিক অপরাধ প্রবণতাও অনেক কম। বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেও ইরান সোচ্চার। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বের শান্তিপ্রয়াসী জাতিসমূহকে জাগ্রত করতে ইরান সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

শেষ কথা

আধুনিক বিশ্বে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সার্বিক উন্নয়নের এক রোল মডেল। প্রাকৃতিক সম্পদের আধার ও বিশ্বসভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকারী ইরান বিশ শতকে পাহলভী রাজবংশের শাসনামলে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে এর সম্পদ ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছিল, ঠিক তখনই ১৯৭৯ সালে ইমাম আয়াতুলাহ খোমেইনীর নেতৃত্বে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এর ফলে ইরানে তাগুতি রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং একই সাথে ইরান পশ্চিমা আধিপত্যবাদের হাত থেকে রক্ষা পায়। ইরান পরিণত হয় একটি ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। বিশ শতকের শেষ দিকে ইরানে সংঘটিত ইসলামি বিপ্লব এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কেবল পশ্চিমাদের নয়, মুসলিম বিশ্বেরও সংশয় ছিল। বিপ্লবোত্তর ইরানকে ধ্বংস ও পঙ্গু করে দেওয়ার বিপ্লববিরোধী অভ্যন্তরীণ কুচক্রী মহল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র পশ্চিমাদেশগুলো, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের একটি প্রভাবশালী রাষ্ট্রের নেতৃত্বে আরব বিশ্বের কোনো কোনো দেশের অব্যাহত অপপ্রয়াস, অবরোধের নামে ইরানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার অপতৎপরতা সত্ত্বেও ইরান এগিয়ে গেছে। কোনো অপচেষ্টাই ইরানের অব্যাহত অগ্রগতিকে রোধ করতে পারেনি। বর্তমান বিশ্বে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সুরক্ষা করে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা গঠনে কেবল সফল নয়, বিপ্লবোত্তর ৪২ বছরের পথপরিক্রমায় স্বনির্ভর অর্থনীতির বিকাশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং পরমাণু, মহাকাশ গবেষণা, চিকিৎসা, বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজিসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল শাখায় ঈর্ষণীয় উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের দাবিদার সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতজানু হয়ে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত সেক্ষেত্রে ইরানের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। তদুপরি ইরান ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বমানবতা ও বিশ্ব-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব বর্তমান অর্জনের মাধ্যমে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের অনন্য মডেল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

লেখক : অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

করোনাভাইরাস মহামারিতে নওরোজে ভিন্ন আবহ

রাশিদুল ইসলাম

ফারসি ভাষায় নও نو অর্থ নতুন আর রুজ روز অর্থ দিন। বাংলায় আমরা যেমন বছরের প্রথম দিন নববর্ষ উদ্‌যাপন করি তেমনি ফারসি বছরের প্রথম দিন (২১ মার্চ) ইরান, আফগানিস্তানসহ বিশ্বের অনেক দেশেই এ ফারসি নববর্ষ উদ্‌যাপন হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এসেছে নওরোজ চলো এ বসন্ত লগনে/ঘর ছেড়ে বাঁধি ঘর সবুজ জঙ্গলে, বনে। কিন্তু এবারো মহামারির কারণে গত বছরের মতো নওরোজে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী। তিনি নওরোজে কোনো সফর করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'গত ফারসি নববর্ষ নওরোজে দেশবাসী করোনা মোকাবেলাবিষয়ক কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা মেনে চলেছেন, এর ফলে বড় দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এবারও নওরোজে ব্যাপক ঝুঁকি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে করোনা মোকাবেলাবিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স যা বলবে তা মেনে চলতে হবে। তারা যদি সফরে যেতে মানা করে তাহলে তা মানতে হবে। আমিও নওরোজে কোনো সফরে যাব না।' এর আগে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ফারসি নববর্ষ উপলক্ষে প্রতি বছর মাশহাদে যেতেন, সেখানে ইমাম রেযা (আ.)-এর মাযার যিয়ারত করতেন এবং সেখান থেকেই নববর্ষের বাণী দিতেন। মাশহাদ হচ্ছে সর্বোচ্চ নেতার জন্মশহর।

নওরোজে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার দিনে এই মহামারি কালে উৎফুল্লতা হয়ত থাকবে না প্রকাশ্যে কিন্তু ইরানি মুসলমানরা নওরোজের শুরুতেই দুই হাত তুলে পরোয়ারদিগারের কাছে মুনাজাতে বলবেন, 'হে অন্তর ও দৃষ্টির পরিবর্তনকারী এবং দিন ও রাতের পরিচালনাকারী এবং অবস্থার পরিবর্তনকারী (মহান আল্লাহ)! আমাদের অবস্থাকে সর্বোত্তম অবস্থায় রূপান্তরিত করুন।' এ সময় তাঁদের সামনে টেবিলে বা দস্তরখানে থাকে পবিত্র কোরআন, তসবিহ এবং 'হাফত সিন' নামে খ্যাত সাতটি বিশেষ সামগ্রীসহ আরো কিছু সামগ্রী।

প্রাচীন ইরানিরা নওরোজকে দু'ভাবে বিভক্ত করে পালন করত। পাঁচদিনব্যাপী পালিত নওরোজ– যাতে আপামর জনসাধারণই অংশগ্রহণ করত। বছরের প্রথম দিন পহেলা ফারভারদিন থেকে শুরু হয়ে ৫ ফারভারদিন পর্যন্ত এ উৎসব বিরামহীন চলত। এই পাঁচদিন রাজা-বাদশাহরা জনসাধারণকে বালাখানা বা রাজপ্রাসাদে সাক্ষাৎ দিতেন। তাদেরকে আপ্যায়ন করাতেন। কারাগারের দরজাগুলো খুলে দিয়ে বন্দিদের মুক্তি দিতেন, অভাবী লোকদের অভাব-অনটন দূর করার জন্য চেষ্টা করতেন। মাওলানা রুমীর এক কবিতায় মুক্তির বিষয়টি এসেছে এভাবে– 'যেহেতু নতুন উৎসবের দিন তাই ফিরে এসেছি কারাগারের তালা ভাঙব বলে, আর এই মানুষখেকো কাল চক্রের থাবা চূর্ণ করব বলে।'

তার মানে নওরোজের মতো উৎসব শুধু বসন্তকালে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া নয়, দ্রোহের সঙ্গে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ঋজু হয়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। ইরান, আফগানিস্তান ছাড়াও আলবেনিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, তুরস্ক, বাংলাদেশ, চীন, জর্জিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, ইসরায়েল, কাশ্মীর, কাজাখস্তান, কিরঘিস্তান, নর্দান সাইপ্রাস, রাশিয়া, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, ইউক্রেইন, উজবেকিস্তানসহ নানা দেশে নওরোজ আসে প্রতি বছরে উৎসব নিয়ে। উচ্চারণে দেশ ও ভাষা পার্থক্যে নওরোজের উচ্চারণও বদলে যায়। কোথাও নোরুজ, নাওরোউজ, নিউরজ, নভরুজ, নওরোউজ, নাওরোউজ, নাউরিজ, নুরুজ, নাওরুজ, নাভরুজ, নেভরুজ এমননিভাবে উচ্চারিত হতে থাকে মানুষের মুখে মুখে। আদতে এ উৎসব ইরানি ও জরাথ্রুস্টরা প্রথম শুরু করে। যা ৩ হাজার বছর আগেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, ককেশাস, কৃষ্ণ সাগর উপকূল, বলকান ও দক্ষিণ এশিয়ায় উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ইরানের হাখামানেশী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট দ্বিতীয় সাইরাস বা কুরুশ বাবেল বা ব্যাবিলন জয়ের বছর তথা খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে সর্বপ্রথম নওরোজকে জাতীয় উৎসব হিসেবে ঘোষণা ও পালন করেন। পারস্য সম্রাট প্রথম দারিউশের শাসনামলে এ উৎসব পার্সেপোলিস প্রাসাদ কমপ্লেক্স বা তাখতে জামশিদে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এ উৎসবে উপস্থিত হয়ে ইরান সম্রাটকে নানা উপহার সামগ্রী দিতেন। প্রথম দারিউশ নওরোজ উপলক্ষে খ্রিস্টপূর্ব ৪১৬ সালে স্বর্ণমুদ্রার

প্রচলন করেন। আশকানি ও সাসানি সম্রাটদের যুগেও নওরোজ উৎসব পালিত হতো। সাসানি যুগেই নওরোজ উৎসবের অনুষ্ঠানমালা ও পর্বগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি বিস্তৃত হয়েছিল। নওরোজ ইরানি, কুর্দি, তাজিক ও আজেরি জাতিসহ আরো কয়েকটি জাতির বৃহত্তম জাতীয় উৎসব। জাতিসংঘের সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো নওরোজ উৎসবকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইসলাম ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীরাও নওরোজ পালন করে। সেদিক থেকে এ এক ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবও বটে। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক উৎসব হিসেবে একে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ। নওরোজ মানে উত্তর গোলার্ধে বসন্তের সূচনা। যে মুহূর্তে সূর্য আকাশের নিরক্ষীয় অঞ্চল অতিক্রম করে এবং রাত ও দিনকে সমান করে প্রতি বছর ঠিক সেই ক্ষণকে গণনা করা হয় আর পরিবারগুলো অনুষ্ঠান পালন করতে একত্রিত হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে নওরোজকে ঘিরে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আঙ্গিকে উৎসবের আয়োজন চলে। যেমন আজারবাইজানে নওরোজের প্রস্তুতি শুরু হয় এক মাস আগে থেকে। নওরোজ উপলক্ষে আজারবাইজানে স্বজনদের গোরস্তানে অনেকে যান দোয়া ও প্রার্থনা করতে। দেশটির মানুষরা পানি, আগুন, মাটি ও বাতাসকে নওরোজের উপকরণ হিসেবে মনে করেন।

আবার অনেকে ইরানি কবিতার সেই ছত্র আবৃত্তি করেন, যেমন 'আমার দুর্বলতা তোমাকে দিলাম, তোমার শক্তি আমি নিলাম'। (زردی من از تو، سرخی تو از من) উচ্চারণ করলে দাঁড়ায়, 'জার্দিইয়ে মান আজ তো, শোরখিইয়ে তো আজ মান'। তার মানে নওরোজের উৎসবে মঙ্গল কামনা করে বলা হয় অসুখ-বিসুখ, সংকট যেন অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তিমত্তায় রূপান্তরিত হয়। দশম শতাব্দীর পণ্ডিত বিরুনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল-তাফিম লি আওয়াইল সিনাআত আল-তানজিম'-এ বিভিন্ন জাতির নওরোজে অংশগ্রহণের কথা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রিক, ইহুদি, আরব, সাবিয়ানসহ বিভিন্ন জাতি নওরোজ উৎসব পালন করত। পারস্য ঐতিহাসিক গারদিজি তাঁর 'জাইন আল-আখবার' বইতে জরাথ্রুস্টদের উৎসবপর্বে নওরোজের বিবরণ দিয়েছেন। পার্সেপোলিসেও নওরোজ পালিত হতো শত স্তম্ভের আপাদানা প্রাসাদে। 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'য় দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ইহুদিরা ইরানি শাসকদের

অধীনে এলে উভয় সাংস্কৃতিক উৎসবের একটা অংশ জুড়ে থাকত নওরোজ। এশারবাইতে পুরিমের গল্পে নওরোজের কাহিনী উঠে এসেছে। এমনকি খ্রিস্টপূর্ব ২৪৮ অব্দ থেকে ২২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে পার্থিয়ান বা আর্সাসিড রাজত্ব ছিল আর্মানিয়া ও ইবেরিয়া জাতির, সেই সময়ে নওরোজ পালিত হতো। এছাড়া ৫১-৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভলোগ্যাসের রাজত্বেও পালিত হতো নওরোজ। সাসানি আমলে নওরোজ বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে উদ্‌যাপিত হতো। নগদ উপহার থেকে শুরু করে বন্দিদের মুক্তি দেওয়া সেকালে যা আরো নওরোজে অনুসরণ করা হয়।

৬৫০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের পারস্য যুগ শুরু হয়। আব্বাসি শাসনামলে নওরোজ রাজকীয় উৎসবে পরিণত হয়। আবার রাসূল জা'ফারিয়ান তাঁর 'শিয়া সংস্কৃতিতে নওরোজ' প্রবন্ধে বলেন, হিজরি ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে রচিত দোয়া কবুল সংক্রান্ত 'যাখীরাতুল আখেরা' গ্রন্থে পারস্যবাসীর নওরোজ দিবসের আমল সম্পর্কে একটি অধ্যায় রয়েছে যার ব্যাখ্যায় মু'আল্লা ইবনে খুনবাইস-এর হাদিসটি এভাবে বলা হয়েছে : হযরত ইমাম (জাফর) সাদেক (আ.) বলেন : 'নওরোজে তোমরা রোজা রাখ, গোসল কর, সবচেয়ে পরিষ্কার জামা পরিধান কর, খুশবু ব্যবহার কর, যদি পূর্বের নামাজ ও সুন্নাতগুলো আদায় করে থাক, তাহলে দু'টি সালামের সাথে চার রাকাত নামাজ পড়।'

এ হচ্ছে নওরোজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যময় উপলব্ধি। প্রাচীন রীতিনীতি ও পন্থার অনুসরণে এখনো ইরানিরা সেই মূল্যবোধগুলো মেনে চলছেন। তার মানে শুধু সামাজিক রীতিনীতি বা দেশীয় সংস্কৃতিই নয়, নওরোজের সূচনা পর্বে তথা এই দিনের শুরুতে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয় এইভাবে– ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি ওয়াল আবসার, ইয়া মুদাব্বিরাল লাইলি ওয়ান্নাহার, ইয়া মুহাভ্‌ভিলাল হালি ওয়াল আহওয়াল, হাভ্‌ভিল হালানা ইলা আহসানিল হাল অর্থাৎ হে অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের বিবর্তনকারী, হে রাত ও দিবসের পরিচালনাকারী, হে বৎসর ও অবস্থাসমূহের পরিবর্তনকারী, আমাদের অবস্থাকে উত্তম অবস্থায় পরিবর্তন করুন।

খিলাফতের পর ইরানি রাজবংশগুলোর উত্থানকালেও নওরোজ আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বোয়াইদ শাসকরা প্রাচীনকালের সাসানিদের রীতি অনুসরণ করতে থাকে। ইরানে বোয়াইদ শাসক আদুদ আল-দাওলা নওরোজ উৎসবে বিশাল প্রাসাদে রাজকীয় স্বাগত

জানাতেন অতিথিদের। সোনা ও রুপার প্লেটভর্তি ফল ও রঙ্গিন ফুলের ফুলদানি সাজিয়ে শাসকরা রাজসিংহাসনে বসতেন। রাজকীয় অতিথিরা নওরোজের এ উৎসবে এসে শাসকদের অভিনন্দন জানাতেন। সংগীতশিল্পীরা গেয়ে উঠতেন আর সুরের মূর্ছণা সৃষ্টি হতো– যার মধ্য দিয়ে উৎসব হয়ে উঠত দুর্দান্ত। পরবর্তীতে তুর্কি ও মঙ্গল আগ্রাসনকারীরা নওরোজকে এড়িয়ে গেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকার সময় সেখানে ও ইরান ও আফগানিস্তানে নওরোজ সরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হতো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে নওরোজ জাতীয় ছুটির দিনের মর্যাদা পায়। উৎসব শুরু হওয়ার আগে থেকে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার, নতুন রংয়ে রাঙ্গিয়ে তোলা, স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, খাবার দাবার ও বস্ত্র কেনাকাটা, দাওয়াত ও নিমন্ত্রণে ভরপুর হয়ে ওঠে নওরোজ। শিশু থেকে শুরু করে মুরুব্বিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় উপহারসামগ্রী।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে শিয়া মুসলিমরা নিয়মিত নওরোজ উৎসব পালন করে। এটি চলে আসছে মোগল শাসনামল থেকে। তখন ১৯ দিনব্যাপী নওরোজ উদ্‌যাপিত হতো। ঢাকার নবাব পরিবারও নওরোজ উৎসব পালন করে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কবিতায় উঠে এসেছে নওরোজের শাশ্বত বাণী। এসব কবিতায় তরুণদের শৌর্যের সাথে মানসিক সৌন্দর্যের স্বভাবসুলভ আহ্বান ও হৃদয়গাথার পরিচিতি পাওয়া যায়। ভারতের হায়দ্রাবাদসহ বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিমদের মধ্যে নওরোজ উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে মোগল শাসনামল থেকে। কুতুবশাহী আমলেও এ উৎসবের প্রচলন ছিল। সম্রাট হুমায়ূন ভারতের উত্তরাঞ্চলে এই উৎসবটির প্রচলন ঘটান। এরপর সম্রাট আকবরের রাজত্বের (১৫৫৬-১৬০৫) প্রথম থেকেই নওরোজ উৎসব উদ্‌যাপিত হতে থাকে। এই উপলক্ষে হেরেমবাসিনী নারীরা শখের বশে দোকান সাজিয়ে মীনা বাজার বসাত।

চীনের উইঘু মুসলমান থেকে শুরু করে তাজিক, সালার ও কাজাখ জাতির মধ্যে নওরোজ উদ্‌যাপিত হতে দেখা যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ সিরিয়া বা ইরাকেও নওরোজের উপস্থিতি রয়েছে। পাকিস্তানের গিলগিট-বালতিস্তান, খাইবার পাখতুনখোয়া বিশেষত দেশটির সঙ্গে আফগান সীমান্ত অঞ্চলের বেলুচিস্তানে নওরোজ উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ইসমাইলী সম্প্রদায়েরাও নওরোজে অংশ নিয়ে থাকেন।

শিয়া মুসলিমরা বিশ্বাস করেন তাঁদের সপ্তম ইমাম মূসা আল-কাযিমের বিবৃতি অনুসারে নওরোজের দিন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একমাত্র তাঁরই উপাসনা করার আদেশ দেন, অংশী সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেন। তাঁর এ বাণী নিয়ে যখন ফেরেশতা এই দুনিয়ায় আগমন করেন তখন বিশুদ্ধ বায়ু বইতে থাকে এবং ফুলে ফুলে বসন্ত সেজে ওঠে। জিবরাইল (আ.) এদিন নবিজি (সা.)-এর কাছে আসেন। এদিনই ইবরাহিম (আ.) মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। নওরোজেই নবিজি তাঁর কাঁধে হযরত আলীকে তুলে নেন এবং তিনি কাবা শরীফে রক্ষিত মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। হযরত আলী এদিনই খিলাফতের দায়িত্ব নেন। শিয়া মুসলমানরা নওরোজে বিশেষ রোজা রাখেন।

নওরোজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আয়োজেন বিশাল বৈচিত্র্যে ভরপুর হওয়ায় এ উৎসবের ব্যাপ্তি অন্য যেকোনো উৎসবের চেয়ে দীর্ঘ দিনের হয়ে থাকে। জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়সমূহ নওরোজকে ঘিরে যেন আবর্তিত হতে থাকে। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন, রাত ও দিনের আবর্তন, বিভিন্ন ঋতুর পরিক্রম, পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের পরিক্রম প্রভৃতি মানুষকে দিনক্ষণ, মাস ও বছরের হিসাব-নিকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রকারান্তরে বাধ্যও করেছে। আর এভাবেই বর্ষপঞ্জির জন্ম দিয়েছে। বছরের শেষ দিনগুলো যেমন অন্তিমের সুর তোলে মানবজীবনে এবং কিছুটা হলেও বেদনাকর; তেমনি বছরের শুরুটা মূলত এক নতুনত্বের সূচনা– যা মানুষকে নতুন অনুভূতি, নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সূচনা বা শুরু সব সময়ে আনন্দের হয়ে থাকে। এই খুশি ও আনন্দের অভিব্যক্তির জন্য অর্থাৎ তার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটানোর জন্য মানুষ সমাজে বিভিন্ন ধরনের উৎসব ও আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক কালের ইরানিরা নৈসর্গিক জীবনের সমাপ্তি উপলক্ষে ফারসি সনের শেষ ১১ দিন অর্থাৎ খ্রিস্টীয় হিসাবে ১০ থেকে ২০ মার্চ শোক পালন করত। নওরোজ বা নববর্ষ উপলক্ষে বিশ্বপ্রকৃতিতে নতুন করে জীবনের উপস্থিতিতে এই শোকের সমাপ্তি হতো এবং এ উপলক্ষে আনন্দ উৎসব হতো।

ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ ইরানে বারো মাসে ৪টি ঋতু, যেমন : বাহার (বসন্ত), তাবিস্তান (গ্রীষ্ম), পায়িয (শরৎ) এবং যেমিস্তান (শীতকাল)। এই চার ঋতুর জন্য হাখামানশীদের চারটি ভিন্ন ভিন্ন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছিল। পার্সেপোলিস ছিল তাদের বাহার বা বসন্তকালীন আবাসস্থল এবং নববর্ষ উদ্‌যাপনের কেন্দ্র। প্রাচীন ভাস্কর্য ও নকশাসমূহে পরিদৃষ্ট হয় রাজা (সম্রাট) সিংহাসনে বসে তাঁর প্রজাবর্গ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক প্রতিনিধি বা দূতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এবং তাঁরাও সম্রাটের জন্য উপঢৌকনাদি অর্পণ করছেন। তার মানে নওরোজ উৎসব ইরানের জাতিগত ঐক্য ও সংহতি গঠনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে– যার ধারাবাহিকতা আজও বহাল রয়েছে।

কথিত আছে যে, বাদশাহরা এই দিনগুলোতে সিংহাসন ও মুকুট ত্যাগ করতেন এবং জনসাধারণের রায়ের ভিত্তিতে একজন নতুন বাদশাহ নির্বাচন করতেন– যাঁকে বলা হতো মীর-ই-নওরোজী (নওরোজের অধিনায়ক)। এই মনোনীত বাদশাহর শাসন ও আদেশ ৫ দিন পর্যন্ত রাজা-বাদশাহদের আদেশ-নিষেধের ন্যায়ই কার্যকর হতো। তবে এটা ছিল এক প্রতীকী কর্তৃত্বস্বরূপ।

ড. মাহমুদ বাশীরীর মতে, এই প্রাচীন নিয়ম অনুসরণে এখনও কুর্দিস্তান প্রদেশসহ আরও কোনো কোনো প্রদেশ ও অঞ্চলে এ প্রথাটি চালু রয়েছে। এই প্রথাটির সত্যতা কবি হাফিজের কবিতায়ও পাওয়া যায়। হাফিজ বলেন : 'শোনো, অন্তরলোক থেকে বলছি ফুলের মতো কলি ছেড়ে বেরিয়ে এসো, কারণ, পাঁচদিনের বেশি চলবে না মীরে নওরোজীর ফরমান।'

এই পাঁচদিনকে ইরানি লোকজন 'নওরোজে সাগীর'বলে থাকে– যার অর্থ হচ্ছে ছোট নওরোজ। এই নামটি বর্তমানে প্রচলিত নেই। তবে সে অতীতকালের অনেক নিয়ম এখনও বিদ্যমান। বর্তমানকালেও সমগ্র ইরানব্যাপী ফারভারদিন মাসের প্রথম পাঁচদিন সাধারণ ছুটি রয়েছে এবং তাঁরা অতীতের মতোই উৎসব আনন্দে মেতে থাকেন। এরপর একটি বিশেষ শ্রেণি ফারভারদিন মাসের ১৩ তারিখ পর্যন্ত আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে থাকে। ইরানিরা এই ১৩ তারিখটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং একে বলেন 'সিযদা বেদার'। ফারসি ভাষায় 'সিযদাহ মানে তেরো। আর 'বেদার' অর্থ ঘরছাড়া। এই দিন ঘরে থাকা তাঁদের জন্য দূষণীয়। সবাই পার্ক, মাঠ-ময়দান বা অনুরূপ বিশেষ স্থানে বেড়াতে যান এবং সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরে আসেন। এ দিনটি সর্বজনীন ছুটির দিন।

প্রাচীন ইরানি জাতির বিশ্বাস পহেলা ফারভারদিন আল্লাহ বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া প্রজ্ঞার প্রতীক সাতটি নক্ষত্রও এইদিন সৃষ্টি হয়েছিল বলে তাঁদের বিশ্বাস– যা ইরানের প্রাচীন মনীষী বা জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সাত আসমানি পিতা নামে অভিহিত। পানি, মৃত্তিকা, অগ্নি ও বাতাস– এই চারটি উপাদানের ওপর উক্ত সাতটি নক্ষত্রের প্রভাবের কারণে যে তিনটি বস্তু সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে জড় পদার্থ, বৃক্ষ ও প্রাণীকুল, আর এই চারটিকে বলে 'উম্মাহাতে আরবা' বা চার জননী। প্রাচীন ইরানিদের বিশ্বাস মতে প্রথম মানব আদমও বসন্তের এই প্রথম দিনে সৃষ্ট। হাফেজ শিরাজীর একটি গযল যা'বার-ই-আমানাত' (আমানাতের বোঝা) নামে খ্যাত, তা এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট।

এখনো অতীতের আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে নওরোজ উপলক্ষে বিশেষ ধরনের দরস্তরখান বিছানো হয় এবং তার ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রতীকী সাতটি উপকরণ যেগুলোর নাম ফারসি বর্ণমালার 'সীন' (সাত সীন) নামে বিখ্যাত। হাফ্‌ত সীন্‌ সাধারণত এমন হয়ে থাকে। এগুলোহচ্ছে :

সাবযেহ (সবুজাভ) : গম বা ডালের কচি চারার গুচ্ছ যা নওরোজের অব্যবহিত পূর্বে গজিয়েছে একটা ট্রে বা প্লেটের ওপর বসিয়ে হাফ্‌ত সীন্‌ দস্তরখানায় রাখা হয় যা নব জীবনের প্রতীক।

সামানু : কচি গম, বার্লি বা অন্যান্য শস্যদানার আটা দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের হালুয়া যা প্রাচুর্য ও নেয়ামতের প্রতীক।

সেনজাদ : একপ্রকার শুষ্ক ফল যা ভালোবাসা ও প্রেমের প্রতীক।

সীর (রসুন) : সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের প্রতীক।

সোম্মাগ : মসুরের ডালের চেয়ে সামান্য বড় লাল রঙের টক ফলবিশেষ যা উদীয়মান সূর্যের প্রতীক।

সিরকা : দীর্ঘায়ু ও ধৈর্যের প্রতীক।

সোমবোল : ছোট আকারের ফুল ও উদ্ভিদবিশেষ যা বসন্তের আগমনবার্তা বহন করে নিয়ে আসে।

সেক্কেহ্‌ (কয়েন বা মুদ্রা) : সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রতীক।

ইরানে বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও মিলন ঘটে যা অন্য কোন দেশে পাওয়া দুষ্কর। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং সুপ্রাচীনকালে ইরানিদের ধর্মবিশ্বাস ও জাতিসত্তার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রান্ত হয়। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে এক খোদার ইবাদত এবং শির্‌ক ও বহু দেব-দেবীর পূজা প্রতিহতকরণ। জরাথ্রুস্টীয় ধর্ম এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। জরাথ্রুস্টীয় ধর্মমতে আহুরমায্‌দার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা হয় যাতে তাওহীদে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে।

ইসলামের আবির্ভাব বিশেষত ইরানিদের ধর্ম ও জাতীয় ধ্যান-ধারণার সাথে ইসলামের শান্তিবাদী আচরণের কারণে ইরানিদের ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তাঁদের আগেকার কতক ধ্যান-ধারণা ও রসম-রেওয়াজ অব্যাহত থাকে। অবশ্য ইরানবিজেতা আরব মুসলমানদের ইরানিদের সাথে সদয় আচরণের কারণে তাঁরা ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে বরণ করে নেন এবং তাঁদের আদর্শ ব্যক্তিবর্গ, বীরপুরুষ ও প্রাচীন কাহিনীগুলোকে ইসলামের রঙে রঙিন করে নেন।

প্রাচীন ইরানিদের কিছু কিছু উপলক্ষ ও রেওয়াজ তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও জনগণের ধ্যান-ধারণার সাথে মিশে গিয়েছিল। নওরোজ এর অন্যতম। সুদীর্ঘ কয়েক সহস্রাব্দের পুরনো এ ঐতিহ্যটি ইরানের মুসলমানদের মনে একটা স্থায়ী আসন তৈরি করে নিয়েছে। এখনও ইরানের অধিকাংশ লোকই পুরাতন বছরের বিদায় ও নতুন বছরের আগমনক্ষণে নতুন পোশাক পরিধান করে মিষ্টিমধুর আচরণসহকারে পবিত্র স্থানে বা পরিবারের মুরুব্বিদের সাথে কাটাতে পছন্দ করেন। সে মুহূর্তে তাঁরা কুরআন তেলাওয়াত করে ও দু'হাত তুলে মহান আল্লাহর কাছে নিজেদের ও পরিবারবর্গের জন্য একটি সুন্দর এবং সুস্থতা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ বছর কামনা করেন। নওরোজে পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময়, কারও প্রতি রাগ বা ক্ষোভ থাকলে পরস্পরকে ক্ষমা করে দেয়া এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা আরেক রীতি। এছাড়া এ দিনে তাঁরা এমন সব ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যান যাঁরা পুরাতন বছরে কোন প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে আছেন। এভাবে নওরোজ প্রাচীন ইরান থেকে পর্যায়ক্রমে বর্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলামের পছন্দনীয় রীতি-নীতিগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই ইসলামের মূলনীতির সাথে এর কোন বিরোধ নেই; বরং নওরোজ উৎসব ইরানি সমাজের জন্য নৈতিক ও সামগ্রিক শিক্ষার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

আল-কুদস দিবস, ইমাম খোমেইনী ও এবারের যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের বিজয়

মুজতাহিদ ফারুকী

মসজিদুল আকসা ও আল কুদস দিবস : এবারের পবিত্র আল কুদস দিবস ছিল ১০ মে তারিখে। প্রতি বছর রমজানের শেষ জুম্মাবারে এই দিবস পালিত হয়ে আসছে গত প্রায় চার দশক ধরে। ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পর বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেইনী এই দিবস ঘোষণা করেন। এ ঘষোণার তাৎপর্য যে কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী তা স্পষ্ট হয়, এই দিনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে। প্রতি বছর তারা এই দিনে পবিত্র মসজিদুল আকসায় মুসলমানদের জুমাতুল বিদা পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং গায়ে পড়ে সংঘর্ষ বাঁধায়। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে ব্যতিক্রম ঘটেছে মুসলমানদের মরণপণ সংগ্রামে, প্রতিরোধে। ইসলামের প্রথম কিবলা পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাস বা আল-কুদ্‌স আশ-শরিফ। যেটি আল আকসা মসজিদ নামে পরিচিত। হযরত ইয়াকুব (আ.) এ পবিত্র মসজিদের প্রথম নির্মাতা। পরবর্তী সময়ে হযরত দাউদ (আ.) ও তাঁর পুত্র সুলাইমান (আ.) এ মসজিদের পুনঃনির্মাণ করেন। ইসলামের পবিত্র তিনটি মসজিদের এটি একটি। জেরুজালেম, আল-আকসা মসজিদ এবং তার আশপাশের এলাকা ইসলামের বহু নবীর স্মৃতিবিজড়িত। এখানে রয়েছে অসংখ্য নবী-রাসূলের মাজার। ওহি ও ইসলামের অবতরণস্থল এ নগরী নবীদের দ্বীন প্রচারের কেন্দ্রভূমি। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সা. 'মসজিদুল হারাম' অর্থাৎ ক্বাবা শরিফ থেকে 'মসজিদুল আকসা' হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে পবিত্র মেরাজ শরিফ সম্পন্ন করেন। তাই এ পবিত্র নগরীর প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি মোমিনের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত। এই পবিত্র নাম শুধু একটি স্থানের সঙ্গে জড়িত নয়; বরং তা সব মুসলমানের বিশ্বাস, তাদের অন্তর্গত অনুভূতি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশ্বের সব মুসলমানের মনে এ মসজিদের জন্য ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফিলিস্তিনে বিনা রক্তপাতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু ১০৬৯ সালে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। ১১৮৬ সালে কুর্দী বীর গাজী সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী খ্রিস্টান শক্তির হাত থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসসহ ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করেন। এর পর থেকেই ইহুদিবাদীরা ও তাদের দোসর খ্রিস্টানরা নানা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় এ পবিত্র ভূমি দখল করার জন্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইহুদিরা তুরস্কের খলিফা আবদুল হামিদের কাছে ফিলিস্তিনে জমি কেনার প্রস্তাব দেয়। খলিফা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পশ্চিমা মিত্র শক্তিকে গোয়েন্দাগিরিসহ নানাভাবে সহায়তা করে ইহুদিরা ব্রিটিশ সরকারের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন দখল করে এবং একজন ইহুদিকে ফিলিস্তিনের গভর্নর নিয়োগ করলে তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নের পথ খুলে যায়। ইহুদিবাদের সাথে গোপন চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি। তারা যাদের কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে সেই মুসলমানদের দুর্বল করতে তাদের বুকের উপর অর্থাৎ ফিলিস্তিনে ইসরাইল নামের অবৈধ রাষ্ট্র চাপিয়ে দেয়। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের ৫৪% খাস ভূমির উপর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রস্তাব পাশ করে। এর সূত্র ধরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর ১৯৪৮ সালের ১৫ মে 'বেলফোর ঘোষণা'র মাধ্যমে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্ম দেয়। এর পর থেকে শুরু হয় ফিলিস্তিনের জনগণের উপর নির্মম নির্যাতনের পালা। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়। তারা উদ্বাস্তু হিসাবে লেবানন, সিরিয়া জর্ডানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সারা বিশ্ব থেকে ইহুদিদের এনে মুসলমানদের ঘর-বাড়িতে বসিয়ে দেয় ব্রিটিশ আমেরিকার মদদপুষ্ট ইসরাইল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল প্রতিবেশী আরব দেশ জর্ডান, সিরিয়া ও মিসরের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করে। ওদের নির্যাতন-নিপীড়ন বাড়তেই থাকে। প্রতিনিয়ত ওরা হত্যা করে চলেছে ফিলিস্তিনের নারী-শিশু বৃদ্ধ তথা সাধারণ মানুষকে। ১৯৭৩ সালের যুদ্ধেও আরবরা একরকম পরাস্ত হয়। কারণ, আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যে ততদিনে ইসরাইল বিপুল শক্তি অর্জন করে। ১৯৮২ সালে ইসরাইল লেবানন দখল করে ২০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করে। ১৯৬৯ সালে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ওআইসি বা ইসলামি সম্মেলন সংস্থা। ১৯৭৪ সালে ইসরাইল আল-আকসা মসজিদে খনন কাজ শুরু করে। ১৯৭৯ সালে ন্যক্কারজনকভাবে মিসরের প্রেসিডেন্ট ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে কাম্প ডেভিড চুক্তি করেন। ১৯৬৪ সালের ৮ মে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্যে পিএলও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) গঠিত হয়। ইয়াসির আরাফাত ছিলেন এর নেতা। তিনিও এক সময় ইসরাইলের সঙ্গে আপোসের পথ ধরেন। ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পর আল-কুদ্‌স মুক্তির আন্দোলন নতুন দিশা খুঁজে পায়। বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেইনী (র.) আল-কুদস মুক্ত করার জন্য বিশ্বমুসলিমের প্রতি আহ্বান জানান। দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে

ইমাম খোমেইনী বলেছিলেন, 'দিবসটি কেবল কুদসের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। এই দিবস বলদর্পী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত জনতার দিবস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ যেসব দেশের জুলুম অত্যাচারে বিভিন্ন দুর্বল দেশ পিষ্ট হয়েছে তাদের রুখে দাঁড়ানোর দিবস। এই দিবস বলদর্পীদের বিরুদ্ধে নিগৃহীতদের সুসজ্জিত হবার দিবস।' তাই আল-কুদস দিবস হলো শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়-অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার এক জ্বলন্ত প্রতীক, বিশ্বমানবতার পক্ষে, সত্য, ন্যায় ও মানবাধিকারের পক্ষেও এক অনন্যসাধারণ মানবিক আহ্বান। ইমাম খোমেইনী ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং আল-কুদস দিবস পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে ওঠার একটি মঞ্চ তৈরি করে দেন যা অন্য কোনও আরব বা ইসলামি বিশ্বের নেতা কখনও করেননি। এখানেই খোমেইনীর কৃতিত্ব, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। এক ভাষণে কুদস দিবসের করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, বিশ্ব কুদস দিবসে মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা-সমাবেশের আয়োজন করে নিজ নিজ দেশের সরকারগুলোর কাছে জোরালো দাবি জানানো যাতে তারা অস্ত্রশক্তি ও তেল অস্ত্র নিয়ে আমেরিকা এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামে। যদি তা না করে তবে চাপ প্রয়োগ, ধর্মঘট পালন ও হুমকি প্রদর্শন করে তাদেরকে সে কাজে বাধ্য করতে হবে। কারণ, ইহুদিবাদী ইসরাইল সমগ্র আরব বিশ্ব, এমনকি মক্কা ও মদীনা শরীফ দখলেরও হুমকি দিচ্ছে।

ইমাম খোমেইনী 'আল-কুদ্‌স' দিবসের ঘোষণা দিয়ে এ দিন সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণার আহ্বান জানান। ফলে আল-কুদ্‌স মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ফিলিস্তিনের আপোসকামী নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে উঠে আসে প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাস'। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের সংগ্রামী শিশু-কিশোররা ইসরাইলি সশস্ত্র হানাদার বাহিনীর উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপের মাধ্যমে 'ইন্তিফাদা' আন্দোলনের জন্ম দেয়। হামাস এবং ইন্তিফাদাহর ফলশ্রুতিতে তিন তিন বার ইসরাইলি পরাশক্তি সংগ্রামী ফিলিস্তিনি জনগণের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হয়। ইমাম খোমেইনীর ঘোষিত দিবসটি আজ মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য উদাহরণ। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে, নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতা ও সত্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এ দিবসটি সব সময়ই বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তাই পশ্চিমা ও ইসরাইলি গণমাধ্যম সব সময়ই এ দিবসকে খাটো করে দেখানো এবং এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে। তারপরও এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মিছিলে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতির বিষয়টিকে তারা কখনই জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে পারেনি।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এবং আর্থিক সুবিধা পাবার লোভে ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পর ফিলিস্তিনি ও ওই অঞ্চলের বৃহত্তর আরব জনগণের মধ্যে ইসরাইলের প্রতি বিরূপতা আরও বেড়েছে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান মুসলিম উম্মার ইস্যুতে আরও বেশি সোচ্চার ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। আর এসব দেখে মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ইসরাইলের। সেই সঙ্গে আছে দেশটির চরম জঙ্গীবাদী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর ক্ষমতা হারানো ও কারাবন্দি হবার ভয়। ঘুষ খাওয়া, দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া এবং বিশ্বাস ভঙ্গ করার মতো বেশ কয়েকটি গুরুতর অপরাধের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ইসরাইলের আদালতে একাধিক মামলা রয়েছে। অভিযোগগুলির পেছনে জোরালো তথ্যপ্রমাণ আছে বলে জানা যায় ইসরাইলেরই গণমাধ্যমের খবরে। সুতরাং ক্ষমতা হারালে নেতানিয়াহুকে জেলে পচতে হবে এটা একরকম নিশ্চিতই। আবার ক্ষমতাও যে তাঁর হাতে থাকবেই এমন নিশ্চয়তাও তিনি পাচ্ছিলেন না, জনপ্রিয়তায় ধস নামার কারণে। এখন আগামী দু'বছরের মধ্যে যে নির্বাচন হবে তার আগে জনপ্রিয়তা বাড়ানো বা ভোটব্যাংক নিশ্চিত করার একটি জরুরি এজেন্ডা তাঁর সামনে রয়েছে। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সেই এজেন্ডার অংশ বলে অনেক আরব বিশ্লেষকই মনে করেন।

এবারের যুদ্ধ : গত ১০ মে জুমাতুল বিদার দিন জেরুসালেমে মসজিদুল আকসায় মুসলমানদের নামাজ পড়তে বাধা দেয় ইসরাইলি পুলিশ। বরাবরের মতোই বাধা দিতে পারে এমন আশঙ্কায় বহু ফিলিস্তিনি সেদিন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। মসজিদে পুলিশ প্রবেশের পথে ব্যারিকেড দিয়ে তারা ভেতরে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। আল কুদস দিবসের এই বিক্ষোভও তাদের নিয়মিত কর্মসূচির অংশ। পুলিশ যথারীতি তাতে বাধা দেয় এবং বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে। পুলিশের হামলায় প্রায় ৩০০ ফিলিস্তিনি আহত হয় যাদের মধ্যে চারজনের অবস্থা ছিল গুরুতর। গ্রেফতার করা হয় বিপুল সংখ্যককে। এই হামলা এমন সময় চালানো হয় যখন গোটা ফিলিস্তিনি জনগণ ছিল ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদমুখর। ক্ষোভের কারণ, ওই

একই সময়ে ইহুদি রাষ্ট্রটি প্রায় সপ্তাহখানের ধরে নগরীর শেখ আল জাররাহ উদ্বাস্তু শিবিরের ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে জোর করে গণহারে উচ্ছেদ করছিল এবং সেসব ঘরবাড়ি ইহুদি দখলদাররা দখল করে নিচ্ছিল। এই গায়ের জোরে উচ্ছেদের সময় যে নির্যাতন করা হয় তা নজীরবিহীন। প্রতিবাদকারীদের মাটিতে ফেলে মাথা হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছে ইহুদি পুলিশ এমন দৃশ্য আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রকাশ পায়। স্বভাবিকভাবেই পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত বারুদের মতো দাহ্য। মসজিদে হামলার ঘটনা ও আল জাররায় উচ্ছেদের প্রতিবাদে ফিলিস্তিনি বিভিন্ন গ্রুপ ইসরাইলে রকেট হামলা চালায়। এসব হামলায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু জবাবে ইসরাইল দেশের একপ্রান্তে অবস্থিত ছোট্ট একটি অবরুদ্ধ এলাকা গাজায় জঙ্গিবিমান দিয়ে বোমা ফেলতে শুরু করে। সেই বিমান হামলায় প্রথম দিনেই ২০ ফিলিস্তিনি নিহত ও বেশ কিছু ভবন ধ্বংস হয়।

গাজায় ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল হামাস ক্ষমতায়। ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের যে প্রতিরোধ সংগ্রাম তার অন্যতম সেরা শক্তিশালী দল এখন হামাস। তাই ইসরাইল গাজায় হামলা চালিয়েছে হামাসকে ধ্বংস করতে। পরবর্তী ১১ দিন ধরে অব্যাহতভাবে হামলা চালিয়ে গেছে ইসরাইল। বেছে বেছে গাজার সব গুরুত্বপূর্ণ ভবন গুড়িয়ে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। ছাড় পায়নি বিশ্বখ্যাত গণমাধ্যম ও টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আল জাজিরা ও আমেরিকান বার্তা সংস্থা এপির অফিস ভবনও। ১১ দিনের উপর্যুপরি হামলায় নিহত হয়েছে ২৪৮ জন ফিলিস্তিনি। এর মধ্যে আছে ৬৬টি শিশু ও ৩৯ জন নারী। আহত হয়েছে ১,৯১০ জন। আর বাড়িঘর হারিয়ে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে ১,৯১০ জন ফিলিস্তিনি। এর বিপরীতে হামাস হাজারে হাজারে মিসাইল ছুঁড়েছে এটি ঠিক। কিন্তু সেগুলোর কার্যকারিতা সামান্যই। ইসরাইলের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার প্রযুক্তি অনেক শক্তিশালী। ফলে হামাসের হামলায় ইসরাইলের পক্ষে মারা গেছে মাত্র ১২ জন ইসরাইলি। এর মধ্যে দুটি শিশু আর তিনজন বিদেশি শ্রমিক।

তার পরও হামাসের জয়?

রকেট হামলা চালিয়ে ইসরাইলের তেমন কোনও ক্ষতি করতে না পারলেও হামাস এই যুদ্ধে বিজয় দাবি করেছে। কিভাবে এটিকে বিজয় হিসাবে দেখা যেতে পারে? চলুন দেখে নেয়া যাক। ১১ দিনের হামলা শেষে নেতানিয়াহু বা ইসরাইলের মন্ত্রিসভা যখন যুদ্ধবিরতি মেনে নিলো তখন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি সেই মধ্যরাতেই রাজপথে ছুটে আসে। তারা রাতভর উল্লাস করে। জঙ্গিবিমানের নির্বিচার হামলা, মৃত্যুর মুখোমুখি ১১টি নিদ্রাহীন রাতের পরও ২১ মে'র সেই রাতটিও নিদ্রাহীন কাটে তাদের। তবে এই নির্ঘুম রাত্রিযাপন ছিল উল্লাসের, আনন্দের। কারণ, সাধারণভাবে সব ফিলিস্তিনিই এটিকে তাদের বিজয় হিসাবেই দেখছিল এজন্যে যে, নেতানিয়াহু একেবারে নিঃশর্তভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও তিনি দাবি করেছেন, তাঁর বিমান বাহিনী হামাসকে শিক্ষা দিয়েছে, তাদের সুড়ঙ্গপথের নেটওয়ার্ক ও রকেট কারখানা ধ্বংস করেছে এবং ২৫ জন সিনিয়র নেতাসহ ২০০ হামাস যোদ্ধাকে খতম করেছে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি নেতারা বলছেন, তাঁরা দুটি শর্ত মেনে নিতে ইসরাইলকে বাধ্য করেছেন। হামাস নেতা আবদেল লতিফ আল-কানো বলেছেন, দুটি শর্ত হলো, আল আকসায় পুলিশ মোতায়েন করা যাবে না এবং শেখ জাররাহ থেকে কোনও ফিলিস্তিনি পরিবারকে জোর করে উচ্ছেদ করা যাবে না। তবে এই শর্তারোপ করতে পারাই তাঁদের বিজয় দাবির মূল কারণ নয়। যে কারণে তাঁরা বিজয় দাবি করেছেন সেটি হলো, ফিলিস্তিনি জনগণের সুদৃঢ় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটেছে এবারের প্রতিরোধে। আর গোটা বিশ্ব ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি হামলার বিষয়ে অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছে।

হামাসের বিজয় দাবির অনুকূলে এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, নিজেদের বিজয়ের ব্যাপারে ফিলিস্তিনিদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। তারা ঈদুল ফিতরের এক সপ্তাহ পর শুক্রবার সকালে সমবেতভাবে ঈদুল ফিতরের দোয়া পাঠ করেছে এবং ঈদের খুৎবা দিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেছে। এরপর সবাই মিষ্টিমুখ করেছে, মিষ্টি বিতরণ করেছে। বিমান হামলার কারণে তারা এবার ঈদের জামাত পড়তে বা উৎসব পালন করতে পারেনি। অন্যদিকে নেতানিয়াহুর পরাজয় এখানেই যে, তাঁর জনগণ এটিকে বিজয় মনে করছে না। বরং নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ার ঘটনাটি তারা পরাজয় হিসাবেই দেখছে। শুনুন ইহুদি জঙ্গিবাদীদের মন্তব্য। ইসরাইলের নিউ হোপ পার্টির নেতা গিডিওন সা'র যুদ্ধবিরতিকে বলেছেন, 'বিব্রতকর'। বলেছেন, বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা সংস্থা ও বিমান বাহিনী ব্যবহার করেও নেতানিয়াহু হামাসের কাছ থেকে কেবল একটি 'শর্তহীন যুদ্ধবিরতি' আদায় করতে পেরেছেন। ইসরাইলের সংসদ বা নেসেটের চরমপন্থী সদস্য ইতামার বেন গবির বলেন, 'এই বিব্রতকর যুদ্ধবিরতি হলো হামাসের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ।'

গাজায় পরাজয়ের কথা স্বীকার করে ইসরাইলের

অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আইজ্যাক ব্রিক, একটি রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, প্রমাণিত হয়েছে, তেল আবিব কয়েকটি ফ্রন্টে একসঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে মহাবিপর্যয়ের মুখে পড়বে। তিনি বলেন, যখন হিজবুল্লাহও যুদ্ধে নামবে তখন আমরা কীভাবে তা মোকাবেলা করব?

গাজার ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক আদনান আবু আমের বলেন, এবারের যুদ্ধে হামাস সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই বিজয়ী হয়েছে বলে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সাধারণভাবে ঐকমত্য দেখা গেছে। কারণ, ইসরাইলের বস্তুগত ক্ষতি খুব একটা করতে না পারলেও গোটা বিশ্বের সামনে ইসরাইলের ভাবমূর্তিতে মারাত্মকভাবে আঘাত করতে পেরেছে। এবারই ইসলামি, আরব ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের বৃহত্তম অংশ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তাঁর সরকার ইসরাইলের সমর্থনে আগের মতোই ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে যা লজ্জাজনক। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসে এবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে ইসরাইলকে বাড়তি সামরিক সাহায্য দেওয়ার একটি উদ্যোগ। দুজন সদস্য এই সহায়তা বন্ধের দাবিতে বেসরকারি বিল জমা দিয়েছেন। এতে সাহায্যদান বন্ধ হবে কিনা সেটি পরের কথা, কিন্তু এটি ইসরাইলের প্রতি মার্কিনিদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে ভূমিকা রাখবে তাতে সন্দেহ নেই।

যুদ্ধবিরতির পর স্বাগত জানিয়ে বিশ্বের বহু দেশ শান্তির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য উভয় পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনও শান্তিপ্রক্রিয়া আদৌ নেই। ইরান এ বিষয়ে সোচ্চার শুধু নয়, সর্বতোভাবে সক্রিয়। ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা সম্প্রতি ফিলিস্তিনি নেতাদের চিঠির জবাবে তাদের সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে সব সময় তাদের পাশে থাকার আশ্বাস ও অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন।

ইসরাইলের ফিলিস্তিন দখল বিশ্ব মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক একটি ধর্মীয় ক্ষত। এই ঘটনা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হাহাকারের মতো প্রতিনিয়ত অনুরণিত হয়। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর শাসকদের অনৈক্য এবং বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্র ও সংগঠনগুলোর অব্যাহত ষড়যন্ত্রের কারণে ফিলিস্তিনিরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বিশ্ববাসীর অজানা নয় যে, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, ইসরাইল ও তাদের ইউরোপীয় এবং অন্য সাম্রাজ্যবাদী সহযোগীরাই বিশ্বে যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও অশান্তি সৃষ্টির প্রধান হোতা। এটা স্পষ্ট যে, ইহুদিবাদী দখলদারদের নাগপাশ থেকে ফিলিস্তিন ও আল আকসা মুক্ত না করা পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই কুদস মুক্তির জন্য সংগ্রামরত ফিলিস্তিনি এবং অন্যান্য সংগ্রামীর নৈতিক সমর্থনসহ সব ধরনের সাহায্য-সমর্থন দিতে হবে। এ ছাড়াও আমেরিকা ও ইসরাইলের মতো যেসব দেশ বিশ্বে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রচারণাগত তথা সর্বাত্মক ক্রুসেড চালিয়ে যাচ্ছে তা মোকাবিলার জন্য মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে হবে। আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বিশ্বের মুসলিম দেশ ও আরব বিশ্ব এ বিষয়ে সোচ্চার হলে একদিন সেই সময়ও আসবে যখন ইসরাইলকে সন্ত্রাসী, যুদ্ধাপরাধী ও মানবতার দুশমন হিসাবে হাতেনাতে পাকড়াও করা হবে। আর এভাবেই একটি স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর অংশীদার ফিলিস্তিনিদের ওপর ইহুদি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত জুলুম-নিপীড়নের চিরতরে অবসান ঘটবে।

আন্তর্জাতিক আল-কুদ্‌স দিবস উপলক্ষে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক আল-কুদ্‌স দিবস উপলক্ষে গত ৭ই মে শুক্রবার বিকাল ৩টায় আল-কুদস কমিটি বাংলাদেশ এর উদ্যোগে এক ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক ও আল-কুদ্‌স কমিটি বাংলাদেশ এর সভাপতি অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মাদ রেজা নাফার। এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট এ. কে. এম বদরুদ্দোজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক জামাল উদ্দিন বারী, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ড. মওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান ও দৈনিক আজকের ভোলার সম্পাদক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শওকাত হোসেন। ওয়েবিনার সঞ্চালনায় ছিলেন আল-কুদ্‌স কমিটি বাংলাদেশ এর সেক্রেটারি জেনারেল মোস্তফা তারেকুল হাসান। ক্বারী এ. কে. এম. ফিরোজের সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে ওয়েবিনারটি শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ড. এম শমশের আলী বলেন, বাংলাদেশ একটি শান্তিকামী দেশ এবং সবসময় শান্তির পক্ষে কথা বলে আসছে। তিনি যুবকদের জন্য আয়োজিত একটি বিজ্ঞান কনফারেন্সে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, সে কনফারেন্সের আলোচনার একটি বিষয় ছিল পারমাণবিক শক্তির বিধ্বংসী ব্যবহার নয় যেটি হিরোশিমা-নাগাশাকির ক্ষেত্রে ঘটেছিল, বরং পারমাণবিক শক্তির ইতিবাচক ব্যবহার করতে হবে। তিনি হল্যান্ডে আয়োজিত আরেকটি কনফারেন্সের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেখানে তিনি লর্ড নোয়েল বেকারের সাক্ষাৎ লাভ করেন যিনি লীগ অব নেশন্স-এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন, তিনি বলেন, আমি বাদশাহ আবদুল আজিজকে বলেছিলাম যে, ইসরাইলিরা এখানে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। আবদুল আজিজ জবাব দেন, ইহুদিরা যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক উন্নত তাই তারা যদি আমাদের পাশে আসে তাহলে আমরা শুধু উপকৃতই হব। কিন্তু তারা এটি চিন্তা করেনি যে, এতে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের ভূমিতেই উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।

বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ রেজা নাফার একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, মহানবি (সা.) বলেছেন : 'যদি কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে আহ্বান করে আর সে তার ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে মুসলমান নয়।' এ হাদিস অনুযায়ী ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের আহ্বানের বিষয়টি আমাদের স্মরণ করা উচিত। পৃথিবীব্যাপী করোনা মহামারির মধ্যে ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমরা ফিলিস্তিনের জনগণের কাছে এ বার্তাই পৌঁছাতে চাই যে, ফিলিস্তিন ইস্যু আজও জীবন্ত।

তিনি বলেন, ২০২০ সালে ইসরাইল বিশ্বের ১৬০টি দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ২০টি দেশে এখনও ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেনি যাদের মধ্যে বাংলাদেশ ও ইরান রয়েছে। ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আল-কুদ্‌স হলো মুসলিম বিশ্বের জন্য রেড লাইন। কারণ, এটি

অনেক নবি-রাসূলের জন্মভূমি, মহানবির মেরাজ যাত্রার সূচনা ও মুসলমানদের প্রথম কিবলা যেটি যায়নবাদীরা দখল করে আছে। ইমাম খোমেইনী (রহ.) কর্তৃক আল-কুদ্‌স দিবস ঘোষণা ইসরাইলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে একটি প্রতীক। ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের অপরিবর্তনীয় ও অফিসিয়াল সুস্পষ্ট অবস্থান হলো দখলদার যায়নবাদীদের বিরুদ্ধে। ইরান ফিলিস্তিনিদের সর্বব্যাপী স্বাধীনতার সমর্থক। ফিলিস্তিনিদের মুক্তির একমাত্র পথই হলো যায়নবাদীদের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রতিরোধ। ফিলিস্তিনিদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনিদেরকে নিজ দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে, জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে।

পরিশেষে তিনি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আগামী ২০ বছর পরে ইসরাইল নামক কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এ অঞ্চলে থাকবে না।

ওয়েবিনারের সভাপতি ড. কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ফিলিস্তিনের জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যাচার, নির্যাতনের মধ্যে অতিবাহিত করছে। অনেকে শহীদ হয়েছেন। শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। শিশুহত্যা, দেশ থেকে বিতাড়ন, নির্যাতন সবকিছুরই শেষ রয়েছে।

তিনি বলেন, ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেইনী মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আল-কুদ্‌স দিবস ঘোষণা করেন যাতে মাজহাব নির্বিশেষ সকলে ফিলিস্তিন ইস্যুতে একত্র হতে পারে।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু কতিপয় আরব দেশ ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে, সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের চেষ্টা করছে যেটি ঠিক নয়। আমাদেরকে শত্রু-মিত্র চিনতে হবে। নিজেদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও অভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লে সেটি ইসলাম ও মানবতার দুশমনদের জন্য ভাল হবে যেটি কাম্য নয়। তাই আমাদের ইমানকে সমুন্নত করতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি সাধন করতে হবে, নৈতিকতাকে উন্নত করতে হবে, সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধভাবে ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্যে জনাব মোহাম্মাদ শওকাত হোসেন বলেন, বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঘটনা ছিল ইরানের ইসলামি বিপ্লব। বিপ্লবের বিজয়ের কিছুদিন পরেই ইমাম খোমেইনী (রহ.) ফিলিস্তিনিদের প্রতি ঐক্য ও সহমর্মিতা ঘোষণা করে আল-কুদ্‌স দিবস ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, ফিলিস্তিনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হযরত ইয়াকুব (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। পরে হযরত সোলায়মান (আ.) এর পুনঃনির্মাণ করেন। এ স্থান হযরত ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.) সহ অনেক নবীর সমাধিক্ষেত্র।

ব্রিটেন-আমেরিকার ষড়যন্ত্রে এ অঞ্চলে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ফিলিস্তিনিরা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে গেছে। তারা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। ফিলিস্তিনিদের সাথে একাত্মতা প্রকাশের জন্যই আমাদের এই ওয়েবিনারের আয়োজন।

আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় যে, এ বছর ফিলিস্তিনিরা বায়তুল মুকাদ্দাসে তারাবি নামায পড়তে পেরেছে। আমরা আশা করি আমরা ইসলামের শত্রুদের পরাজিত করে সেখানে আবার নামায পড়তে পারব, সুন্দরভাবে যিয়ারত করতে পারব। সেই দিনটির অপেক্ষায় আমরা রয়েছি।

এই দিনে ইমাম খোমেইনীকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি যে, তিনি ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুসলমানদেরকে ঐক্যের দিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমরা আশাবাদী একারণে যে, লেবাননে হিজবুল্লাহ সৃষ্টি হয়েছে, ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের জন্য সৃষ্টি হয়েছে হামাস। সকলের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা আরো শাণিত হয়েছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

হবেই।

ড. এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান বলেন, ১৯৮১ সাল থেকে আমরা বাংলাদেশে আল-কুদ্‌স দিবস পালন করে আসছি। কিন্তু কেন বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বলতে হবে? আসলে আল-কুদ্‌স আমাদের ইমানের সাথে জড়িত। এই মসজিদের দিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ (সা.) ১৬ মাসের অধিক সময় নামায আদায় করেছে। এই মসজিদে মিরাজের রাতে ১ লক্ষ নবির ইমামতি করেছেন। এই মসজিদে হযরত উমর ইমানের ঝাণ্ডা উড়িয়েছেন ও ইমামতি করেছেন। সালাউদ্দিন আইয়ুবী মুসলমানদের একত্র করেছেন ও ইমামতি করেছেন। হাদিসে যে তিনটি মসজিদের দিকে সফর করতে বলা হয়েছে তার অন্যতম বায়তুল মুকাদ্দাস।

ইহুদি জাতিকে সবসময় অপমান ও অসহায়ত্ব বরণ করতে হয়েছিল তাদের জুলুমের কারণে। এরা একটি উচ্ছৃঙ্খল জাতি, এরা মানবতা বোঝে না। তারা মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন জোর করে নিয়ে যায়। যদি আমরা কেবল ইসরাইলকে দায়ী করি, কিন্তু মূল হোতা হলো ব্রিটেন, আমেরিকা, এরপর রাশিয়া। ব্রিটেন শুরু করে আর আমেরিকা এর সাথে যোগ দেয়। তারা মুসলমানদের কলিজার মধ্যে ইসরাইল নামক ক্যান্সারটিকে বসিয়ে দেয়। তারা এটি পারত না। কিন্তু পেরেছে এজন্য যে, মুসলমানদের মধ্যে আজকে কোনো ঐক্য নেই। আরেকটি হলো ইমানি জোশ নেই। ইমানি জোশ না থাকার কারণে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ছে। ইমাম খোমেইনী (রহ.) বুঝলেন মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার বড় হাতিয়ার হলো আল-কুদ্‌স। তিনি রমযানের এই দিনটিকে আল-কুদ্‌স দিবস ঘোষণা করলেন।

১৯৪৮ সালে ১৪ মে যখন বেন গুরিয়ান ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয় তার ১০ মিনিটের মাথায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়। এই দখলের পর ধীরে ধীরে ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনের ৭৮ ভাগ এলাকা দখল নিয়ে নেয়। তারপরও ইহুদিদের নির্যাতন অব্যাহতভাবে চলে আসছে।

১৯৬৪ সালে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে পিএলও গঠিত হলে মুসলমানরা মনে করে এর মাধ্যমে ফিলিস্তিন মুক্ত হবে। ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রবিন-আরাফাত চুক্তির পর ফিলিস্তিনিরা জিহাদী চেতনা হারিয়ে ফেলে। এরপর শেখ ইয়াসিন (রহ.)-এর ডাকে হামাস গঠিত হলে আবার সেই জিহাদী চেতনা প্রাণ ফিরে পায়। ইন্তিফাদা আন্দোলন গড়ে ওঠে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন দিবস পালন করা হলেও আল-কুদ্‌স দিবস যা আমাদের ইমানের সাথে জড়িত সে দিবসটিকে যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে এটি পালন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ৪ লক্ষ মসজিদে আল-কুদ্‌স বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু তা হচ্ছে না। এটি দুঃখজনক। অথচ মুসলমানদেরকে জানানো উচিত যে, আমাদের অপর মুসলিম ভাইবোনরা কোন্ অবস্থায় রয়েছে।

তিনি বলেন, ইরান, তুরস্ক আর আরব বিশ্বের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে হবে।

জনাব জামাল উদ্দীন বারী বলেন, মুসলমানদের ঐক্যের সাথে যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটের সাথে কিছু অস্বচ্ছতা রয়েছে যেগুলো আমরা জানি, কিন্তু বলি না। এখন সময় এসেছে সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলো মুসলিম উম্মাহর কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরা। যেমন ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের একটি পটভূমি হিসেবে নির্ধারণ করি কিন্তু এর প্রেক্ষাপট আরো ৫০০ বছর আগের। অটোমান সাম্রাজ্যকে পরাভূত করার যে নীল নকশা সেটির সাথে মুসলমানদের যে অংশগ্রহণ এবং প্রথম মহাযুদ্ধের যে পটভূমি সেটির ফলাফল বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংকটটা কোথায়। মুসলমানদের বিভাজন ও বায়তুল মুকাদ্দাস দখল একই সূত্রে গাঁথা।

প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই সময়েই ফ্রান্স ও ব্রিটেন অটোমান সাম্রাজ্যকে ভাগাভাগি করার ক্ষেত্রে একটি চুক্তি করে। ভার্সাই চুক্তিতে হেজাযের রাজাবাদশারা অংশ নেয়। অন্য কোন মুসলিম

প্রতিনিধিত্ব নেই। অটোমানদের কোনো প্রতিনিধিত্ব আমরা দেখি না। হেজাযের রাজা ও মক্কার শরীফ হোসনদের ভূমিকা আমরা সেভাবে জানি না। আমাদেরকে ইতিহাসের এই দিকগুলো জানতে হবে। মুসলমানদের বিভাজনের ইতিহাস জানতে হবে। ২০০১ সালে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আমেরিকার পক্ষ থেকে ক্রুসেড কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল। অর্থাৎ তারা ক্রুসেডকে ভুলে যায় নি। এভাবে তারাা যায়নবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারা আরো ২০০ বছর মুসলমানদেরকে পদানত করে রাখার নীল নকশা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

আরব রাজা-বাদশারা ডিল অব সেঞ্চুরিকে সমর্থন করছে এবং এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের উচিত এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা।

জনাব এ কে এম বদরুদ্দোজা বলেন, অনেকে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের পাশাপাশি অবস্থানকে মেনে নিয়েছেন। এটি খুবই বিপজ্জনক। ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে একটি ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব। এটি প্রতিষ্ঠা করা হলো বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদেরকে এনে। তারা ফিলিস্তিনের ভূমিপুত্র নয়। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরে ভূমিপুত্র মুসলমানরা নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তারা ছড়িয়ে পড়েছে জর্ডান, লেবানন, তিউনিসিয়া পর্যন্ত। গায়ের জোরে যে কৃত্রিম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তাকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। তারা প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা দখলে নিচ্ছে।

গত শতাব্দীতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ব্যাপারটি ছিল একটি তামাশা। যে রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী পর্যন্ত ছিল না। এমন রাষ্ট্রের বিষয়টি মেনে নেয়াটিই ভুল ছিল। আর বর্তমানে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের পাশাপাশি অবস্থানের কথা উচ্চারিত হচ্ছে।

আমরা অনেক সময়ই বিশ্বাস করতে চাই নি যে, গোপনের ইসরাইলের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর সমঝোতার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটি স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ফিলিস্তিনের সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল মুসলিম বিশ্ব। তারা জানত যে, মুসলিম উম্মাহ তার পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু এখন আরব দেশগুলো ইসরাইলকে সমর্থন দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংকট গভীরতর হয়েছে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ায় এবং তার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেয়ায়।

১৯৮৫ সালে ইসরাইল পরাজিত হয়েছিল হিজবুল্লাহর কাছে। ২০০৬ সালেও তারা পরাজিত হয়েছে।

আমাদেরকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। ফিলিস্তিন ইস্যুকে সবসময় আলোচনার মধ্যে রাখতে হবে। সবাইকে জাগ্রত করতে হবে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে কৃত্রিম ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিনষ্ট করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সহায়তা দানের বিনিময়ে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এটি ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়েছে। তারা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি দখল করেছে। প্রতিনিয়ত অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের মুক্তি নিশ্চিতকরণে ইমাম খোমেইনী আল-কুদ্‌স দিবসের ডাক দিয়েছিলেন।

ইসরাইলকে পশ্চিমা শক্তি সহায়তা দিয়ে আসছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডিল অব সেঞ্চুরি ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী ভাইদের জন্য একটি বড় আঘাত।

মুসলিম বিশ্বের দুর্ভাগ্য আরব বিশ্বের দ্বিধাবিভক্তি। যেসব আরব রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা ভুল করেছে। রাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শাসকরা তাদের ক্ষমতা হারানোর চিন্তায় আতঙ্কগ্রস্ত। এজন্যই তারা ফিলিস্তিনের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে নিজেদের স্বার্থ চিন্তা করছে।

ইরান সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। আর পশ্চিমা শক্তি এ ভয়কে তাদের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে। কিন্তু আরবদের জন্যও এর ফলাফল ইতিবাচক হবে না। তাদেরকে ভুলের মাশুল দিতে হবে। জালিমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো রমযানেরও শিক্ষা।

বক্তারা আরো বলেন, যায়নবাদী ইহুদিদের কবল থেকে ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্তকরণে বিশ্ববাসীকে সচেতন করা ও মুসলমানদেরকে জাগিয়ে তোলাই এ দিবস পালনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর রমযান মাসের শেষ শুক্রবার– জুমআতুল বিদাকে আন্তর্জাতিক আল-কুদ্‌স দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেইনী (রহ.) জুমআতুল বিদাকে আন্তর্জাতিক কুদ্‌স দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন এবং ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা ও তাদের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য এ দিবসটি পালনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তারপর থেকে বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানবাধিকার সনদের দর্পণে

নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

ড. এম আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

[২০শে জমাদিউসসানি নবীনন্দীনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহরা (সালামুল্লাহি আলাইহা)'র পবিত্র জন্ম বার্ষিকী এবং ইসলামি নারী দিবস উপলক্ষে প্রবন্ধটি লিখিত]

নর ও নারীতে গঠিত মানবজাতিই সৃষ্টির সেরা। আল-কোরআন যখন মানব জাতির এ শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দেয় তখন নর ও নারী উভয়ের স্ব-প্রকৃতির বিচার করেই কথা বলে। এ কারণে আল-কোরআনের নির্দেশাবলি আর প্রকৃতির নির্দেশাবলির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। বাস্তবিকপক্ষে নর আর নারী হচ্ছে মনুষ্যত্বের আকাশে দুইটি আলাদা ধ্রুবতারার নাম, প্রত্যেকে স্ব স্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণরত। আল-কোরআনের ভাষায় : 'সূর্যের জন্য সমীচীন নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া আর রাত্রের জন্য সমীচীন নয় দিবসকে অতিক্রম করা। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণরত।'[১] অতএব, কোরআনের আলোকে মানবসমাজের বাস্তবতায় নর ও নারীর সৌভাগ্যের প্রধান শর্তই হচ্ছে এতদুভয়ের প্রত্যেকেই নিজ কক্ষপথে থেকে পূর্ণতার যাত্রা অব্যাহত রাখা।

নারী পুরুষের স্বাধীনতার কথা বলি আর সমঅধিকারের কথাই বলি, সেটা তখনই সুফল বয়ে আনবে যখন এদের কেউই তার নিজস্ব প্রাকৃতিক কক্ষপথ ও সহজাত গতিপথ থেকে বের হয়ে না যাবে। কারণ, যখনই সে প্রাকৃতিক ও সহজাত নির্দেশাবলির বিরুদ্ধে চলবে তখনই সমাজে অশান্তির কারণ সৃষ্টি হবে। উপরন্তু নারীর এই প্রাকৃতিক ও সহজাত অবস্থার প্রতি বে-খেয়াল হওয়ার ফল হবে তার অধিকার পদদলিত হওয়া। কেননা, যদি নারীর বিপরীতে অধিকারের দাবি নিয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে যায় এবং ঘোষণা করে যে, হে নারী! তুমিও একজন আর আমিও একজন। কাজেই যত কাজকর্ম, দায়-দায়িত্ব, সুযোগ-সুবিধা কিংবা পুরস্কার ও শাস্তি রয়েছে, সবই একরূপ ও একসমান হতে হবে; সেক্ষেত্রে নারীকে সকল কঠিন ও ভারী কাজে পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে হবে এবং তার কর্মক্ষমতার উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে হবে। পুরুষের কোনোই সম্মান ও সমর্থনের প্রত্যাশা সে রাখতে পারবে না। তার নিজের জীবনযাপনের সমুদয় খরচাদি নির্বাহের ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিতে হবে এবং সন্তানাদির ভরণ-পোষণের খরচেও পুরুষের সাথে অংশীদার হতে হবে...। এমতাবস্থায় নারী নিশ্চয়ই কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে। কেননা, স্বভাবতই নারীর উৎপাদন ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে কম, অথচ তার খরচ বেশি।

সুতরাং ইসলাম পুরুষ ও নারী প্রত্যেকের প্রাকৃতিক ও সহজাত অবস্থার কথা বিবেচনায় নিয়ে এবং মানবসত্তা ও মানবাধিকার প্রশ্নে তাদের একসমান ও অভিন্ন হওয়ার প্রতি খেয়াল রেখে নারীকে অত্যন্ত উপযুক্ত এক স্থান দান করেছে, যে স্থানে তার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন হতে হয় না, ব্যক্তিত্বও থাকে অটুট। তাই নারী অধিকার পুনরুজ্জীবিতকরণে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির পথনির্দেশনাকে অনুসরণ করবে, সেই মতবাদই আক্ষরিক অর্থে নারী অধিকার আন্দোলনে সফলতা লাভ করবে।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা তাকী জা'ফারী নারীর এই প্রাকৃতিক ও সহজাত ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'যদিও ইতিহাসকাল জুড়ে নারীরা দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন দুরবস্থার মধ্যে কাটিয়েছে, কিন্তু যে নারীই মানসিক ভারসাম্যতার অধিকারিণী থাকবে, সে তার নারী হয়ে জন্মানোর কারণে কোন দুঃখ ও দোষ অনুভব করবে না। নারীরা সামাজিক চাপসমূহের কথা ব্যতিরেকে কখনই প্রকৃতির কাছে ফরিয়াদ জানায়নি যে, তাদের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করা হোক কিংবা তাদেরকে অন্য কোনোরূপে সৃষ্টি করা হোক। কারণ, নারীর প্রকৃতিতে এমন অনেক মাহাত্ম্য নিহিত রয়েছে যেগুলো অনুধাবন করার সাধ্য পুরুষের নেই...।' অবশ্য তিনি নারীর এই মাহাত্ম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব উপভোগের জন্য একটা শর্ত রেখে বলেছেন : 'নারীদেরকে তাদের নিজেদের নারীত্বের প্রতি ঈমান থাকা চাই। সে যেন নিজের অস্তিত্বের বহুমাত্রিকতাকে উপেক্ষা না করে এবং অযথাই পুরুষের সঙ্গে নিজের তুলনা না করে। নারী আর পুরুষ উভয়ের উচিত পরিবারের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাদের জানতে হবে যে, সমাজ ও জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয় পরিবার।'[২]

১৯১২ সালে নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত ফরাসি শৈল চিকিৎসক ও

শরীরতত্ত্ববিদ Alexis Carrel (১৮৭৩-১৯৪৪) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Man, the Unknown* এর মধ্যে লিখেছেন : 'প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী নারী ও পুরুষকে যেমন পরস্পর থেকে পৃথক করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি এ পার্থক্য তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারেরও পার্থক্য সৃষ্টি করেছে... এই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণেই নারী আন্দোলনের সমর্থকরা মনে করে যে, নারী ও পুরুষ উভয়ই একই ধরনের শিক্ষা লাভ ও পেশা অবলম্বন এবং অভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। নারী অনেক দিক থেকেই পুরুষ থেকে আলাদা ....এ পার্থক্য কেবল তাদের যৌনাঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট পার্থক্য এবং নারীর ডিম্বাশয় থাকা ও সন্তান জন্মদান করতে পারা, আর এজন্য তাদের বিশেষ ধরনের শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়... শরীরবৃত্তিক বিধি-বিধানসমূহ নক্ষত্রীয় জগতের বিধি-বিধানেরই মতোই অলঙ্ঘনীয়। এতে মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এগুলোকে যেমন আছে তেমনভাবেই গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ না করে প্রকৃতি নারীকে যা দান করেছে তার ভিত্তিতেই তাকে স্বীয়-প্রকৃতি নির্ধারিত পথে চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। মানবজাতির পূর্ণতার পথে তার দায়িত্ব পুরুষের তুলনায় অনেক বড়। এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া কিংবা পরিত্যাগ করা তার সাজে না।' মি. ক্যারেল এ অধ্যায়ের উপসংহার টেনে বলেন : 'আমরা যেন যুবতীদের জন্য যুবকদের অনুরূপ চিন্তাপদ্ধতি, একই ধারার জীবন এবং অভিন্ন লক্ষ্য ও আদর্শ নির্ধারণ না করি। শিক্ষাবিষয়ক বিশেষজ্ঞগণকে অবশ্যই নারী ও পুরুষের মধ্যকার দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য এবং তাদের প্রাকৃতিক দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা মনে রাখতে হবে। এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা আমাদের সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'[৩]

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানবাধিকার প্রশ্নে গবেষণা ও আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না কখনো। ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ১৯৯০ সনে কায়রো সম্মেলন থেকে মানবাধিকার সনদ[৪] ঘোষণা করে, যা মোটামুটি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির ধারক। পক্ষান্তরে জাতিসংঘ কর্তৃক বিশ্ব মানবাধিকার সনদ ঘোষিত হয় ১৯৪৮ সনে, যেখানে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রাবল্যই বেশি। আমরা যদি এই দুই বিশ্ব সংস্থার মানবাধিকার সনদে নারীর স্থান অনুসন্ধান করি তাহলে দেখা যাবে নারীর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এবং তার অধিকার সংক্রান্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু সাদৃশ্য যেমন বিদ্যমান, তদ্রূপ কিছু বৈসাদৃশ্যও দৃষ্টিগোচর হয়। ওআইসি মানবাধিকার সনদের 6(a)- ধারায় বলা হয়েছে : Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage. আর 6(b)- ধারায় বলা হয়েছে : The Husband is responsible for the support and welfare of the family.

এদিকে 5(a) ধারায় বলা হয়েছে : The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, colour or nationality shall prevent them from enjoying this right. আর 5(b) ধারায় বলা হয়েছে : Society and the State shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate marital procedure. They shall ensure family protection and welfare.

অপরদিকে জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদেও ১৬ নং ধারায় উপস্থাপিত বক্তব্যের তিনটি পয়েন্ট হচ্ছে :

(a) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(b) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(c) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

দেখা যাচ্ছে উভয় সনদে অকপটে স্বীকার করা হয়েছে যে, পরিবারই হচ্ছে সমাজের প্রাকৃতিক ও মৌলিক স্তম্ভ। কাজেই পরিবারের ভিতকে

দুর্বলকারী যে কোনো মতাদর্শ ও জীবনাচার মনুষ্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ মতবাদ হিসাবে চিহ্নিত ও প্রত্যাখ্যাত হবে। এখানে উভয় সনদের ভাষ্যে অভিন্ন কিছু দিক পাওয়া যায়। যথা :

১- নারী ও পুরুষ মানবীয় ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে একসমান। এক্ষেত্রে পরস্পরের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

২- নারী সামাজিক ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং পুরুষের মতোই মানবিক ব্যক্তিত্ব সহকারে বাঁচার অধিকার রাখে। পুরুষের মতোই সে সকল জীবনোপকরণ ভোগ এবং সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবে।

৩- পুরুষের ন্যায় নারী তার নিজের অর্থ-সম্পদ সঞ্চালন ও প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে স্বাধীন। যদিও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির মানবাধিকার সনদে এ বিষয়টা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে পশ্চিমা বিশ্বে বলবৎ মানবাধিকার সংক্রান্ত অপরাপর সূত্রের বরাতে প্রতিপন্ন হয় যে, সেখানে নারী অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত এই অধিকারটি সুরক্ষিত রয়েছে।

৪- বিবাহ অবশ্যই উভয়পক্ষের (নারী ও পুরুষের) পূর্ণ সম্মতি ও স্বাধীনতা সহকারে সম্পন্ন হতে হবে।

৫- পরিবার হচ্ছে সমাজের প্রাকৃতিক ও ভৌতিক স্তম্ভ। এমর্মে সমাজ ও রাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন লাভের অধিকার পরিবারের রয়েছে।

এবার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গির বৈসাদৃশ্য নিয়ে পর্যালোচনা করা যাক :

এক : ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর জন্য স্বামী নির্বাচনে এবং একইভাবে পুরুষের জন্য স্ত্রী নির্বাচনে ধর্মের বিষয়টি মান্য করে চলা উচিত। এ বিধানটির কারণও খুবই স্পষ্ট। কেননা, ইসলাম হচ্ছে ফিতরাত তথা সহজাতগত ধর্ম। যে কেউ সত্যিকার অর্থে এই ধর্মের ছায়াতলে আসে, সে বাস্তবিকপক্ষে তার নিজের সহজাত প্রবৃত্তিকেই ফলপ্রসূ করে। একারণে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে যে মানুষটি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো পথে তার ফিতরাত ও আকাঙ্ক্ষাকে চালিত করে তার সাথে মনস্তাত্ত্বিক, ব্যক্তিত্বগত ইত্যাদি কোনো দিক থেকেই পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ফলে তার সাথে নিখাঁদ অনুরাগ ও ভালোবাসাও বিনিময় করতে সক্ষম হয় না।

অপরদিকে ইসলাম যেহেতু সঠিক খোদায়ী ধর্ম ব্যতীত জীবনকে ব্যাখ্যাযোগ্য কোনো জীবন বলে মনে করে না। কাজেই যে জীবন ব্যাখ্যার অযোগ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেটাকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই। বিবাহের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো সন্তানাদির বিষয়টি। ইসলাম এই দুনিয়াকে একটি ক্ষণস্থায়ী নিবাস বলে মনে করে, যার পশ্চাতে অপেক্ষা করছে এক অনন্তকালীন জীবন। আর সেই জীবনের জন্য মানুষের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ তথা পক্কতা অর্জন করার স্থান হচ্ছে এই দুনিয়া। অতএব, ইসলাম কোনো মতেই এই দুনিয়ায় আগমনকারী মানুষদেরকে পশুদের ন্যায় দায়-দায়িত্বহীন জীবন পার করার জন্য ছেড়ে দিতে পারে না। বরং ইসলাম মানব সন্তানদেরকে সঠিক আকিদা বিশ্বাস সহকারে একটি মানবিক ও ঐশী আলোয় গড়া জীবনের জন্য যথোপযুক্ত দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের জোরালো নির্দেশ প্রদান করে থাকে। এমতাবস্থায় যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো এক পক্ষ মুসলমান না থাকে, তাহলে সন্তানদের ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যার কোনো সমাধান নেই। এরূপ নমুনা চোখের সামনেই রয়েছে অনেক। এ ধরনের বিবাহের কারণে অধিকাংশ সন্তানই ধর্মবোধ ও বিশ্বাস ছাড়াই জীবনযাপনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যা ক্রমান্বয়ে নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত এক উচ্ছৃঙ্খল বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবনাচারের সূত্রপাত ঘটায় এবং মানবিক মূল্যবোধগুলো মূল্যহীন হয়ে পড়তে থাকে। আজকের পাশ্চাত্য দুনিয়া যার সাক্ষাৎ প্রমাণ। কারণ, পাশ্চাত্যে ইসলামের ন্যায় নারীর জন্য স্বামী নির্বাচনে এবং একইভাবে পুরুষের জন্য স্ত্রী নির্বাচনে ধর্মের বিষয়টি মান্য করে চলার কোনো তাগিদ নেই।

দুই. জাতিসংঘ সনদে উদ্ধৃত ... They are entitled to equal rights as to marriage... 'অর্থাৎ নারী ও পুরুষ বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে একসমান অধিকার রাখে'– এই বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিমা মানবাধিকার সনদে বিবাহের মোহরানা, ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য জীবনোপকরণের ভার পুরুষের দায়িত্বে নেই। অথচ ইসলাম এ দায়িত্বগুলো পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। আর নারীদের উপর ন্যস্ত করেছে আবেগ, অনুরাগ, মমতা ও জীবনের পবিত্র অনুভব দিয়ে পরিবার নামক নীড়কে শান্তিতে ভরে তোলার দায়িত্ব। স্বভাবতই এই অফুরান প্রাণশক্তি নিহিত রয়েছে শুধু নারীর কোমল হৃদয়ের নিখাঁদ প্রাণস্পন্দে। তাই পরিবারকে সুখময় করে তোলার ক্ষেত্রে ইসলাম এভাবে পূর্ণ ন্যায্যতার সাথে দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছে নারী আর পুরুষের মাঝে। পুরুষ জোগান দেবে বৈষয়িক ও বস্তুগত রসদ; আর নারী জোগান দেবে মানবিক ও অবস্তুগত রসদ।

তিন. জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের উপরিউক্ত একই ধারায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে : They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের গোটা সময়কাল ধরে এবং তা বিলুপ্তির সময়ে নারী ও পুরুষ সর্বব্যাপারে একসমান অধিকার রাখে। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে তালাকের অধিকারেও নারী এবং পুরুষ দুজনই সমান অধিকার রাখে। অথচ ইসলামে ব্যাপারটা এত সহজ নয়, যতটা সহজ দেখেছেন পশ্চিমা মানবাধিকার বিশেষজ্ঞগণ। কেননা, দাম্পত্য কলহের ক্ষেত্রে নারীরাই সচরাচর দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এছাড়া

তাদের সাধারণ চাহিদাবলির হাতছানিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে পুরষদের আগেই তালাক চাইতে অনুপ্রাণিত করে। অথচ তালাকের জন্য যেসব কারণ তারা প্রদর্শন করে থাকে সেগুলোর অধিকাংশই জোরালো কোনো কারণ নয়। ৭/৯/১৯৬৫ তারিখে ইরানের 'কায়হান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট এই দাবির সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত রিপোর্টে বলা হয় : '১৮৯০ সালে ফ্রান্সে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাগুলোর মধ্যে ৯০ শতাংশই ছিল নারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে।'[৫] তাছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী যেসব সমস্যা দেখা দেয়, যেমন শিশুদের যত্ন ও লালনপালন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর কাঁধে এসে পড়ে। কিন্তু যদি ঐ শিশুবেলাতেই তাদেরকে শিশুসদন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা মাতৃত্বের মানবীয় আবেগ অনুভব থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে কিশোর ও তরুণ বয়সে তারা মানবীয় ব্যক্তিত্ব ও পরিচয়হীন এক অমানবিক জীবনের ধারায় প্রবাহিত হবে। যাদের সম্পর্কে স্বয়ং পশ্চিমা চিন্তাবিদগণেরই মন্তব্য হচ্ছে, এরা শুধু সেনাবাহিনীর কাজে আসতে পারে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, কিন্তু মানবতার কোনো কাজে আসবে না যেখানে মানবীয় গুণাবলি ও মাহাত্ম্য প্রয়োজন।

চার. বিবাহের ক্ষেত্রে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে যুবকরা, যতই উন্নত প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় বলীয়ান হোক না কেন, তবুও এ বয়সে তারা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্মার্থ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম থাকে না। তারা জানে না যে, দায়িত্ব ও কর্তব্যহীন জীবন আর নানান দায়-দায়িত্বভরা জীবন– এদুয়ের মধ্যে ঢের পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ যুবকের কাছেই বিবাহ বলতে যে বিষয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে যৌন কামনার নিবারণ। ফলে এ সময়ে বিবাহ পরবর্তী জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তেমন উপলব্ধি তাদের মধ্যে সচরাচর কাজ করে না। আর দৈবাৎ যদি কোনো যুবকের মধ্যে এহেন উপলব্ধির উদ্রেক ঘটেও, তবুও তার যৌবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ঢেউ দায়িত্ব ও কর্তব্যের জায়গাগুলোকে ম্লান করে দেয়। ফলে সে সূক্ষ্ম ও সুচারুভাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে না। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন যৌন আবেগে ভাটা পড়ে, তখন তার মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন স্তর ও মাত্রায় দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভবগুলো জেগে উঠতে থাকে।

অথচ দুঃখজনকভাবে পাশ্চাত্যজগৎ তার সকল সাংস্কৃতিক ও আইনি অঙ্গনে এ সত্যটির ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে থাকে। অথবা কোনো না কোনো কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে জীবনের সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু ইসলাম ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখে। একারণে ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার অভিভাবকের অনুমতিকে একটি শর্ত হিসাবে গণ্য করে থাকে। অর্থাৎ স্ত্রী নির্বাচনের বিষয়টি যেন একতরফাভাবে কোনো যৌন ভাবাবেগে আপ্লুত যুবকের পছন্দের দ্বারাই চূড়ান্ত না হয়। মেয়েদের পক্ষ থেকে পিতা তথা শারয়ী অভিভাবক যেন এ ব্যাপারে যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ায় তৎপর হয় এবং জ্ঞাতসারে অনুমতি প্রদান করে। কেননা, মেয়েদের জন্য সতীত্ব বজায় রাখার আবশ্যকতা সম্পর্কে ইসলামের রক্ষণশীল বিধি-বিধানের কারণে হয়ত তারা ছেলেদের ন্যায় ততটা পরিমাণে বাইরের পৃথিবী ও জীবনাচার সম্পর্কে অবহিত নাও থাকতে পারে। একারণে মেয়েদের পক্ষে তার পিতা কিংবা পিতামহের ন্যায় আপন অভিভাবকের অনুমতি ও সম্মতি লাগে এ ঘাটতি পূরণের জন্য। অবশ্য যখন বিবাহে অনুমতির প্রসঙ্গ আসে তখন উক্ত অনুমতি দাতা অভিভাবককেও যথাযথ যোগ্যতার অধিকারী থাকতে হবে। আর যদি মেয়ের বিবাহে অনুমতি প্রদানের শারয়ী অভিভাবক বলতে কেউ বর্তমান না থাকে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিংবা সমাজের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

ইসলামে নারী ও পুরুষের অধিকার সম্পর্কে যে পার্থক্য রয়েছে, সে বিষয়ে ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও অবিবেচক ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অনেক আক্রমণ হানা হয়ে থাকে। তাদের প্রশ্ন একটাই– কেন ইসলাম এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে? অথচ এ আপত্তির উত্তরে প্রথমেই যেটা বলতে হয় সেটা হলো নারী ও পুরুষের অধিকারে যে পার্থক্য সেটা তাদের দৈহিক, মানসিক এবং পরিবারে তাদের অত্যাবশ্যকীয় অবস্থানের পার্থক্যপ্রসূত, যে পার্থক্য কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অস্বীকার করার জো নেই। জ্ঞান-গবেষণা যতই অগ্রসর হচ্ছে, নারী পুরুষের এই পার্থক্যের তালিকা ততই দীর্ঘতর হচ্ছে এবং অদ্যাবধি একশ'রও বেশি পার্থক্যের দিক চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, পশ্চিমা মানবাধিকার সনদে পরিবার সম্পর্কে এবং সামগ্রিকভাবে নারী অধিকার সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তা মূলত কতিপয় নারী স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে স্বাধীনতাগুলোকে কোনোক্রমেই প্রাকৃতিক ও যুক্তিযুক্ত স্বাধীনতা বলা যায় না। কারণ, যদি সেগুলো প্রাকৃতিক ও যুক্তিযুক্তই হতো তাহলে পাশ্চাত্যে এভাবে পরিবারের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ার কথা ছিল না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে 'সমতা' (equality) আর 'ন্যায়ন্যায্যতা' (justice)- এই দুই অভিধাকে একই অর্থে গ্রহণ করা। নারী-পুরুষের সম অধিকার এক জিনিস। আর নারী-পুরুষের ন্যায়ন্যায্য অধিকার অন্য জিনিস। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি তোলার অর্থই হচ্ছে নারী ও পুরুষের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পার্থক্যগুলোকে অস্বীকার করা। কেননা, এক্ষেত্রে সমতা ও সমানাধিকারের কথা অবান্তর এবং ভিত্তিহীন। প্রয়োজন হলো ন্যায়ন্যায্যতা, যা নারী ও পুরুষের পার্থক্যগুলোকে মেনে নিয়েই আসে। তাই নারী ও পুরুষের অধিকারের প্রশ্নে পাশ্চাত্য যতদিন 'সমানাধিকার' আর 'ন্যায়ন্যায্য অধিকার'– এদুয়ের মধ্যে পার্থক্যে বিশ্বাস না করবে, ততদিন এতদুভয়ের অধিকার এবং স্বাধীনতার ব্যাপারে তাদের বক্তব্যের সপক্ষে কোনো যুক্তিতর্কই ধোপে টিকবে না।

লেখক : ভাইস প্রিন্সিপাল, ইরানিয়ানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

তথ্যসূত্র

১. সূরা ইয়াসীন : ৪০।

২.তাকাপুগারে আন্দিশেহা, পৃ: ২৯২

৩. ওস্তাদ শহীদ মূর্তাজা মোতাহহারীর 'ইসলামে নারীর অধিকার' গ্রন্থ (পৃ. ১৫৮-৫৯) থেকে উদ্ধৃত।

৪. The Cairo Declaration on Human Rights In Islam (OIC) Summit 1990.

৫. Legal Treatise, Vol. 1, p. 169

স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ইমান' অর্থাৎ দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ– এ অনিবার্য নীতিবাক্যের আওতায় আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে এদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ নির্মাণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার এই মাসে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। বিশেষ করে কবির ভাষায় 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' দেশের মুক্তিসংগ্রামকে যাঁরা সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে গেছেন, যাঁদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, আলাদা ভূখণ্ড, ভিন্ন মানচিত্র, পৃথক জাতিসত্তা, লাল-সবুজের পতাকা ও স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী পেয়েছি– তাঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের 'বাংলাদেশ' নামক নবরাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, কিংবদন্তির মহানায়ক ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫ খ্রি.) মহান স্মৃতির প্রতি অজস্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি এজন্যে যে, তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেই অবহেলিত, বঞ্চিত ও উপেক্ষিত বাঙ্গালি জাতি তার বহুল প্রত্যাশিত স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে, আমরা জাতি হিসেবে স্বাধীন পরিচয় লাভ করেছি এবং বিশ্বসভায় বাঙ্গালি জাতি তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমরা ঋণী এ কারণেও যে, সমগ্র বিশ্বে তিনি গর্বভরে পরিচয় দিয়ে বলতেন, আমি বাঙ্গালি, আমি মুসলমান। বঙ্গবন্ধুসহ অসংখ্য শহিদের রক্তে গড়া সেই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে আজ বাঙ্গালিত্ব ও মুসলমানিত্ব দুটিই বড় অসহায়ত্ব বরণ করে আছে। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত খাঁটি বাঙ্গালির ললাটে আজ নাস্তিক্যবাদের তিলক পরানো হচ্ছে আর মুসলমানিত্ব ধর্মীয় আলখেল্লাধারী তথাকথিত লেবাসধারীদের পার্থিব মোহ ও লালসার প্রকোষ্ঠে জিম্মিদশায় নিপতিত হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বজনীন, সর্বজনীন ও কালজয়ী মতাদর্শ এবং শান্তি, উদার ও মানবতাবাদী ধর্ম ইসলামের প্রকৃত অনুসারী মাত্রই সকলে ব্যথিত হবে, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটবে। এমতাবস্থা হতে উত্তরণের নিমিত্তে ইসলামের আলোকে স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া এবং ইসলামে দেশপ্রেমের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামের মহান পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে তাঁর জন্মভূমির গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল অপরিসীম। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, তিনি যখন আরবের অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্রের মুখে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করতে উদ্যত হলেন তখন মদিনা পানে যাত্রার প্রাক্কালে জন্মভূমি মক্কার জন্য তাঁর হৃদয় বিগলিত হচ্ছিল। বার বার তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে যাচ্ছিলেন এবং খানায়ে কাবার দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। মক্কার পাহাড়-পর্বত আর বৃক্ষলতার পানে বার বার তাকাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন– হে কাবা, তুমি কতো সুন্দর, তুমি কতো মর্যাদাবান; ওহে মক্কা শহর, তোমায় আমি অনেক ভালোবাসি, কিন্তু আমার জন্মভূমির লোকেরা তোমায় ছেড়ে যেতে আমায় বাধ্য করেছে। জন্মভূমির জন্য হৃদয়ের এই টান ছিল রাসূলের (সা.) স্বভাবজাত। এমনকি মদিনায় যাবার পরেও কখন বা কতদিনে তিনি আবারো বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবেন সেজন্যে সর্বদাই ব্যাকুল থেকেছেন। প্রচণ্ড ক্ষমতা হাতে পেয়েও মক্কা বিজয়ের পর মাতৃভূমির কাউকে অত্যাচার করেননি, কাউকে কষ্ট দেননি, বাড়ি থেকে বের করে দেননি এবং কাউকে কোনো শাস্তি দেননি। এমনকি বড় বড় অপরাধীকেও তিনি কোনো প্রকার শাস্তির আওতায় আনেননি। বরং সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। গোটা মক্কা জুড়ে যে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল রহমতের আধার নবির মহত্তম এক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি-স্বস্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। রাসূল (সা.) বললেন– 'আজ তোমাদের কারো বিরুদ্ধেই আমার কোনো অভিযোগ নেই, ক্ষোভ নেই, দুঃখবোধ নেই, তোমাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম।' মানবতার ইতিহাসে এমন নিঃশর্ত ক্ষমার ঘোষণা খুবই বিরল। এটি সম্ভব হয়েছিল উদার ও পরমতসহিষ্ণুতার মূর্তপ্রতীক মহানবি (সা.)-এর প্রকৃত দেশপ্রেম আর মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসার কারণে। সুতরাং দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি এমন দায়বদ্ধতার শিক্ষাই দেয় ইসলাম। ইসলামের পূর্ববর্তী সকল নবি-রাসূলই তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চল, এলাকা, প্রতিবেশ, সমাজ আর দেশের প্রতি ভালোবাসায় বিমূর্ত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও আত্মমর্যাদাশীল দেশ। প্রাণাধিক প্রিয় এ দেশকে আমরা মমতাময়ী মায়ের সাথে তুলনা করি। মায়ের স্থান সবার ঊর্ধ্বে। ইসলামে মায়ের মর্যাদা ও অবস্থান সবার ও সবকিছুর উপরে। তাই মায়ের সাথে সাথে মাতৃভূমি, মায়ের ভাষা ও মায়ের দেশের সকল কিছুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করাই আমাদের জন্য অবধারিত। মায়ের প্রতি প্রতিটি সন্তানের ভালোবাসা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ঠিক তেমনি দেশের প্রতিও প্রতিটি নাগরিকের ভালোবাসা হবে অকৃত্রিম। যারা দেশকে ভালোবাসবে, দেশের জন্যে কাজ করবে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার প্রত্যয়ে ব্রতী হবে– ইসলামে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে যারা নিজেদের নিয়োজিত রাখবে তাদের জন্য হাদিসে বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। যারা অকাতরে দেশের জন্য জীবন বিলিয়ে দেবে ইসলাম তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছে।

ইসলামে দেশপ্রেমের তাৎপর্য একটু ভিন্ন ও ব্যতিক্রম। এখানে দেশপ্রেমের অর্থ শুধু দেশকে ভালোবাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং দেশ থেকে সকল অন্যায়, দুর্নীতি আর পাপাচারের মূলোৎপাটন করে একটি আদর্শস্থানীয় দেশে রূপান্তরের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে যার যার জায়গা থেকে সাধ্যমতো প্রয়াস অব্যাহত রাখা। দেশের উন্নয়ন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি গঠন এবং দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করাই একজন ইমানদার নাগরিকের মূল কাজ। দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়া কোনোক্রমেই দেশপ্রেমিকের কাজ হতে পারে না। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয় এমন কোনো পদক্ষেপও কোনো দেশপ্রেমিক নিতে পারে না। এসব ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী। ধর্মের নামে দেশের নাগরিকদের মাঝে বিভাজনের সৃষ্টি করাও ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং একটি দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমান নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করবে– এটাই ইসলামের মহান শিক্ষা। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু হিসেবে নয়; বরং দেশের নাগরিক হিসেবে এবং স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ হিসেবে সবাইকে মূল্যায়ন করাই একজন দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব। ঐক্য, সংহতি, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, সংযম, শান্তিকামিতা– এগুলো হচ্ছে একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের অনিবার্য গুণ। দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে সবাইকে এসব গুণের ধারক হয়ে দেশমাতৃকার কল্যাণে কাজ করতে হবে। স্বদেশের প্রতি শাশ্বত ও চিরন্তন ভালোবাসার দিকনির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে। মহান আল্লাহ বলেন– 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার উলুল আম্‌রের আদেশাবলি মেনে চলো (সূরা নিসা-৫৯)।' রাসূল (সা.) বলেছেন– 'যে চোখ দেশের সীমান্ত রক্ষার জন্যে জাগ্রত থেকে পাহারা দেয় সে চোখ জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে না।' 'দেশের সুরক্ষার জন্য এক দিন ও রাতের পাহারা লাগাতার একমাস সিয়ামব্রত পালন এবং দিবারাত্রি ইবাদতের চাইতেও উত্তম।'

ইসলামের ইতিহাসে ধর্মীয় অনুশাসন পালন ও স্বাধীন মতপ্রকাশের জন্য যেমন মদিনা নামক স্বাধীন ও নিরাপদ ভূখণ্ডের প্রয়োজন ছিল ঠিক তেমনি মহানবি (সা.)-এর নেতৃত্বে মদিনার সকল অধিবাসী মিলে সেই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধানও করেছেন। একইভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্যও প্রয়োজন আমাদের সকলের অংশগ্রহণে দেশটিকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত করে উন্নত-সমৃদ্ধ এবং আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে একে গড়ে তোলা; স্বাধীনতার এই মহান মাসে এটিই হোক আমাদের দৃপ্ত অঙ্গীকার।

লেখক : চেয়ারম্যান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অমর একুশে ও মাতৃভাষা

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

সময়ের বিবর্তনে প্রতি বছরই বাঙালির অস্তিত্বের পুরোটা জুড়ে ফিরে আসে অমর একুশে। আমরা আবেগাপ্লুত হই, গ্রন্থমেলার আয়োজন করি, সভা-সমাবেশ, আলোচনা, বক্তৃতা-বিবৃতি, ভাষণ, স্মৃতিচারণ আর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শহিদদের স্মরণ করি। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই মাতৃভাষার প্রতি এই অকৃত্রিম দরদবোধে আমরা তাড়িত হই এবং এ মাসের নির্ধারিত কিছু কর্মসূচি সম্পন্নকরণের ভেতর দিয়েই মায়ের ভাষার প্রতি সকল দায়-দায়িত্ব পালন হয়ে যায়– এমনটিও অনেকে ধরে নেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মহান স্রষ্টার অন্যতম সেরা উপহার মায়ের ভাষা বাংলার প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধের জায়গাটি অনেকটাই বিস্তৃত, প্রসারিত; খুবই প্রথাসিদ্ধ কিছু আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে এ দায়িত্বের হকটুকু আদায় হয়ে যাবে, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বাঙালির মায়ের ভাষা বাংলা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি অর্জন করায় ঐতিহাসিক এ ভাষার উন্নয়ন ও বিস্তারে আমাদের দায়িত্ব-পরিসরের দিগন্তটি আরো ব্যাপক আকারে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে; যাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের বা প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে শিকলাবদ্ধ করার আর কোনো উপায় নেই। বিশেষ করে অন্তত নিজেদের সমাজ-কাঠামো ও রাষ্ট্রের সর্বত্র মাতৃভাষা বাংলার প্রচলন এখনো হয়ে উঠেনি; যা বায়ান্ন'র ভাষা শহিদদেরই শুধু অবমূল্যায়ন নয়, বরং জাতি হিসেবে আমাদের জন্যে চরম ব্যর্থতা ও লজ্জারও বিষয় বটে।

মাতৃভাষার মর্যাদা ইসলামে স্বীকৃত। মহানবি (সা.)-এর মাতৃভাষা ছিল আরবি। বায়হাক্বি শরিফের একটি হাদিসে তাঁর আরবিপ্রীতির বিরল নজির পাওয়া যায়। তিনি বলেন : 'তোমরা তিন কারণে আরবদের ভালবাসবে। প্রথমত আমি আরব, দ্বিতীয়ত পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবি এবং তৃতীয়ত জান্নাতবাসীদেরও ভাষা হবে আরবি।' রাসূল (সা.)-এর উল্লিখিত বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একইভাবে এর মাধ্যমে অপরাপর সকল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর স্ব-স্ব ভাষার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতৃভাষার গুরুত্ব আমাদের কাছে আরো বেড়ে যায় যখন দেখি মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : 'আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর জাতির মাতৃভাষাতেই প্রেরণ করেছি; যাতে তিনি আল্লাহপাকের বাণী সহজেই তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেন' (১৪:৪)। মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের বাণীর মাধ্যমে মাতৃভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়।

পৃথিবীর সকল জনপদে তাদের নিজ নিজ ভাষা রয়েছে; যা তাদের মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা, স্বপ্নের ভাষা এবং প্রাত্যহিক মনের অব্যক্ত বিষয়াবলি প্রকাশের তথা জীবন-যাপনের প্রিয় ভাষা। মমতাময়ী মায়ের কাছ থেকে প্রথম সে ভাষা শিখে বিধায় তার নামকরণ করা হয়েছে মাতৃভাষা হিসেবে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ছয় সহস্রাধিক ভাষার মধ্যে এক এক জনপদের লোকেরা তাদের সেই প্রিয় মাতৃভাষায় কথা বলে থাকে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী– 'আমার

নিদর্শনসমূহের মাঝে রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য; জ্ঞানীদের জন্য এতে সুনিশ্চিত অনেক নিদর্শন রয়েছে' (৩০:২২)। পৃথিবীর অপরাপর সকল জিনিষের মতো মাতৃভাষার স্রষ্টাও স্বয়ং মহামহিম আল্লাহ। তিনি বলেন : 'তিনিই মানব সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে মনের ভাব-বর্ণনা (ভাষা) প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন' (৫৫:৩-৪)।

মানবসমাজে অমানিশার ঘোর তমসাচ্ছন্নতার অবসানে আর অজ্ঞতা-মূর্খতার অন্ধকার দূরীকরণে মহান আল্লাহ সময়ের ব্যবধানে তাঁর নির্বাচিত প্রিয়পাত্রদের প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা ও মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মানুষ ও মানবতার সকল অপ্রাপ্তি পরিপূরণে ও পার্থিব-অপার্থিব সার্বিক সফলতা অর্জনের মানসে নাযিলকৃত সকল আসমানি গ্রন্থ স্ব-স্ব পয়গম্বরের মাতৃভাষাতেই প্রচারিত হয়েছে। 'আমি সব পয়গম্বরকেই তাঁদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাঁরা তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারেন' (১৪:৪)। হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন : 'আল্লাহপাক প্রত্যেক নবিকে তাঁর স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছেন (আহমদ)।' আল্লাহর বাণীবাহক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতৃভাষা ছিল ইবরানি, তাই এ ভাষাতেই মহান আল্লাহ তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন। একইভাবে হযরত দাউদ (আ.)-এর মাতৃভাষা ইউনানিতে জাবুর কিতাব, হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতৃভাষা সুরিয়ানিতে ইঞ্জিল কিতাব আর সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাতৃভাষা আরবিতে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন : 'এই কোরআন বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিব্রাইল একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতিপ্রদর্শনকারী হতে পারেন। আর এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়। নিশ্চয়ই এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে' (২৬:১৯২-১৯৬)। মহানবি (সা.) মাতৃভাষাতেই পবিত্র কোরআনের বাণী প্রচার করেছেন। মাতৃভাষার গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

আল-কোরআনে রয়েছে– 'হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও' (৪৯:১৩)। পৃথিবীতে নানান জাতির বসবাস এবং তাদের মনোভাব প্রকাশের জন্য মাতৃভাষাও রয়েছে। সেই মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে তুরস্ক, বুলগেরিয়া, মধ্য এশিয়ার অঞ্চলসমূহ আর ভারতের উত্তর প্রদেশসহ বিশ্বের কিছু জাতিগোষ্ঠীকে। কিন্তু বাঙালি জাতি কেবল আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলার মানুষকে জীবনও দিতে হয়েছে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন মোতাবেক ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির ইতিহাসে রচিত হয়েছে অমর এক শোকগাথা; যেখানে শাহাদতের সুধা পান করতে হয়েছে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেককেই। বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মায়ের ভাষাকে মুক্ত করেছে। যা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে আরো গভীরে নিয়ে গেছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমাদের উচিত বিশুদ্ধ মাতৃভাষা চর্চা করা। বাংলাকে সকল বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।

মহান ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি, ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষার এই আন্দোলনের প্রধানত উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষা বাংলার অবাধ ব্যবহার ও তার সার্বিক উৎকর্ষ বিধান এবং সর্বস্তরে চর্চার অধিকার আদায় করা। অপর উদ্দেশ্যটি ছিল মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে সরকারি-বেসরকারি সকল অফিস-আদালতসহ রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা বজায় রাখা ও সারাবিশ্বে এ ভাষার পরিচিতি আরো উন্নত পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া। আর সেজন্যই আমাদের ভাষা আন্দোলনের মূল স্লোগানই ছিল– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। ভাষা আন্দোলনের আরেকটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতি হিসেবে বাঙালির সকল গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মুখের ভাষার পরিবর্তে সংখ্যালঘিষ্ঠ কোনো জাতির ভাষা এখানে চাপিয়ে দেওয়া কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; বরং তা সভ্যতা ও মূল্যবোধের চরম পরিপন্থী। এরকম একটি অগণতান্ত্রিক, অন্যায় ও মানবাধিকার পরিপন্থী বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে গিয়েই মহান ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল; যা পরবর্তীতে বাঙালি জাতির জন্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূরীকরণে পর্যায়ক্রমে এক ঐতিহাসিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এক্ষেত্রে অমর একুশের অকোতভয় বীর শহিদদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মহানবি (সা.) ছিলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর ও শুদ্ধভাষী। তিনি কোনোদিন একটি অশুদ্ধ বা বিকৃত শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করেননি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শহিদদের অবদান এবং মহানবি (সা.)-এর মাতৃভাষা প্রীতির অজস্র নজির সামনে রেখে এ বিষয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখতে পাই, আরবের অধিবাসীদের নীতিবিধান, জীবনবোধ ও সামগ্রিক আচার-পদ্ধতি সহজে বোঝাবার জন্যই আরবি ভাষাতে কোরআন নাজিল হয়েছিল। আর তা আল্লাহপাকের এক বাণীতেও পরিষ্কার অনুধাবন করা যায়– 'আমি একে আরবি ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পার' (১২:২)। মহান আল্লাহর এ নির্দেশনার আলোকে আমাদেরও উচিত সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার যথার্থ প্রচলন এবং বাংলা ভাষার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আনয়ন। বাংলা ভাষার কবি, লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, প্রতিবেদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত তাঁদের রচনায় আমাদের শিশু-কিশোরসহ অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষের সহজে বোধগম্য হয় এমন শব্দাবলির ব্যবহার করা। ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি সহজবোধ্য ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন বাঞ্ছনীয়। ধর্মীয়, নৈতিক ও শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধীয় সকল রচনা মাতৃভাষায় ভাষান্তর হওয়া প্রয়োজন; যাতে ইসলামকে বুঝতে সহজ হয়, নৈতিক জ্ঞানে মানুষেরা গুণান্বিত হয় এবং বিদেশী রচনাবলির স্বাদ বাংলায় আস্বাদন করতে সক্ষম হয়।

লেখক : চেয়ারম্যান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাহনামা কাব্যগ্রন্থ : আধ্যাত্মিকতা, প্রজ্ঞা ও আদর্শের সম্মিলন

ড. তারিক সিরাজী

ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য কবি হাকিম আবুল কাসেম ফেরদৌসি [৯৪০-১০২০/১০২৫ খ্রি. (আনুমানিক)] ছিলেন ইরানের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবগাথার সার্থক রূপকার। ইরানের মহাকবি হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর মর্যাদার এই বিশালত্বের কারণে তাঁর জীবন-কাহিনী রূপকথার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিশ্ববিশ্রুত বীরত্বগাথা *শাহনামা* রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত ইরানিদের জাতিসত্তা ও ফারসি ভাষার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করেছেন। এ কালজয়ী সাহিত্যকর্মটির গুরুত্ব অনুধাবন করে পৃথিবীর অধিকাংশ জীবন্ত ভাষায় এ গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে এবং অসংখ্য সাহিত্যামোদীর কাছে তা হয়েছে সমাদৃত। বর্তমানে গ্রন্থটি বিশ্বসাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যে কারণে এ কাব্যগ্রন্থটিকে কেবল ইরানি ও ফারসি ভাষাভাষীদের সম্পদ হিসাবেই পরিগণিত করা যায় না। কারণ, এর এক বৈশ্বিক আবেদন রয়েছে– যা সাহিত্যামোদী, গবেষক ও সাধারণ মানুষের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বহু গবেষক মানের বিচারে *শাহনামা*-কে বিশ্বে রচিত অনেক মহাকাব্যের চেয়ে উন্নততর বলে অভিহিত করে থাকেন। শুধু তাই নয়, *শাহনামার* অনুকরণে অনেক বীরত্বগাথাও রচিত হয়েছে– যা এ গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। উল্লেখ্য যে, জার্মান প্রাচ্য ও ভাষাতত্ত্ববিদ থিওডর নোল্‌ডেক ও হারমান এথি (Theodor Nöldeke and Hermann Ethé) বিস্তর পরিশ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে এ অমর কবির নির্ভরযোগ্য জীবনী ও *শাহনামার* প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে সফল হয়েছিলেন।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রায় তিনশ বছরকালব্যাপী পারস্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ফারসি ভাষা উপযুক্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়ে উঠেছিল। ফেরদৌসি তাঁর এ রচনার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় পারস্যের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ফারসি ভাষা পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসেন। তিনি তাঁর *শাহনামার* শ্লোকে শ্লোকে জাতীয় অনুভূতি, উপলব্ধি ও চেতনার এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যার দ্বারা ইরানি জনগণ ব্যাপকভাবে জাতীয় মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে *শাহনামা* হলো ভিনদেশি শাসনশৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বহুকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এবং জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক।

শাহনামা কাব্যগ্রন্থের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে মূলত প্রাচীন লোকগাথা, ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থসমূহ, গল্প, উপাখ্যান, ও কিংবদন্তি থেকে। এছাড়া এতে বর্ণিত ঘটনাসমূহের ব্যাপ্তিকাল প্রায় তিন হাজার আটশ বছরের অধিক। কবি ফেরদৌসি এ দীর্ঘ সময়কালকে উপাখ্যান আর ইতিহাস এ দু'টি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। এছাড়া ঊনচল্লিশটি রাজবংশের শাসন-বিবরণী এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, *শাহনামা* গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে ফেরদৌসি তাঁর জনৈক বন্ধু কবি দাকিকির পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিয়েছিলেন। *শাহনামা* রচনায় এটি ছিল ফেরদৌসির সবচেয়ে বড় সূত্র। কারণ, ফেরদৌসির পূর্বে সর্বশেষ *শাহনামা* রচয়িতা ছিলেন কবি দাকিকি তুসি। মূলত দাকিকি তৎকালীন শাসক নুহ ইবনে মানসুর সামানির নির্দেশে *শাহনামা* রচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এক হাজার পঙ্‌ক্তি রচনাও করেছিলেন। কিন্তু কবি দাকিকি পুরো রচনার কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তথ্য ও উপাত্তের প্রমাণস্বরূপ ফেরদৌসি তাঁর *শাহনামায়* দাকিকির উল্লিখিত এক হাজার বেইত তথা পঙ্‌ক্তি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ফেরদৌসির *শাহনামায়* যে বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বীরদের মানসিকতা, প্রচেষ্টা, ন্যায়পরায়ণতা, রাজনীতি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। এতে শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ের উল্লেখের পাশাপাশি রয়েছে বিশ্বদর্শন।

সাহিত্যামোদীদের নিকট কবি ফেরদৌসির গুরুত্ব ও আবেদন কেবল তাঁর ভাষার লালিত্য ও মাধুর্যের মধ্যেই নিহিত নয়; বরং তাঁর ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদের মাঝেও বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর রচিত *শাহনামা* গ্রন্থের পরতে পরতে গল্পের কাহিনীগুলো এমনিভাবে বিধৃত রয়েছে যে প্রতিটি চরিত্রই যেন একেক জন পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ

করছে। যে কারণে এ মহাকাব্য সাহিত্যের একটি উচ্চমার্গে গিয়ে পৌঁছেছে। ফেরদৌসি তাঁর শৈল্পিক বর্ণনাগুলোতে অলঙ্কারশাস্ত্রীয় উপাদানগুলোও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন, যা ছিল সে সময়ের বিরল ব্যবহার। এ ছাড়া তিনি প্রচলিত সাহিত্যরীতির বিপরীতে অন্তর্নিহিত বর্ণনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন আর এটি ছিল তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত শৈলী। এ ধরনের সাহিত্যশৈলী ফারসি সাহিত্যে বিরল। তিনি তাঁর *শাহনামা* কাব্যগ্রন্থকে ধ্বনি, শব্দ চয়ন, এমনকি ব্যাকরণসহ সকল স্তরে একটি সুশৃঙ্খল গঠন কাঠামোর মাধ্যমে বিন্যস্ত করেছেন। যার ফলে এটি ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত অবস্থানে রয়েছে।

কবি ফেরদৌসি ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে *শাহনামা* রচনা শুরু করেন এবং ১০১০ খ্রিস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে তা সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর যৌবনকালসহ পরবর্তী পুরো জীবনকালটাই এ সাহিত্যকর্ম রচনায় ব্যয় করেছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি যে *শাহনামা* কাব্যগ্রন্থটি রচনা করে গোটা পারস্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন– তা তাঁর বক্তব্যেই নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন :

بسي رنج بردم در اين سال سي عجم زنده كردم بدين پارسي

আমি বহু কষ্ট ভোগ করেছি এই দীর্ঘ ত্রিশটি বছর ধরে
আর এ পারসির (ফারসি) মাধ্যমে পারস্যকে জীবন্ত করেছি।

ফেরদৌসির যুগে আনুষ্ঠানিকভাবে গল্প বলা ও শোনার একটা প্রচলন ছিল। কারণ, সে সময় বেশিরভাগ লোকই পড়তে ও লিখতে জানত না। এ ধরনের গল্প পাঠের আসরে পরিবেশন করা হতো ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী। পুরাণপাঠের এ কাজটিকে বলা হয় নাক্কালি আর যিনি কাহিনীগুলো পাঠ করে শোনান বা উপস্থাপন করেন তাঁকে বলা হয় নাক্কাল বা পুরাণপাঠকারী। তাঁর হাতে থাকত একটি লাঠি যা দিয়ে তিনি চরিত্র চিত্রায়ণ করতেন। বলা যায় ঠিক আমাদের দেশের পুঁথি পাঠের ন্যায়। অনেকের অভিমত পুরাণপাঠকারীর গল্প বলার কাজটিকে সহজতর ও প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যেই ফেরদৌসি সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পৌরাণিক কাহিনীগুলো রচনা করে তা *শাহানামা* কাব্যগ্রন্থে তুলে ধরেছেন। কবি ফেরদৌসি নিজেই *শাহনামা* গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন :

توانم مگر پايه‌اي ساختن بر شاخ آن سرو سايه فكن
كزين نامور نامۀشهريار به گيتي بمانم يكيادگار
تو اين را دروغ و فسانه مدان به رنگ فسون و بهانه مدان
ازو هر چه اندر خورد با خرد دگر بر ره رمز و معني برد
يكي نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان
پراگنده در دست هر موبدي ازو بهره‌اي نزد هر بخردي
يكي پهلوان بود دهقان نژاد دلير و بزرگ و خردمند و راد
پژوهندۀروزگارنخست گذشتهسخنهاهمهبازجست
ز هر كشوري موبدي سالخورد بياورد كاين نامه را ياد كرد
بپرسيدشان از كيان جهان وزان نامداران فرخ مهان
كه گيتي به آغاز چون داشتند كه ايدون به ما خوار بگذاشتند
چه گونه سرآمد به نيک اختري برايشان همه روز كند آوري
بگفتند پيشش يكايک مهان سخنهاي شاهان و گشت جهان
چو بشنيد ازيشان سپهبد سخن يكي نامور نامه افكند بن
چنين يادگاري شد اندر جهان برو آفرين از كهان و مهان

‘আমি উড়ন্ত জলধর, কিন্তু পদযুগ বিন্যস্ত করেছি
সেই ছায়াচ্ছন্ন দেবদারুর উন্নত শাখায়।
কারণ, যশস্বী নরপতিগণের এই ইতিকথা
দুনিয়ায় আমার স্মারক হয়ে থাকবে।
তুমি এ’কে অলীক কাহিনী বলে মনে করো না,
গণ্য করো না তাকে যুগ-চিত্তের উৎসার মাত্র বলে।
এর কিছু কাহিনীতে রয়েছে বুদ্ধির ও জ্ঞানের দীপ্তি,
অন্যরা নিজেদের মধ্যে বহন করছে রহস্যময় তাৎপর্য।
অতীত কালে ছিল পূরাকীর্তি সম্বলিত এক গাথা,
তার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল অনেক উপাখ্যান।
প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে মুখে তা ছড়িয়েছিল,
সেগুলি থেকে তারা সংগ্রহ করত প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের সম্পদ।
কোন নিভৃত গ্রামাঞ্চলের এক বীর সন্তান
বর্ষীয়ান সাহসী জ্ঞানী ও দানশীল–
আদিম যুগের সেই ইতিকথার খোঁজে তৎপর হলো,
কাহিনীগুলোর উদ্ধার মানসে সে ঘুরে বেড়ালো বহুদিন।
ফিরলো সে বহু নগরীর পথে পথে,
ফলে সংগৃহীত হলো এই গাথা।
সবারই কাছে সে জিজ্ঞাস করেছে কেয়ানী বংশের আদিম ইতিহাস,
জেনেছে সে তাদের থেকে যশস্বী সেই নক্ষত্রের পরিচয়।
জেনেছে, সেই আদিম যুগে রাজারা কেমন করে শাসন করতেন পৃথিবী,
আর আজ কেমন করে লুপ্ত হয়েছে সেই কীর্তিকলাপ?
প্রশ্ন করেছে সে, কেমন করে অস্ত গেলো সেই সুভগ নক্ষত্র,
কাল কেমন ছিল সেই বীরবৃন্দের উপর?
দলপতিগণ একে একে বিবৃত করেছেন তার কাছে
রাজ-রাজড়াদের কীর্তিগাথা ও জগতের পরিবর্তনের ইতিহাস।
সেই বীর-জ্ঞানী তাঁদের কাছ থেকে জেনেছে অতীতের সব কীর্তি,
তারপর সেই সংগ্রহ থেকে রচিত হয়েছে এক মহান পুরাণ কথা।
জগতে সেই গাথাই হয়ে আছে অতীতের স্মৃতি,
সর্বত্র জ্ঞানী ও ধর্মবেত্তা জানিয়েছে তাকে স্বাগতম।’(মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত *শাহনামা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪)

কবি ফেরদৌসি তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি শুরু করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালার নামে। তিনি এ সাহিত্যকর্মে দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টজীব। সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ। ইসলামের ন্যায় সত্যিকার ও পরম ধর্মের মধ্যেই শান্তি বিরাজমান। আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টির সীমারেখার ভিতর ও বাহিরের সকল কিছুই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের শুরু-সূচনাতে সহজ ও সাবলীল ভাষায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেন :

به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جاي خداوند روزي ده رهنماي
خداوند كيوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهيد و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارندهٔبرشدهپیکرست
به بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را
نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه
سخن هر چه زین گوهران بگذرد
نیابد بدو راه جان و خرد
خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی

'প্রাণ ও প্রজ্ঞার প্রভুর নামে শুরু করি,
অতিক্রম করতে পারে না কল্পনা তাঁর নামের সীমা।
প্রভু তিনি নামের, প্রভু তিনি স্থানের,
তিনিই আহার্য দান করেন, তিনিই পথ দেখান।
তিনি প্রভু পৃথিবীর ও ঘূর্ণ্যমান আকাশের,
চন্দ্র-সূর্য ও শুকতারা আলো পায় তাঁর থেকে।
বর্ণনা, ইঙ্গিত ও ধারণার ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান,
চিত্রকরের সৃষ্টির তিনি মূলতত্ত্ব।
সৃষ্ট জীবের রক্ষণে তিনি সদাতৎপর,
তাঁর অস্তিত্বে সংশয়াপন্ন ব্যক্তির দুঃখও তিনিই দূর করেন।
কল্পনা পথ পায় না তাঁর মধ্যে;
কারণ, নাম ও স্থানের বাইরে তিনি।
কিন্তু বাণী থেকে নাম ও স্থান অন্তর্হিত হলে
প্রাণ ও প্রজ্ঞা দুই-ই স্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে যায়।
তাই, প্রজ্ঞা ভাষাকে নিয়োজিত করে
অমূর্তকে চাক্ষুষ করার জন্যে।' (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত *শাহনামা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১)

ফেরদৌসি তাঁর *শাহনামায়* প্রজ্ঞা ও যুক্তিনির্ভর একটি আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সে বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে *শাহনামা* কাব্যগ্রন্থে যে তাঁর আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে, তার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। কবি বলেন :

حکیم این جهان را چو دریا نهاد
برانگیخته موج ازو تندباد
چو هفتاد کشتي برو ساخته
همه بادبانها برافراخته
یکي پهن کشتي بسان عروس
بیاراسته همچو چشم خروس
محمد بدو اندرون با علي
همان اهل بیت نبي و ولي
خردمند کز دور دریا بدید
کرانه نه پیدا و بن ناپدید
بدانست کو موج خواهد زدن
کس از غرق بیرون نخواهد شدن

'এই জগৎকে জ্ঞান কর এক সমুদ্র বলে,
যেখানে গর্জন করে ফিরছে প্রবল ঝঞ্ঝা ক্রুদ্ধ ঊর্মিদল;
যেখানে সত্তরটি অর্ণবযান অনুকূল হাওয়ায়
তুলে দিয়েছে তাদের প্রসারিত বাদবান।
তার মধ্যে একটি জলযান সজ্জিত কনের বেশে
রাজহংসের গতিতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।
তার মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মদ ও আলী
এবং নবী ও আলী পরিবারের সকলে।
দূরে দাঁড়িয়ে জ্ঞানীজন দেখতে পায়–
এই সমুদ্র অসীম–তার তটরেখা অদৃশ্য।

তারা বুঝতে পারে উত্তাল তরঙ্গ যখন হানবে তার অভিঘাত,
তখন হয়তো নিমজ্জন থেকে কেউই রক্ষা পাবে না।' (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত *শাহনামা*, ১ম খণ্ড,পৃ. ১১)

ধারণা করা হয়ে থাকে যে, উপরে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলোতে রাসূল (সা.)-এর একটি হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে হাদিসটির মূল বক্তব্য হলো এই যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মত খুব শীঘ্রই তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যার বাহাত্তরটি দলই যাবে জাহান্নামে এবং একটি দল যাবে জান্নাতে। যদিও কবিতার পঙ্‌ক্তিতে সত্তরটি কিশ্‌তি তথা জাহাজের কথা উল্লেখ রয়েছে। এখানে রূপকভাবে গোটা জগতকে সাগর হিসাবে জ্ঞান করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াটা হলো সাগরতুল্য। আর এ সাগরে অবস্থানরত সত্তরটি জাহাজ হলো সত্তরটি দল। মহান আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বকে সমুদ্ররূপে সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীকে যেহেতু তিনি সমুদ্রের ন্যায় সৃষ্টি করেছেন তাই নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহে পূর্ণ রয়েছে এ পৃথিবী। এতে যেমন রয়েছে বিপদ ও বিচ্যুতির আশংকা, তেমনি রয়েছে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। উত্তাল তরঙ্গ মাঝে অস্থির বাতাস, তুফান ও ধ্বংসাত্মক দমকা হাওয়া জগতের এ সমুদ্রকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই সংকটময় অবস্থায় যারা অবিচল থেকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে আঁকড়ে ধরবে তারাই তথা সে দলটি সফলতা লাভ করবে। *শাহনামায়* বর্ণিত এইরূপ অনেক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফেরদৌসির আধ্যাত্মিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

কবি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের প্রতি জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে মুক্তির পথ অন্বেষণ করা এবং অধঃপতিত জীবন থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ও অবলম্বন হলো পয়গম্বরের বাণীকে ধারণ করা। যে বাণী ও আদর্শকে ধারণ করলে হৃদয়ের অন্ধকারকে দূরীভূত করে আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া সম্ভব। কবি বলেন :

ترا دانش و دين رهاند درست در رستگاري ببايدت جست
وگر دل نخواهي كه باشد نژند نخواهي كه دايم بوي مستمند
به گفتار پيغمبرت راه جوي دل از تيرگيها بدين آب شوي

'তোমার জ্ঞান ও ধর্মকে কর কুসংস্কার থেকে মুক্ত,
মুক্তির পথ অন্বেষণ করাই হলো তোমার কাজ।
অধঃপতিত জীবন থেকে উঠে আসার যদি বাসনা থাকে
যদি বাসনা থাকে চিরদিনের দুঃখ থেকে রেহাই পাওয়ার,–
তবে তোমার পয়গম্বরের বাণী নিয়ে কর পথের অন্বেষণ–
হৃদয়ের অন্ধকার গুহা সকলকে কর তার আলোয় আলোকিত।'
(মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত *শাহনামা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০)

আমরা জানি যে, মহাকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনীগুলোর বিশ্লেষণ, মহান বীরযোদ্ধাদের গুণ, বৈশিষ্ট্য ও কীর্তি বর্ণনা এবং বিভিন্ন জাতির ভাগ্য নির্মাণে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস তুলে ধরা। পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আত্মউদ্দীপক বিষয়গুলোও এতে সমভাবে অনুরণিত হয়ে থাকে। এছাড়া মাহাকাব্যে ফেলে আসা অতীত যুগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, একটি জাতি প্রতিষ্ঠার ঘটনা ও নিজের প্রসিদ্ধ বীরত্বগাথা বিধৃত থাকে।

মহাকাব্যের রচয়িতাগণ এ ধরনের সাহিত্যকর্মে নিজ জাতি ও মানবসভ্যতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন এবং তাঁদের ভিতরের রহস্যকে নিজদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে উন্মোচিত করেন। তাঁরা মনে করেন জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বীরত্ব জানার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় লাভ করা যায় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাতীয় আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত হওয়া যায়। মহাকাব্যে বিধৃত বীরদের কাহিনী থেকে শিক্ষা নিয়ে অত্যাচার ও নীপিড়নের বিরুদ্ধে জাতি ও দেশকে ধ্বংস থেকে রক্ষার উপায় ও অবলম্বন অন্বেষণ করা যায়। বিশ্বে যে কয়টি নির্ভরযোগ্য মহাকাব্য রয়েছে সেগুলোর মূল বক্তব্য ও বিষয় অনেকটা একই বলে প্রতিভাত হয়।

ফেরদৌসি তাঁর *শাহনামা* কাব্যগ্রন্থে প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস-ঐতিহ্য বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্র গঠন, বীরত্ব, পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা ও জ্ঞানের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। জ্ঞানের যে বিশাল শক্তি রয়েছে সে বিষয়ে তিনি বলেন :

توانا بود هر كه دانا بود ز دانش دل پير برنا بود

যে জ্ঞানী সেই শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান,
আর জ্ঞানসমৃদ্ধ বৃদ্ধের হৃদয় চির যৌবন থাকে।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যে অমূল্য সম্পদ সে সম্পর্কে কবি ফেরদৌসি অন্যত্র বলেন :

خرد بهتر از هر چه ايزد بداد ستايش خرد را به از راه داد
خرد رهنماي و خرد دلگشاي خرد دست گيرد به هر دو سراي
ازو شادماني وزويت غميست وزويت فزوني وزويت كميست
خرد تيره و مرد روشن روان نباشد همي شادمان يک زمان
چه گفت آن خردمند مرد خرد كه دانا ز گفتار از برخورد
كسي كو خرد را ندارد ز پيش دلش گردد از كردۀخويشريش

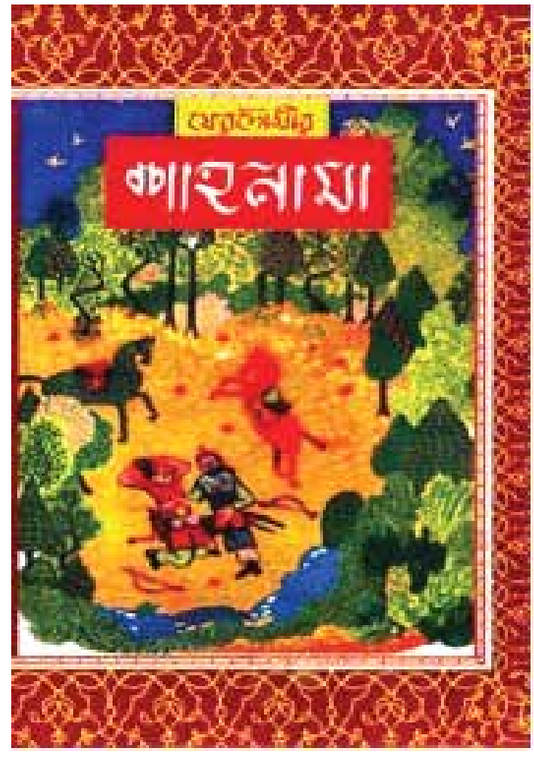

মহান প্রভুর দানের মধ্যে সবচেয়ে অধিক মূল্যবান হলো জ্ঞান,
জ্ঞানের প্রশংসা করাই বদান্যতার পথে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
জ্ঞান পথের দিশারী আর জ্ঞানই হলো হৃদয়-মুক্তকারী
জ্ঞানে মাধ্যমেই উভয় জগতকে আঁকড়ে ধরা যায়।
জ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায় আনন্দ ও দুঃখকে
এ (জ্ঞান) থেকে অর্জিত হয় উৎকর্ষ আর এর (জ্ঞান) অভাবে আসে খর্বতা।
জ্ঞান অন্ধকার ও জড়ত্বকে দেয় চলমান ঔজ্জ্বল্য
জ্ঞান ছাড়া এক মুহূর্তও প্রফুল্লে ভরে ওঠে না মন।
জ্ঞান সম্পর্কে কতই না সুন্দর বলেছেন জ্ঞানীজন–
জ্ঞানীজন বাগ্মিতায় হয়ে ওঠেন অনন্য উচ্চমার্গীয়।
যার রয়েছে জ্ঞানের বিস্তর অভাব
সে নিজেকে দুষ্টক্ষতের ভাণ্ডারে পরিণত করেছে।

ফেরদৌসি *শাহনামা* রচনা করে ফারসি ভাষাকে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রতিরোধের মানসিকতা, খোদার আনুগত্য, স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু *শাহনামার* বড় পরিচয় হচ্ছে ফারসি ভাষার অস্তিত্বের সনদ হিসাবে।

ফেরদৌসি *শাহনামা* কাব্যগ্রন্থে যুদ্ধ ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনী বর্ণনার পাশাপাশি তথ্যপূর্ণ উপদেশাদি, ন্যায়পরায়ণতা, বদান্যতা, মহত্ত্ব ও নৈতিক কর্তব্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য দিতেও সচেষ্ট ছিলেন। *শাহনামায়* বর্ণিত এমনি উপদেশ সম্পর্কিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিচে তুলে ধরা হলো :

بیا تا جهان را به بد نسپریم　　به کوشش، همه دست نیکي بریم
نماند همي نیک و بد پایدار　　همان بِه، که نیکي بود یادگار
نه گنج و نه دیهیم و کاخ بلند　　نخواهد بدن مر ترا سودمند
فریدون فرخ فرشته نبود　　ز مُشک و ز عنبر سرشته نبود
بِه داد و دهش یافت این نیکویي　　تو داد و دهش کن فریدون تویي

এসো, এ পৃথিবীকে যেনো আমরা অকল্যাণের দিকে ঠেলে না দেই,
প্রচেষ্টার মাধ্যমে একে সামগ্রিক কল্যাণে পরিণত করবো।
ভালো-মন্দ কিছুই স্থায়ী রবে না,
তবে কল্যাণকর স্মৃতি ধরে রাখাই উত্তম।
সুউচ্চ প্রাসাদ, ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য
তোমার কোনো কল্যাণেই আসবে না
ফরিদুন কোনো ফেরেশতা ছিলো না,
কিংবা কোনো মৃগনাভি বা কস্তুরী দ্বারাও সৃষ্ট নয় সে।
সেতো ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা দিয়ে এ মহত্ত্বের অধিকারী হয়েছে,
তুমিও ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা অর্জন কর, তবেই তুমি হবে ফরিদুন ।

ফেরদৌসির *শাহনামা* কাব্যগ্রন্থে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মনুষত্বই শ্রেষ্ঠ আর জ্ঞান ছাড়া সে মনুষ্যত্ব অর্জিত হয় না। সৎ ও সততার দ্বারাই কেবল সকলের মাঝে সাম্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। কবি বলেন :

دگر گفت روشن روان آن کسي　　که کوتاه گوید به معني بسي
چو گفتار بیهوده بسیار گشت　　سخنگوي در مردمي خوار گشت
هنر جوي و تیمار بیشي مخور　　که گیتي سپنج است و ما برگذر
بگیتي به از مردمي کار نیست　　بدین با تو دانش به پیکار نیست
ز دانش چو جان ترا مایه نیست　　بِه از خاموشي هیچ پیرایه نیست

সে (বুজুর্গ মেহের নুশিরওয়ানকে) বললো: সে-ই আলোকিত আত্মার অধিকারী
যে সংক্ষেপে অধিক অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলে।
যদি বক্তব্য বহুলাংশে অনর্থক হয়ে ওঠে
তবে লোকদের কাছে বক্তা তুচ্ছে পরিণত হয়।
জ্ঞান অন্বেষণ কর আর দুঃখকে প্রশ্রয় দিও না
এ পৃথিবী ক্ষণিকের, আর আমাদের চলে যেতেই হবে।
এ জগতে মনুষ্যত্ব বৈ আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয়
তাই জ্ঞান ব্যতিরেকে তোমার শরীরের কোনো মূল্য নেই।
যদি জ্ঞানসমৃদ্ধ আত্মা তোমার নাই বা থাকে
তবে মৌনতা ছাড়া তোমার আর কোনো ভূষণ নেই।

পুরো *শাহনামা*ই চিত্রকল্পে ভরপুর। যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র এবং এর চরিত্রগুলো প্রাণবন্তভাবে এ গ্রন্থে অনুরণিত হয়েছে। পাশাপাশি এতে আধ্যাত্মিকতা, প্রজ্ঞা, আদর্শ এবং জীবনঘনিষ্ঠ নানা উপদেশও বাণী এমনিভাবে বিধৃত রয়েছে যে, পাঠক সহসাই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া *শাহনামায়* বর্ণিত প্রতিটি কাহিনীতে রয়েছে একেকটি উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়। কবি অভিযানের কাহিনীতেও পাঠকদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন– যা সিনেমার পর্দার মতো কাজ করেছে। আর এতেই *শাহনামা*র বিশ্বজনীনতার প্রমাণ মেলে। এ গ্রন্থের আবেদন পাঠক হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে অক্ষুণ্ন থাকবে। আর তাঁর প্রদত্ত বাণী নিজ নিজ জাতির জন্য হয়ে থাকবে শিক্ষণীয় ।

তথ্যসূত্র

১. আবদুল মওদুদ (১৯৮০ খ্রি.) : *মুসলিম মনীষা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
২. আহমাদ তামিমদারি (২০০৭ খ্রি.) : *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ইরান।
৩. আবুল কাসেম ফেরদৌসী (১৯৭৭ খ্রি.) : *ফেরদৌসীর শাহনামা* (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী (২০১৪ খ্রি.) : *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
৫. সাদেক রেযা যাদে শাফাক (১৩৫২ সৌরবর্ষ) : *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান (ইরানি সাহিত্যের ইতিহাস)*, এনতেশারাতে দানেশগাহে পাহলাভি, ইরান।
৬. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৩৬০ বঙ্গাব্দ) : *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক অজিত চট্ট ঘোষ, শ্রী জগদীশ প্রেস, কলকাতা।
৭. *নিউজ লেটার*, (ঢাকাস্থ ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মুখপত্র), ৩য় সংখ্যা, মে-জুন, ২০১৩।
৪. https://ganjoor.net/ferdousi/shahname

লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নতুন ইন্সটাগ্রাম পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেল চালু

ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নতুন ইন্সটাগ্রাম পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেল চালু করা হয়েছে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং দেশটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় তথ্য পেতে পেইজটি আজই ভিজিট করুন।

ইন্সটাগ্রাম পেইজের ঠিকানা https://www.instagram.com/iran_cultural_center_dhaka?r=nametag

নিয়মিত তথ্য পেতে পেইজটির ফলোয়ার হোন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।

আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম: iran-culture-bd

ইউটিউব চ্যানেলের ঠিকানা:
https://www.youtube.com/channel/UCqpd3vaK56AK2yRpfR124kw

বাংলা সাহিত্য ফারসি রসে ঋদ্ধকরণে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান

মেহেদী হাসান

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব প্রতিভা এবং চিরন্তন বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিভূ এক স্বভাব-কবি। আজীবন দারিদ্র্যের সাথে মিতালিতে অভ্যস্ত মহান নজরুল সৈনিক হিসেবে বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে, নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে ধূমকেতুর মতো প্রকাশনার জগতে এবং সাধারণ বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজনীতির আঙ্গিনায় অবাধ বিচরণের পাশাপাশি কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস ও নাটকসহ সাহিত্যের সকল শাখায় নিজের যে অসামান্য সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বসাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খি.) যুগে জন্মগ্রহণ করেও তিনি কেবল তাঁর প্রভাবমুক্ত হতেই সক্ষম হননি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সূচনা করতে পেরেছিলেন এক অনন্য ধারার, যে ধারাটি মধ্যযুগে বাঙালি মুসলিম কবিদের প্রচেষ্টায় 'মুসলমানি রীতি' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। মূলত 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য কেবল হিন্দুদের সাহিত্য নয়, মুসলমানদের সাহিত্যও বটে'– এ বিষয়টিকে যে কেবল প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তা-ই নয়, বাংলা সাহিত্য-জগতে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী শ্রেষ্ঠত্বের স্থানটিকেও তিনি নিজের করে নিতে পেরেছেন। তিনি এ দুরূহ কাজটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন কুলীন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অবহেলিত, কিন্তু বাংলার আপামর গণমানুষের মুখে মুখে সাধারণভাবে প্রচলিত ফারসি, আরবি ও উর্দু শব্দরাজিসমৃদ্ধ 'মুসলমানি ভাষা' অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সাহিত্যকর্মে ব্যবহারের মাধ্যমে। তিনি এতে এতটাই সফল হয়েছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই এ সাহিত্য-রীতিকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী ধারার উদ্ভব ঘটে। তাঁর সম ও উত্তরকালে হিন্দু মুসলমান বহু কবি-সাহিত্যিকই এ ধারায় প্রভাবিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নজরুল যে ভাষার শব্দ সবচেয়ে বেশি ঋণ করেছেন, সেটি হচ্ছে ফারসি। শুধু ফারসি শব্দই নয়, বিশ্বখ্যাত ফারসি সাহিত্যের বিভিন্ন সাহিত্য-উপাদানও বাংলা সাহিত্যে প্রয়োগ করে এ সাহিত্যকে তিনি নিয়ে যান এক অনন্য উচ্চতায়। ফারসি সাহিত্যের বিশ্ববিশ্রুত কবিদের বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের অনুবাদ ও তাঁদের দর্শন ও ভাবধারাকে বাংলা সাহিত্যে প্রবিষ্ট করে তিনি এ সাহিত্যে একটি ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেন। তাঁর এ বিস্ময়কর প্রতিভাই বাংলা সাহিত্যে তাঁকে দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব ও চিরন্তনতা; আসীন করেছে বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি'র আসনে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, আর্য ও অনার্যদের সংমিশ্রণের ফসল হচ্ছে বাঙালি জাতি। এর পরবর্তী পর্যায়ে আরব-ইরান তথা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক ও বিজয়ী শাসকগোষ্ঠী বঙ্গীয় জনপদে ইসলাম প্রচারের ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান– এ দুটি বৃহত্তর স্বতন্ত্র সম্প্রদায় অস্তিত্ব লাভ করে। ফলে অবধারিতভাবে ধর্মকে কেন্দ্র করে একই ভাষার দুটি ধারা সূচিত হয়। সনাতনী বাংলা এবং মুসলমানি বাংলা। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে এ দুটি ধারায়ই যথাক্রমে হিন্দু লেখকগণ মঙ্গলকাব্য

এবং মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ ফারসি সাহিত্যের অনুবাদ-নির্ভর বাংলা পুঁথিকাব্য, যেমন : ইউসুফ-জুলেখা, লাইলী-মজনু, জঙ্গনামা, নূরনামা প্রভৃতি কাব্য রচনা করতে থাকেন। মুসলমানি বাংলা বলতে আমরা ওই বাংলাকে বুঝি, যে বাংলা সমৃদ্ধ হয়েছিল ফারসি এবং ফারসিভাষী শাসকগোষ্ঠীর ভাষায় ব্যাপকহারে ব্যবহৃত আরবি শব্দাবলির দ্বারা, যেগুলোকে তারা ফারসি ভাষার আবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। বলা হয়ে থাকে, ফারসি-আরবি শব্দভাণ্ডারসমৃদ্ধ এ মুসলমানি বাংলা-ই বাংলা ভাষাকে মৃতভাষায় পরিণত হবার হাত থেকে রক্ষা করে। এ ভাষাটি সৃষ্টির পটভূমি হচ্ছে : ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গদেশ মুসলিম শাসনের আওতায় আসার পর থেকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৬৩৪ বছর বাংলার সরকারি তথা রাজভাষা ছিল ফারসি। চাকুরি পাবার ক্ষেত্রে এখন যেমন প্রত্যেকের ইংরেজিজ্ঞান থাকা আবশ্যক, ওই সময়কালে তেমনি হিন্দু, মুসলমান কিংবা অন্য যেকোনো ধর্মের অনুসারীকেই সরকারি চাকুরি পেতে হলে ফারসি ভাষা জানতেই হতো। শাসকদের ভাষা হিসেবে এটি ছিল সকল সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণির ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। ফলে এ ছয় শতাধিক বছরে হাজার হাজার ফারসি এবং ফারসিতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ ব্যাপকহারে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। উল্লেখ্য, ফারসি ভাষা বাঙালি জাতির উপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক এ দেশ বিজিত হলেও ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৮১ বছর তারা তাদের ভাষা ইংরেজি দ্বারা ভারতবর্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। এ সময়ে তাদেরকেও ফারসি ভাষা শিখেই এদেশ শাসন করতে হয়েছে। এমনকি ১৮৩৮ সালে এক রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে ইংরেজিকে সরকারি ভাষায় রূপান্তরিত করা হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ফারসি ভাষার ব্যবহার ও চর্চা

এদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে স্ব-মহিমায় বিদ্যমান ছিল।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ফারসির ভাষাশৈলী সাহিত্যচর্চা– বিশেষত কাব্যচর্চার জন্য বিশ্বের যে কোনো ভাষার চেয়ে অনুকূলতর। তবে কেবল ভাষাশৈলীই নয়, এ ভাষায় বিদ্যমান প্রেম, মানবতা ও নৈতিকতার বাণী ও শিক্ষা বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করত। আর এ কারণেই তাঁরা বাধ্য হয়ে নয়, বরং মনের টানেই এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। আর সে কারণেই ১৮৩৮ সালে সরকারিভাবে এ ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে গেলেও এর চর্চা সাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তখনও বিদ্যমান ছিল। তবে এটা ঠিক যে, চর্চাটি তখন ক্রমক্ষয়িষ্ণু ছিল।

বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে তখনও ফারসি ভাষার চর্চা সমাজে বিদ্যমান ছিল; এমনকি মধ্যযুগে যে বাঙালি হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ বিদ্বেষপ্রসূতভাবে এ ভাষার শব্দরাজি ব্যবহার থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন, তাঁরাও এ যুগে তাঁদের গল্প-কবিতায় ফারসি-আরবি শব্দের ব্যবহার শুরু করেন, এদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের নাম প্রণিধানযোগ্য। অত্র প্রেক্ষাপটটির এ কারণে অবতারণা করা হলো, যাতে আগ্রহী পাঠকগণ অনুধাবন করতে পারেন যে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া কাজী নজরুল ইসলাম এমন একটা সময়, পরিবেশ ও পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন, যেখানে ফারসি কোনো অপরিচিত ভাষা ছিল না এবং এর চর্চা ক্ষীণভাবে হলেও সেখানে তখনও বিদ্যমান ছিল। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ জিনগতভাবেই নজরুলের মধ্যে বিরাজমান ছিল। এটা ছিল শত শত বছরের প্রাচীন এমন এক উত্তরাধিকার, যা দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফারসি ভাষাজ্ঞানের সাথে নজরুলের পরিচয়, যখন তিনি চুরুলিয়া গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে যান। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তৎকালীন মক্তবসমূহে বাংলা, উর্দু ও আরবি শেখানোর পাশাপাশি কবি শেখ সাদির *গুলিস্তান*, *বুস্তান* ও *পান্দনামা*, ফরিদুদ্দিন আত্তারের *পান্দনামা* ও *মানতেকুত্তাইর* এবং মৌলানা রুমির *মসনভি* শরিফের পাঠও দেয়া হতো। তাই মক্তবে পাঠগ্রহণকালীন তিনি ফারসির উপর প্রাথমিক জ্ঞান লাভ তো করেনই, উপরন্তু শিক্ষালাভ শেষে তিনি যখন একই মক্তবে শিক্ষকতা শুরু করেন, তখন হয়ত ওই ফারসি কিতাবাদি তাঁকে পড়াতেও হতো। এছাড়া তাঁর জীবনীগ্রন্থসমূহে দেখা যায়, শৈশবকালে তিনি তাঁর চাচা বজলে করিমের কাছে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপর তালিম নেন। এভাবে তাঁর ফারসি ভাষাজ্ঞান ধীরে ধীরে আরো শাণিত হয়ে ওঠে।

ভৌগোলিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামের কিছুটা উত্তর থেকেই শুরু হয়েছে উর্দুভাষী বিহারী অধ্যুষিত ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্য। সে কারণের চুরুলিয়া এলাকার মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হলেও তা ছিল ব্যাপক মাত্রায় উর্দু প্রভাবিত। আর যেহেতু ফারসি শব্দভাণ্ডারকে আশ্রয় করে হিন্দি ভাষা থেকে উর্দু ভাষার জন্ম, তাই ভৌগোলিক কারণেও নজরুল উর্দু ও উর্দুর হাত ধরে ফারসি শব্দরাজির সাথে পরিচিতি লাভ করেন সেই ছোটবেলাতেই।

নজরুলের এ ফারসি জ্ঞান পরিপক্বতা লাভ করে যখন তিনি ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করে বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত করাচি শহরে গমন করেন। সেখানে তিনি ১৯১৯ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপর গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনূদিত 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ' গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' নজরুল নিজেই উল্লেখ করেন :

আমি যখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি, সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা, সেখানেই প্রথম হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন মৌলভী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতগুলি কবিতা আবৃতি করে শোনান, শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেদিন থেকেই তাঁর কাছে ফারসি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁর কাছেই ক্রমে ক্রমে ফারসি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।

তিনি যে ফারসি সাহিত্যের একজন বড় অনুরাগী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রিয় বন্ধু মুজাফফর আহমদের ভাষ্যেও। করাচি থেকে ফিরে আসার পর তিনি কবির গাঁঠরির মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সাথে ফারসিতে লেখা *দিওয়ান-ই-হাফিজের* একটি বড় সংস্করণও দেখতে পান বলে জানান। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, কবি নজরুল তাঁর সফল কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন হাফিজের কবিতা দিয়েই। কবিতাটির নাম ছিল 'আশায়' এবং এটি বাংলা ১৩২৬ সালে *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হাফিজের একটি গজলের ভাবধারা অবলম্বনে তিনি রচনা করেছিলেন এ কবিতাটি, কবিতার প্রথম দুটি লাইন ছিল এমন :

নাইবা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন যুঁই কুঁড়িটার পাশে...

তিনি চেয়েছিলেন এ কবিতার মধ্যমে ইরানি কবি হাফিজের কাব্যে বাংলার সবুজ দূর্বা ঘাস ও যুঁই ফুলের সুবাসকে ছড়িয়ে দিতে। ফারসি কাব্য বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন পারস্যের

প্রেমময় আবহকে বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করে একে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিতে। তিনি ইরানের গোলাব আর নার্গিসের সুবাসকে বাংলার যুঁই-চম্পা-চামেলীর বাগিচায় স্থান দিয়ে একে আরও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন কোকিলের পাশাপাশি ইরানি বুলবুলির গান, যাতে বাঙালি জাতি এক নবসুরের রসাস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হতে পারে। তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় শতভাগ সফলতাও লাভ করেছিলেন। তিনি ইরানের দার্শনিক কবি ওমর খৈয়ামের ১৯৭টি রুবায়ি বা চতুষ্পদী কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। তবে এতে তিনি এতটাই মুন্সিয়ানা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সেগুলো কি অনুবাদ নাকি মৌলিক রচনা, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণও পাঠ করার সময় সে পার্থক্যটি নির্ণয় করতে সত্যিই সংশয়ে পড়ে যান। উদাহরণত খৈয়ামের একটি রুবাই:

گویند کسان که بهشت با حور خوش است
من می گویم آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از نسیه مدار
که آواز دهل شنیدن از دور خوش است

(رباعیات)

গুইয়ান্দ্ কাসা'ন্ কে বেহেশ্ত্ বা' হুর্ খোশ্ আস্ত্
মান্ মী গুইয়াম্ আ'বে আঙ্গূর্ খোশ্আস্ত্
ঈন্ নাগ্দ্ বেগীরো দাস্ত্ আয্ নাসিয়ে মাদা'র্
কে আ'ওয়া'জে দোহ্ল্ শেনীদান্ আয্ দূর্ খোশ্ আস্ত্

নজরুলের অনুবাদ:

করছে ওরা প্রচার-পাবি স্বর্গে গিয়ে হুর-পরী
আমার স্বর্গ এই মদিরা, হাতের কাছের সুন্দরী
নগদা যা পাস তাই ধরে থাক, ধারের পণ্য করিসনে,
দূরের বাদ্য মধুর শোনায়, শূণ্য হাওয়ার সঞ্চারি।

ইরানের বিশ্ববিখ্যাত সুফিকবি মৌলানা জালালুদ্দিন রুমির বিখ্যাত গ্রন্থ *মসনভি* শরিফের শুরুর অংশটি:

بشنو از نی چون حکایت می کند
از جداییها شکایت می کند

(مثنوی، جلد اول، مقدمه)

বেশ্নু আয্ নেই চূন্ হেকা'ইয়াত্ মী কোনাদ্
আয্ জোদা'ঈহা' শেকা'ইয়াত্ মী কোনাদ্

কবি নজরুল অনুবাদ করেন 'বাঁশির ব্যথা' শিরোনামে এভাবে :

শোন দেখি মন বাঁশের বাঁশির বুক জেগে কী উঠবে সুর,
সুর তো নয় ও কাঁদবে যে রে বাঁশরি বিচ্ছেদ বিধুর।

কিন্তু রুমির দর্শনে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ নজরুল তাঁর খুব বেশি কবিতা অনুবাদ করেননি, যেমনটি করেছেন ইরানের প্রেমিক কবি হাফিজের কবিতার। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নজরুল সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিলেন হাফিজের দ্বারাই। ইরানের এ অনন্য কবির বহু গজল যেমন তিনি অনুবাদ করেছেন, তেমনি প্রায় ৭৩টি রুবায়ি বা চতুস্পদী কবিতাও সরাসরি মূল ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বলে নজরুল নিজেই উল্লেখ করেছেন। হাফিজকে গভীরভাবে অধ্যয়নের ফলে নজরুল বাংলার ভাষা-শক্তি, ভাষা-চরিত্র এবং ভাষা-মেজাজের স্টাইল বা ভঙ্গিকে আমূল বদলে দিতে পেরেছিলেন। এর প্রমাণ মেলে নজরুলকৃত হাফিজের ফারসি কাব্য-ছন্দের হুবহু অনুকরণে অনূদিত কয়েকটি গজলের পঙ্ক্তি থেকে। যেমন :

হাফিজের গজল :

الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

(دیوان حافظ، شمارهٔ غزل: ۱)

আলা' ইয়া' আইয়্যুহাস্ সা'ক্বী আদের্ কা-সান্ ওয়া' না'ভেল্হা'
কে এশ্কু আ'সা'ন্ নেমুদ্ আওয়াল্ ওয়ালী ওফ্তা'দ্ মোশকেল্হা'

সুনিপুণ দক্ষতায় নজরুল এ গজলটিকে ঠিক একই ছন্দে বাংলায় অনুবাদ করেন নিম্নলিখিতভাবে :

হ্যাঁ, এয় সাকি, শরাব ভর লাও, বোলাও পেয়ালী চালাও হরদম
প্রথম প্রেম পথ সহজ সুন্দর, শেষের দিক তার ঢালাও কর্দম!

এছাড়া কবি হাফিজের বিখ্যাত গজল :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا
بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارارا

(دیوان حافظ، شمارهٔ غزل: ۲)

আগার্ অ'ন্ তোর্কে শীরা'যী বেদাস্ত অ'রাদ্ দেলে মা'রা'
বেখা'লে হিন্দুইয়াশ্ বাখ্শাম্ সামার্কান্দো বোখা'রা'রা'

ফারসি ছন্দের পুরোপুরি অনুসরণ করলেও তাঁর বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে অর্থের কোনো ব্যত্যয়ই এতে ঘটেনি। উদাহরণত নজরুলের অনুবাদ :

যদিই কান্তা শিরাজ সজনি ফেরত দেয় মোর চোরাই দিল ফের
সমরকন্দ আর বোখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিলটের।

এভাবে নজরুল কেবল ফারসি কবিতার অনুবাদ দ্বারাই নয়, বরং ফারসি কবিতার ছন্দকেও চমৎকার মুন্সিয়ানার সাথে বাংলা কবিতার জগতে সংযোজন করে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেছেন।

এছাড়া তিনি কবি হাফিজ ও বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ যে গযলটি বিদ্যমান, সে গযলটিরও দুটি লাইন অত্যন্ত সফলতার সাথে চমৎকার কাব্যানুবাদ করেছেন, যার মধ্যে বিখ্যাত পঙ্ক্তিটি হচ্ছে :

হাফিজ :

شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود
(دیوان حافظ، شمارهٔ غزل: ۲۲۳)

শেকার্ শেকান্ শাভান্দ্হামে তুতীয়া'নে হেন্দ্
যিন্ গান্দে ফার্সি কে বে বাঙ্গা'লে মী রাভাদ্

নজরুল :

আজকে পাঠাই বাংলায় যে ইরানের এই ইক্ষুশাখা
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টি মাখা।

নজরুল দৃশ্যত রুমি, হাফিজ ও খৈয়াম– এই তিন ইরানি কবির রচনা অনুবাদ করলেও এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কেবল এদের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত ছিলেন; বরং তিনি গোটা ফারসি সাহিত্য দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি যেমন শেখ সাদি'র নৈতিকতা ও মানবতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তেমনি ফেরদৌসির বীররসও আস্বাদন করেছিলেন। তিনি শেখ সাদির বিখ্যাত নাত 'বালাগাল উলা বিকামালিহী' অবলম্বনে রচনা করেছিলেন নাতে রাসুল :

কূল মাখলুক গাহে হযরত বালাগাল উলা বেকামালিহী
আঁধার ধরায় এলে আফতাব কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী

এছাড়া নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাসহ বীররস সমৃদ্ধ কবিতাগুলি আমাদের ফেরদৌসির 'শাহনামা'র কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, নজরুল ইরান, ফারসি ভাষা ও ফারসি সাহিত্যের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত ছিলেন। কবির এমন একটি গান বিদ্যমান রয়েছে, যেটিতে তিনি সরাসরি কয়েকটি ফারসি ছন্দের উল্লেখ করেছেন। গানটির প্রথম পঙ্‌ক্তি হলো :

মোফাআলতুন মোফাআলতুন, মোফাআলতুন মোফাআলতুন
কানের তার তুল দোদুল দুল, কোথায় তার তুল কোথায় তার তুল

ফারসি সুরের উপরেও কবি বেশ কিছু গান লিখেছেন। এর মধ্যে 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে' এবং নাতে রাসুল 'ত্রিভূবনের প্রিয় মোহাম্মাদ এলরে দুনিয়ায়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর রচনায় ফারসি শব্দের দেদার ব্যবহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি এটি করেছেন অবলীলায় এবং স্বভাবগতভাবেই। কারণ তাঁর জন্মস্থান চুরুলিয়ার মাতৃভাষা বাংলার রূপটি ছিল এমনই ফারসি-উর্দু মিশ্রিত। তাই তাঁর পক্ষে এমন সব ফারসি শব্দের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে ঘটানো সম্ভব হয়েছে, যা সেই সময়কার সাধারণ লোকজন তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় ব্যবহার করত। সত্যিকারার্থেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সেসব শব্দের ব্যবহার ছিল অভূতপূর্ব। তাঁর ব্যবহৃত এ ধরনের কিছু ফারসি শব্দ নিম্নরূপ :

খোদা, নামাজ, রোজা, জায়নামাজ, আসমান, জমিন, বেহেশত, দোজখ, আমদানি, আরাম, আহাজারি, ঈদগাহ, একদম, কম, কমজাত, কমজোর, কমবখত, কামান, কিশতি, খঞ্জর, খাক, খাজা, খামোশ, খাঞ্চা, খোশ আমদেদ, খোশখবর, খোশনসিব...।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজার

এমন অসংখ্য ফারসি শব্দ নজরুল অত্যন্ত সফলতার সাথে নিজ সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করেছেন, যা মূলত বাংলা সাহিত্যকেই করেছে সমৃদ্ধ এবং তেজোদ্দীপ্ত। তাঁর এ অবদান অবিস্মরণীয়। আর এ কারণেই নজরুল বাংলা সাহত্যে চির-অম্লান, চির-ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

লেখক : নজরুল গবেষক এবং সহকারী অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সহায়ক গ্রন্থ

১. নজরুল রচনাবলী- রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
২. নজরুল সাহিত্য বিচার- শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩. নজরুল সাহিত্যে ফারসি ভাষার প্রভাব- রাশেদুল হাসান শেলী এবং মাহবুব বারী সম্পাদিত, নজরুল গবষেণা ও লোকসংস্কৃতি ইনস্টিটিউট, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
৪. নজরুলের কাব্যানুবাদ- নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৫. যুগ স্রষ্টা নজরুল- খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, আলহামরা প্রকাশনী, ঢাকা।
৬. রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম- কাজী নজরুল ইসলাম, মোহন লাইব্রেরি, কলিকাতা।
৭. دیوان حافظ، شمس الدین محمد حافظ، انتشارات کتاب آبان، تهران
৮. رباعیات عمر خیام، حکیم عمر خیام نیشابوری، امیر کبیر، تهران
৯. مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین محمد، کتابخانهٔ ملی ایران، تهران

শেখ সাদির কবিতার চিরন্তন আবেদন

ড. মোঃ কামাল উদ্দিন

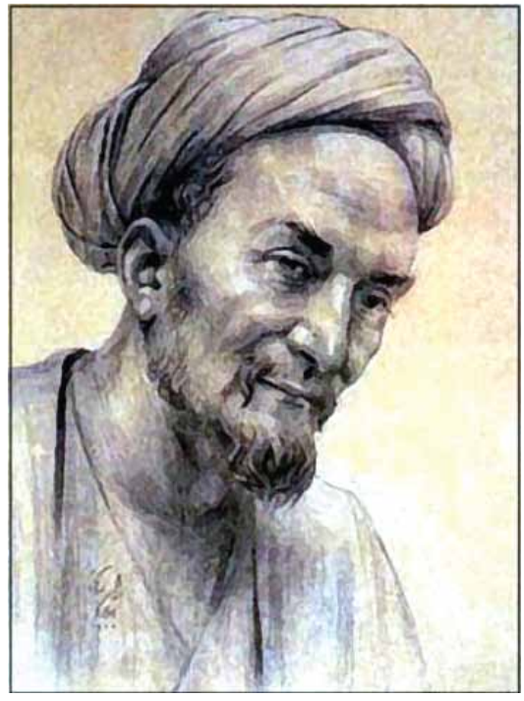

ফারসি সাহিত্যগগণের প্রোজ্জ্বল দিকপাল কবি শেখ সাদি। তার *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। শাসকশ্রেণি থেকে সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের বাস্তব রূপ চিত্রায়িত হয় তার কবিতায়। কাব্যরস উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিশীলিত ও উন্নত জীবনের বার্তাবহ। কুরআন, হাদিস, ইসলামি ঐতিহ্য, সমাজবিজ্ঞান, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাকার বিষয় তাঁর সাহিত্যমানকে করে মহিমান্বিত। মানবিকতার মর্মবাণী ঝংকৃত হয় কবিতার পরতে পরতে। মনন ও বাস্তব জীবনে মানুষের কাঙ্ক্ষিত বাসনার প্রতিফলিত রূপ সাদির কবিতা। দৈশিক, ভাষিক ও কালিক সীমা-পরিসীমার উর্ধ্বে উঠে মানবতার মৌলিক ভাবসম্মিলনে সাদির কবিতার আবেদন চিরন্তন ও অমর। মহাকালের উজ্জ্বল শিল্পনিদর্শন। অমর নান্দনিক রত্নভাণ্ডার সৃষ্টির মাধ্যমে কবি বেঁচে আছেন মানবমনে যুগ যুগান্তরে।

সাহিত্যাকাশের এই মহান জ্যোতিষ্কের পূর্ণ নাম মোশাররাফ উদ্দিন মোসলেহ বিন সাদি শিরাজি। ১২০৯ সালে ইরানের ফারস প্রদেশের শিরাজ নগরে তাঁর জন্ম। সম্ভ্রান্ত পারিবারিক পরিবেশেই লেখাপড়ার হাতেখড়ি। শিরাজেই প্রাথমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি। সমকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আকাইদ, যুক্তিবিদ্যা, গ্রীকদর্শনে হয়ে ওঠেন পারঙ্গম। তাঁর বিখ্যাত শিক্ষাগুরু হলেন জামাল উদ্দিন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান জাওজি ও শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি। শৈশবকাল থেকে প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন কবি শেখ সাদি। সাহিত্যকর্মে যার নিদর্শন দীপ্যমান।

ভ্রমণপিপাসু এই মহান কবি পৃথিবীর নানা জনপদে বৈচিত্র্যময় মানুষের সান্নিধ্যে উপনীত হন। সমকালীন যুগজিজ্ঞাসার কৌতুহল নিবৃত হয় কাব্যরসের আস্বাদনের মাধ্যমে। এমনকি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জুলুম-নির্যাতন, মানবাধিকারের প্রতিফলন ঘটে কবিতায়। মূলত শেখ সাদির জীবন তিন ভাগে বিভাজ্য– অধ্যয়নকাল, ভ্রমণকাল ও শিরাজে প্রত্যাবর্তন। ১২২৬ থেকে ১২৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যাপৃত তাঁর বর্ণাঢ্য ভ্রমণজীবন। এশিয়া, তুরস্ক, বলখ, আরব, সিরিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল, ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও গুজরাট ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন দেশ ও জাতির কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা, উত্থান-পতন, সমাজ, ধর্ম, রীতিনীতিসমৃক্ত অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করে ১২৫৬ সালে প্রিয় স্বদেশভূমি ইরানের শিরাজে প্রত্যাবর্তন করেন। মধ্যযুগের বিশ্বপর্যটকের মধ্যে ইবনে বতুতার পরই তাঁর স্থান। সমকালীন ইরানের শাসক আবু বকর বিন সাদ জাঙ্গি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট। সাদি সাহিত্যচর্চায় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁরই প্রশংসায় রচিত হয় অসংখ্য কাসিদা বা প্রশস্তিমূলক কবিতা। ১২৯১ সালে তিনি এই ধরণীর মায়া ত্যাগ করে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপনীত হন। শিরাজ শহরের সাদিয়া নামক স্থানে খানকার পাশেই তিনি সমাহিত হন।

যেসব মনীষীর প্রদীপ্ত আলোচ্ছটায় ফারসি সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত কবি শেখ সাদি তাঁদের শীর্ষে। পদ্য ও গদ্য উভয় শাখায় তাঁর সফল চাষবাষ। প্রকৃতপক্ষে সুন্দর, পরিশীলিত, শান্তিময় পৃথিবী গড়ার গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়। ক্লাসিক সাহিত্যে বিশেষ শ্রেণির প্রাধান্য থাকলেও শেখ সাদির কবিতায় রাজা-বাদশাহ থেকে সাধারণের মনোলোকের সুপ্ত অনুভূতির চিত্রায়ণ ঘটে। কবিতার আবেদন সর্বজনীন। 'বুস্তান' ও 'গুলিস্তান' তাঁর অনবদ্য শিল্পকর্ম। 'বুস্তান' বা সাদিনামা কাব্যগ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি ও ন্যায়বিচার, দয়া-অনুগ্রহ, প্রেম-ভালোবাসা, বিনয়-নম্রতা, সম্মতি, সন্তোষ বা তৃপ্তি, প্রশিক্ষণ, সুস্থতায় কৃতজ্ঞতা, অনুতাপ ও সঠিক পথ এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা। ১২৫৭ সালে রচিত গ্রন্থটি সমকালীন শাসক সাদ বিন আবি বকর বিন সাদ জাঙ্গির নামে উৎসর্গীকৃত। রাষ্ট্রপরিচালনাবিধি, ন্যায়বিচার, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-ভালোবাসা, বিনয়-নম্রতা, সন্তোষলাভ, প্রশিক্ষণ, কৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা এর প্রতিপাদ্য। রূপক, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, শিল্পরূপের সমাহারে এক প্রাতিস্বিক সৃষ্টিকর্ম 'বুস্তানে সাদি'। সহজ, সরল ভাষায় রচিত এ গ্রন্থের আবেদন সর্বজনীন। ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবনগাথা, দর্শন, কাব্যরস, মূল্যবোধের এ অপরূপ সৃষ্টি। শেখ সাদির 'বুস্তান' মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের ভাবসম্মিলনে এক অপরূপ সৃষ্টি। প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক ই জি ব্রাউনের মতে,

> When Sa'di is described (as he often is) as essentially an ethical poet, it must be borne in mind that, correct as this view in a certain sense undoubtedly is, his ethics are somewhat different from the theories commonly professed in Western Europe.[1]

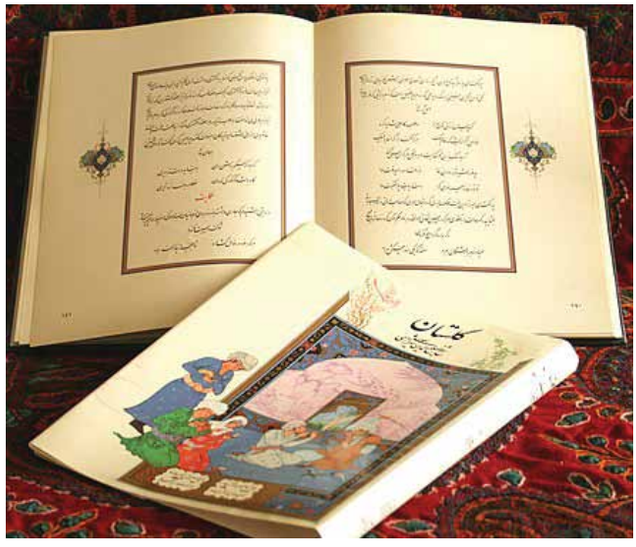

শেখ সাদির অপর এক বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুলিস্তান' রচিত হয় ১২৫৮ সালে। গদ্য ও পদ্যে রচিত গুলিস্তানে রাজচরিত্র, সন্তোষের মূল্য, নীরবতার উপকারিতা, প্রেম ও যৌবন, দুর্বলতা ও বার্ধক্য, শিক্ষার গুণ ও কথাবার্তার শিষ্টাচারিতা ইত্যাকার বিষয় স্থান লাভ করেছে। 'গুলিস্তান'-এর স্বাতন্ত্র্য হলো এর প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে কাহিনী বা গল্পের অবতারণা এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে কবিতার মাধ্যমে। সাহিত্যচর্চায় গদ্য ও পদ্যের অপরূপ সম্মিলন ফারসি সাহিত্যে দুর্লভ।

'কুল্লিয়াতে সাদি' তাঁর বহুমাত্রিক কবিতাসংকলন। কাসিদা, গজল, কেতআ, তারজিবান্দ, রুবাই, মাকালাত ও আরবি কাসিদার সমাহার। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, হাস্যরস ও কৌতুকপ্রিয়তা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, আবেগময় অভিব্যক্তি ও মানবপ্রেম তাকে পাঠকপ্রিয় করে তোলে। আল্লাহর প্রশংসা, রাসূল (সা.)-এর শানে নাত, বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের উপদেশ বাণী, শোকগাথা, শাসকশ্রেণির প্রশংসা এবং হালাকু খানের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ, আরবি ছন্দের আলোকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা তাঁর কবিতাকে করেছে ঋদ্ধ। ফারসি ও আরবি ভাষার সম্মিলন কবিতার এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য।

কবিরা সত্য, সুন্দর, ন্যায়ের প্রতীক। নান্দনিক রসাস্বদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জীবনবোধের নিপুণ শিল্পী। এ ধারায় শেখ সাদি বিশ্বসাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীসত্তা। তিনি রাজা-বাদশাহ থেকে সর্বস্তরের মানুষের জীবনকে সুন্দরের দিক অনুপ্রাণিত করেন। রাষ্ট্র, সমাজ, মূল্যবোধসহ নান্দনিকতার অপূর্ব সম্মিলন তাঁর কবিতা। মানুষের যাপিত জীবনের চিত্রায়ণ, সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ, রাজা-প্রজার মৌল শিক্ষণীয় দিকগুলোর স্বরূপ উন্মোচিত হয় তাঁর কবিতায়। 'বুস্তানে সাদি'র সূচনা হয় মহান আল্লাহর প্রশংসাবাণীর মধ্য দিয়ে–

بنام خداوند جان آفرین　　حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشندهء دستگیر　　کریم خطا بخش پوزش پذیر [১]

'প্রাণের স্রষ্টা আল্লাহর নামে শুরু
তিনি মহাজ্ঞানী, মুখে ভাষা সৃষ্টিকারী।
আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও সাহায্যকারী
দয়ালু এবং অপরাধীর গুণাহ মার্জনাকারী।'

রাসূলের (সা.) প্রশস্তিগাথা ইরানি কবিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। শেখ সাদিও এর ব্যতিক্রম নন। রাসূলের জীবনাদর্শনের শ্রেষ্ঠতম নমুনার পরিচয় মেলে তাঁর কবিতায়। রাসূলের শানে তাঁর রচিত নাত যুগ যুগ ধরে ইসলামি ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সমাদৃত হয়ে এসেছে–

بلغ العلی بکماله　　کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله　　صلوا علیه و آله [২]

'চারিত্রিক মাধুর্যে সম্মানের উঁচুতে আসীন তিনি
স্বভাব ও সৌন্দর্যের দ্যুতিতে বিদূরিত হয় অন্ধকার।
তাঁর উন্নত গুণাবলি শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ শিখরে
তাঁর প্রতি দরুদ পড় এবং পরিবারের জন্য রহমত কামনা কর।'

মানবিক মূল্যবোধের নির্যাসে পূর্ণ শেখ সাদির কবিতা। সমাজ সংশোধনের ক্ষমতা যাঁদের হাতে নিবদ্ধ সেই শাসকেরা যেন মানুষের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হন। অন্যায়কে প্রতিরোধ করেন। তাতেই নিহিত ধরণীর অধিবাসীদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। তাঁর কবিতা শাসকশ্রেণিকে দায়িত্বানুগ হওয়ার প্রেরণা জোগায়। বিশ্বচরাচরে মানবিকতা ও সভ্যতার উৎকর্ষে শেখ সাদির কবিতা–

اگر جادهء بایدت مستقیم　　ره پارسایان امید ست و بیم
طبیعت شود مرد را بخردی　　بامید نیکی و بیم بدی
گرین هردو در پادشاه یافتی　　در اقلیم و ملکش پنه یافتی
که بخشایش آرد بر امیدوار　　بامید بخشایش کردگار [৩]

'যদি সরল সঠিক পথ নিশ্চিত করতে চাও
পরহেজগারগণের পথেই রয়েছে প্রত্যাশা ও ভয়।
জ্ঞানীদের জন্য এটাই স্বাভাবিক
কল্যাণের প্রত্যাশা ও মন্দের ভয়।
এ দুটি মহৎ গুণ বাদশাহের মধ্যে প্রত্যক্ষ হলে
দেশে-মহাদেশে কল্যাণের আধার হবে।
কেননা, আশাবাদীর জন্য রয়েছে তাঁর ক্ষমা
মহান স্রষ্টার ক্ষমার প্রত্যাশী হওয়ার তরে।'

এ পৃথিবীর সব মানুষের সৃষ্টিমূল একই উপাদান। আবার প্রত্যাবর্তনস্থলও একই। গর্ব ও অহংকার প্রদর্শনের মৌলিক কোনো উপাদান তার নেই। ওপারে সবাই সম্মুখীন হবে এপারের হিসেবে-নিকেশে। তাই শেখ সাদি জীবনকে পরিশীলিত ও বিনয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করেন–

زخاک آفریدت خداوند پاک
پس ای بنده افتادگی کن چو خاک
حریص و جهان سوز و سرکش مباش
چو گردن کشید آتش هولناک [৪]

'মাটি থেকে মহান আল্লাহ তোমাকে তৈরি করেন
বিনয়ী হও তুমি মাটির এ ধরণীতে।
লোভী, বিধ্বংসী ও অত্যাচারী হয়ো না তুমি
যেন ভয়াবহ আগুন মাথা গুটিয়ে নেয়।'

মানুষে মানুষে নেই কোনো ভেদাভেদ। সৃষ্টিমূলে সবাই একই উপাদান থেকে তৈরি। রাজা-প্রজার স্থায়ী বাসস্থান একই মাটির নিচে। ক্ষণস্থায়ী এ ধরণীতলে গৌরব-অংহারের কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী সেই যে নিজেকে পরমস্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে তোলেন। এ পার্থিব জীবনযাত্রা সম্পর্কে শেখ সাদি বলেন–

جهان، ای برادر، نماند به کس
دل اندر جهان آفرین بند و بس

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

چو آهنگ رفتن کند جان پاک
چه بر تخت مردن، چه بر روی خاک[৩]

‘পৃথিবী কারো চরস্থায়ী আবাস নয়
স্রষ্টার সাথে হৃদয়কে আবদ্ধ করো।
পৃথিবী রাজত্বের লোভে হীন আচরণ করো না
তোমার মতো অনেকেই লালিত ও নিঃশেষ হয়ে গেছে
যখন পবিত্র প্রাণপাখি চলে যাবার সুর তোলে
সিংহাসনে অথবা মাটির ধূলিতে মৃত্যুতে কিইবা যায় আসে।’

মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাদের সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। সৌজন্য-শিষ্টাচার পরিশীলিত মনসিকতার পরিচায়ক। সংস্কৃতিবান মানুষের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ সবই উন্নত হয়। সমাজের বহুমাত্রিক দিকগুলো উন্নত হয়। পারস্পরিক সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের বিভিন্ন দিকও ফুটে ওঠে শেখ সাদির কবিতায়–

سخن ر سر است ای خردمند و بن میاور سخن در میان سخن
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش نگوید سخن تا نبیند خموش[৬]

‘বক্তব্য রহস্যময় হে জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ
অপরের কথার মাঝে বলো না কোনো কথা।
সভ্য, সংস্কৃতিবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তি
নীরবতা না দেখলে কথা বলে না কখনো।’

মানবতার মূলমন্ত্র সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এক আদমসন্তান। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে একজন মানুষ ব্যথিত হলে তার দুঃখে সবার পীড়িত হওয়া উচিত। এতেই নিহিত মানবতার মহান পরিচয়। যদি অপরের ব্যথায় হৃদয় কেঁপে না ওঠে তাহলে মনুষত্বের মর্যাদা হীন হয়ে যায়। পৃথিবী সব মানুষকে একই বন্ধনে বেঁধে কবি সাম্য, শান্তি ও সুখের পৃথিবী গড়ার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন–

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی[৭]

‘আদমসন্তান একে অপরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
সৃষ্টি হয়েছে মূলত একই মূল উৎস থেকে।
যদি একটি অঙ্গ কালের ঘূর্ণিতে হয় ব্যথিত
অপর অঙ্গের থাকে না কোনো প্রশস্তি।
তুমি যে অপরের দুঃখ-কষ্টে নির্বিকার
মানুষ নামের ভূষণ থাকতে পারে না তোমার।’

মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ মানবজীবনকে উন্নত করে। লোভ-লালসা, ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। পৃথিবীতে মানুষ যা অর্জন করে তার যৎসামান্যই ভোগ করতে পারে। তবু বৈষয়িক প্রভাব-প্রতিপত্তির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি মানুষ পার্থিব প্রভাব, কর্তৃত্ব, সম্পদের পাহাড় গড়তে অন্যায় পথ বেছে নিতেও কুণ্ঠিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে আত্মিক প্রশান্তি ও উন্নত জীবন প্রাপ্তসম্পদে সন্তুষ্ট থাকার ওপরই নির্ভরশীল। অসম, অন্যায় প্রতিযোগিতা মানুষকে মৃত্যু অবধি ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে নিয়ে চলে। অথচ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে এসবই মূল্যহীন হয়ে যায়। কোনোকিছুই তার বিন্দুমাত্র কাজে আসে না। অল্পে তুষ্টি ও প্রতিকূলতায় ধৈর্য মানুষের জীবনকে সুন্দর, সত্য, কল্যাণের পথে ধাবিত করে। কবির ভাষায়–

ای قناعت توانگرم گردان
که ورائ تو هیچ نعمت نیست

کنج صبر اختیار لقمان است
هرکرا صبر نیست حکمت نیست.[৮]

‘ওহে অল্পে তুষ্ট অবলম্বনকারী গতিশীল প্রাণ
তোমার মতো নেয়ামতের ধারক কেউ নেই এ ধরণীতে।
ধৈর্য অবলম্বন লোকমানেরই (আ.) শিক্ষার প্রতিফলন
ধৈর্য নেই যার; প্রজ্ঞার সন্ধানও মিলবে না তার।’

জীবনের এক আনন্দময় রূপ প্রেম। এ সৃষ্টিজগতের মূলে রয়েছে প্রেমেরই অনুভূতি। প্রেমেই ভাঙা, প্রেমেই গড়া। ঐশী প্রেমের বহ্নিশিখা মানবমনে এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। প্রতিনিয়ত তাকে পরমাত্মার সান্নিধ্যে উপনীত হবার দিকে তাড়িত করে। বৈষয়িক প্রেম-ভালোবাসাও জীবনকে মহিমান্বিত করে। নর-নারীর পূতঃপবিত্র প্রেম স্রষ্টারই এক বিশেষ নিদর্শন। ভালোবাসার পরশে মানুষ অসাধ্যকে সহজ করে তোলে। কাঁটাযুক্ত পথপরিক্রমাও পুষ্পকাননে পরিণত হয়। যুগে যুগের ভালোবাসার পরীক্ষায় মানুষ জীবন বিসর্জন দিতেও এতটুকু পিছপা হয়নি। সৃষ্টির প্রেরণামূলে রয়েছে প্রেম। প্রেম-ভালোবাসাহীন জীবন যেন মরীচিকায় বিচরণ। কোনো নান্দনিক দিকও তার কাছে সুন্দর রূপে ধরা দেয় না। শেখ সাদিও তাঁর কবিতায় প্রেমের ঐশ্বর্য তুলে ধরেন এভাবে–

کسی بدیدهٔانکار گر نگاه کند
نشان صورت یوسف دهد بناخوبی

و گر بچشم ارادت نگه کند در دیو
فرشته اش بنماید بچشم محبوبی.[৯]

‘কেউ যদি ভালোবাসাহীন হৃদয়ে কারো পানে তাকায়
ইউসুফের সৌন্দর্যময় অবয়বও তার কাছে অনুজ্জ্বল মনে হবে।
আর যদি কেউ প্রেমের মননে দৈত্য-দানবের প্রতি দৃষ্টি দেয়
প্রেমিকের চোখে তাকেও ফেরেশতার মতো মনে হবে।’

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এদের মাঝেও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয় জ্ঞানের মানদণ্ডে। যে যত বেশি জ্ঞানী তার মর্যাদাও তত উন্নত। জ্ঞানই শক্তির মূল। জ্ঞান রাজা-বাদশাদের অলংকার। জ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধির মূল হাতিয়ার। সাধারণ মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলে নেতৃত্বের মর্যাদায় আসীন। আবার রাজপুত্রও জ্ঞানের শক্তির অভাবে পরিণত হয় সাধারণ মানুষে। ইরানের জাতীয় কবি ফেরদৌসি থেকে শুরু করে প্রায় সব ফারসি কবিই জ্ঞানকে সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান হিসেবে আখ্যা দেন। বর্তমান বিশ্বেও তথ্য-প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জাতির হাতের মুঠোয় সমগ্র পৃথিবী। যুগে যুগে জ্ঞানই মানুষের মর্যাদার নির্ণায়ক। শেখ সাদির কবিতায় রয়েছে সর্বজনীন সত্যের মূল প্রেরণা। জীবনকে গতিশীল, প্রাণময়, মর্যাদাবান করতে তাঁর কবিতা এক বিশেষ ভাবরসে পূর্ণ। কবির ভাষায়–

روستازادگان دانشمند　　بوزیری پادشاه رفتند
پسران وزیر ناقس عقل　　بگدائی بروستا رفتند.[১০]

‘গ্রাম থেকে আসা জ্ঞানীরা
বাদশাহর মন্ত্রীর মর্যাদায় আসীন।
মন্ত্রীর জ্ঞানহীন সন্তানেরা
গ্রামের সাধারণ মানুষে পরিণত।’

মানবজীবনে প্রকৃত শিক্ষা ও উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। প্রতিটি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্বীয় প্রতিভা নিয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। সঠিক শিক্ষা ও পরিচর্যায় কেউ হয় উন্নত চরিত্রবান আবার কেউ বিপথগামী। মৌলিক মানবিক গুণাবলির সমাহার জীবনকে পরিশীলিত ও সুন্দর করে তোলে। সঠিক শিক্ষা ও পরিবেশের অভাবে বেড়ে ওঠা সন্তান সমাজকেও করে কলুষিত। তাই শিশুর যথাযথ প্রতিপালন পিতামাতাসহ সংশ্লিষ্ট সবারই অপরিহার্য কর্তব্য। যথাসময়ে পরিচর্যার অভাবে এই প্রতিভাময় মানুষগুলোও কালের বিবর্তনে হারিয়ে যায় গহীন অন্ধকারে। আলোকিত জীবনের পথ থেকে তারা হয় বঞ্চিত। কবি শিশুকাল থেকেই তাদের পরিচর্যা ও যথাযথ শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন–

چوبِ تر را چنانکه خواهی پیچ
نشود خشک جز بآتش راست[১১]

‘কাঁচা কাঠকে যেভাবে খুশি করতে পারবে বাঁকা
শুকিয়ে গেলে তা আগুনের তাপ ছাড়া হবে না কখনো সোজা।’

ফারসি কবি শেখ সাদির কবিতা মানুষের মননকে পরিশীলিত ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। দৈশিক, কালিক ও ভৌগোলিক সীমাপরিসীমা পেরিয়ে জীবনকে সভ্য, উন্নত করে তোলে। জীবনবোধ, দর্শন, মূল্যবোধ, নান্দনিকতার অপূর্ব সম্মিলনে তাঁর কবিতা জীবনকে সত্য ও নান্দনিকতায় পূর্ণ করে দেয়। মানবজীবনে তাঁর কবিতার বাহ্যিক ও অন্তর্লোকের প্রেরণা সুদূরপ্রসারী। কবিতার ভাব-বিষয় ও শৈল্পিক নান্দনিকতা সভ্যতার উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। শেখ সাদিও স্বীয় শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন মহাকালের ঘূর্ণিপাকে।

লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যসূত্র

১ E.G. Broun, *A Literery History of Persia*, vol.2 (Cambridge: At the University press, 1969), p. 526.
২ শেখ সাদি, *বুস্তানে সাদি*, ড. খলিল খতিব রাহবার (সম্পা.)(তেহরান : এন্তেশারাতে সুফি আলি, ২০০০), পৃ. ১।
৩ শেখ সাদি, *গুলিস্তানে সাদি*, গোলাম হোসাইন ইউসুফি (সম্পা.) (তেহরান : এন্তেশারাতে খাওয়ারিজমি, ১৯৯৮), পৃ. ৫০।
৪ *বুস্তানে সাদি*, পৃ. ৪৯।
৫ তদেব, পৃ. ১৯৫।
৬ *গুলিস্তানে সাদি*, পৃ. ৫৯।
৭ তদেব, পৃ. ১৩০
৮ তদেব, পৃ. ৬৬।
৯ *গুলিস্তানে সাদি*, পৃ. ১৩৯।
১০ *তদেব*, পৃ. ১৪৬।
১১ *তদেব*, পৃ. ১৮৪।
১২ *তদেব*, পৃ. ১৮৫।

ফরিদ উদ্দিন আত্তার : ফারসি সাহিত্যে অধ্যাত্মচিন্তার আত্মা

ড. আবদুস সবুর খান

ফারসি সাহিত্যে আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটে একাদশ শতকের গোড়ার দিকে, সালজুকি রাজবংশের (শাসনকাল ১০৩৭–১১৫৭ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে। ইতঃপূর্বে ফারসি সাহিত্যে যা ছিল অনুপস্থিত। পারস্যে সালজুকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক, সামরিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে তদানীন্তন মুসলিমবিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। মূলত তাঁরা ইসলামের চারশ বছরের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ উত্তরসূরির ভূমিকা পালন করেন। সালজুকি সম্রাটদের প্রায় সবাই, বিশেষ করে মালিক শাহ্ এবং সানজার নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা ফারসি সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বলা যায়, একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে ইসলামি সভ্যতা এক নতুন যুগে পদার্পণ করে। কারণ, সালজুকি সম্রাটগণের সহযোগিতায় এক দিকে যেমন এই যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় অপর দিকে এই যুগে মুসলিমবিশ্বে সুফিবাদ বা অধ্যাত্মবাদের মতো বেশ কিছু চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। বিশেষ করে ফারসি কাব্যসাহিত্যে সুফি বা আধ্যাত্মিক ধারার প্রবর্তন ঘটে; সালজুকি যুগের পূর্বে, অর্থাৎ সামানি (শাসনকাল ৮৭৪–১০০৪) এবং গাজনাভি (শাসনকাল ৯৭৫–১১৮৭) যুগে ফারসি কাব্যে যে ধারা ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সামানি ও গাজনাভি শাসনামলের কবিগণ ছিলেন সম্রাট-শাহজাদা, উজির-আমির-পারিষদের স্তুতি এবং প্রকৃতি বন্দনায় নিমগ্ন। তাঁদের প্রেমাস্পদ প্রকৃত প্রেমাস্পদ ছিল না, ছিল পার্থিব প্রেমাস্পদ। কিন্তু সালজুকি যুগে ফারসিকাব্যে সুফিবাদী ধারার আবির্ভাব ঘটে, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রকৃত পেমাস্পদ একক স্রষ্টার প্রেম ও করুণা উপলব্ধি এবং তাঁরই বন্দনা করা। তাই এই যুগের সুফি কবিগণ সামানি ও গাজনভি যুগের কবিদের মতো বাদশা-শাহজাদা, উজির-ওমারা এবং দরবারিদের ন্যায় পার্থিব প্রেমাস্পদের বন্দনা না করে আত্মোন্মোচন, আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-অধ্যয়নের মতো সঠিক পন্থার মাধ্যমে কাশ্‌ফ এবং শুহুদে পৌঁছতে সচেষ্ট হন। এই সাধনার মাধ্যমে তাঁরা স্বীয় আত্মাকে নশ্বর এই পৃথিবীর পঙ্কিলতা মুক্ত করে অপার্থিব স্রষ্টার একত্বের সান্নিধ্যে পৌঁছে স্বীয় সত্তা ও কালব-আয়নাকে এতটাই পরিষ্কার করে তুলেন যে, তাতে স্রষ্টার প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করতে পারা যায় এবং মারেফাতের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের চিন্তা, কথা এবং আচরণ হয়ে ওঠে প্রকৃত সত্য ও সত্তার প্রকাশস্থল। আর তাঁদের এই আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে মানবজগৎও প্রকৃত একক প্রেমাস্পদকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। বাবা তাহের হামেদানি (১০০০–১০৮৫) আবু সাইদ আবিল খায়ের (৯৬৭–১০৪৮), খাজা আব্দুল্লাহ্ আনসারি (১০০৬–১০৮৮), সানায়ি (১০৭৯–১১৫১), ফরিদ উদ্দিন আত্তার (১১৪৩–১২৩০) প্রমুখ ছিলেন এই যুগের বিখ্যাত সুফি কবি, যাঁরা অধ্যাত্মবাদের এই চিন্তা-দর্শনকে কবিতার শ্রেষ্ঠতর সৌন্দর্যের আভরণে সাজিয়ে সরল ও সাবলীল বক্তব্যে সাধারণের জন্য সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন।

যদিও বাবা তাহের হামেদানি এবং আবু সাইদ আবিল খায়েরের মাধ্যমেই ফারসি কাব্যে আধ্যাত্মিক দর্শনের আগমন ঘটে তবে ফারসি সাহিত্যে অধ্যাত্মচিন্তার আত্মা খ্যাত ফরিদ উদ্দিন আত্তারের মাধ্যমেই এই দর্শন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। ফরিদ উদ্দিন আবু হামেদ মোহাম্মদ আত্তার নিশাপুরি ইরানিদের কাছে শেখ আত্তার নিশাপুরি নামেই সমধিক খ্যাত। ভারতবর্ষে তিনি শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার নামে পরিচিত। আত্তারের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে সবিস্তার তথ্যাবলি তেমন পাওয়া যায় না। তাঁর জীবন-ইতিহাস সম্পর্কেও এই যুগের অধিকাংশ সুফি কবি এবং সাধকদের জীবনের ন্যায় নানা কিংবদন্তি ও কাহিনী প্রচলিত। এমনকি তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ নিয়েও জীবনীকারদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইরানের বিখ্যাত পণ্ডিত মরহুম ফোরুযানফারের গবেষণায় তিনি উল্লেখ করেছেন, আত্তার ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে নিশাপুরের কাদকান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল সৈনিকের হাতে নিহত হন। অপর দিকে ইরানের খ্যাতিমান সাহিত্য-ইতিহাসবিদ সাইদ নাফিসির বর্ণনা মতে, তিনি ৫৩৭ হিজরি মোতাবেক ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

আত্তারের শৈশব কাটে ইরানে তাতারদের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞের সময়ে। তাতারদের হত্যাযজ্ঞে যখন সমগ্র পারস্য এক বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে সে সময়ে আত্তারের বয়স মাত্র ৬ কিংবা ৭ বছর। এই হত্যাযজ্ঞ এতটাই নৃশংস এবং ভীতিকর ছিল যে, আত্তারের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই দুঃসহ স্মৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। শৈশবে আত্তার তাঁর চারপাশে যে নির্যাতন, আগ্রাসন, ধ্বংস, মৃত্যু এবং নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই-ই তাঁকে পরবর্তীতে মৃত্যুচিন্তা এবং যন্ত্রণা-ভাবনায় বেদনাকাতর করে তোলে। এই নৃশংসতা কিছুটা স্তিমিত হওয়ার ক'বছর পর আত্তার স্থানীয় মক্তবে লেখাপড়ায় নিমগ্ন হন। এ সময় তিনি আব্বাস তুসি, মোজাফ্‌ফার এবাদি, রুকনুদ্দিন আকাফ, মোহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া প্রমুখ ওলি ও সাধকের জীবনের নানা ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হন, যেগুলো তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁদের এসব ঘটনা পরবর্তীতে আত্তার তাঁর *তাযকেরাতুল আওলিয়া* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আত্তারের দিওয়ানের ভাষ্যমতে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিল মাহমুদ। প্রাচীনতম চরিতগ্রন্থগুলোতে আত্তারের পিতার নাম উল্লেখ হয়েছে ইবরাহিম বিন ইসহাক। কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর পিতার নাম ইউসুফ বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। কাদকানে 'পিরে জিরানভান্দ' নামে একটি মাজার রয়েছে, যে মাজারকে স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। এরা বিশ্বাস করেন এটি আত্তারের পিতা 'শেখ ইবরাহিম'-এর মাজার।

আত্তার শৈশব এবং তারুণ্যেই পবিত্র কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হ, তাফসির, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং পৈত্রিক পেশা হিসেবে 'আত্তারি' অর্থাৎ ভেষজ

চিকিৎসা এবং সুগন্ধি বিক্রয়ের পেশাকেই স্বীয় পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সে কারণেই তিনি স্বীয় নামের চেয়ে তাঁর পেশাগত উপাধি 'আত্তার' (ভেষজ চিকিৎসক বা সুগন্ধি বিক্রেতা) নামেই সমধিক পরিচিত। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রথম অংশ নিশাপুরের প্রাচীন শহরেই কাটে এবং মৃত্যুর আগের বাকি জীবন তিনি নিশাপুরের নতুন শহর 'শাদইয়াখ'-এ অতিহাবিত করেন। এখানেই তিনি পৈত্রিক পেশা ভেষজ চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন। এ পেশায় তিনি এতটাই সুনাম অর্জন করেন যে, বহু দূর দূরান্ত থেকে তার বাড়ি তথা চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগীরা এসে ভিড় করত। যে সম্পর্কে আত্তার স্বীয় গ্রন্থ *আসরার নামে* এবং *মসিবাত নামেতে* উল্লেখ করেছেন, প্রতিদিন অন্তত পাঁচশ রোগী তাঁর কাছে চিকিৎসা নিতে আসত :

بداروخانه پانصد شخص بودند
که در هر روز نبضم می نمودند

[চিকিৎসালয়ে ছিল পাঁচশ লোক
যারা প্রতিদিন আমার চিকিৎসা নিতে আসত]

আত্তার তাঁর পিতার কাছ থেকেই ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতকরণ এবং ভেষজ চিকিৎসার যাবতীয় জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। তবে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তিনি কার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা সুস্পষ্ট করে না জানা গেলেও একথা জানা যায় যে, স্বীয় চিকিৎসাকেন্দ্রেই রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বলিত কাব্যচর্চায়ও করতেন। মাদ্রাসা-খানকার প্রতি তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না এবং রাজ-রাজাদের স্তুতি করেও তিনি কোনো কাব্য রচনা করতেন না। এই অবস্থায়ই তাঁর জীবনে বড় ধরনের এক পরিবর্তন ঘটে। নিয়মিত রোগীর সেবা ও চিকিৎসা দেওয়া পরিত্যাগ করে আত্তার সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই পরিবর্তন বিষয়েও নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে আব্দুর রহমান জামীর বর্ণনাই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। জামী তাঁর *নাফাহাতুল উন্‌স্‌* গ্রন্থে বর্ণনা করেন : আত্তার প্রতিদিনের মতো স্বীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগী দেখায় ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় সেখান দিয়ে এক আগুন্তক দরবেশ যাচ্ছিল। দরবেশ বেশ ক'বার 'শাইউল্লাহ' 'শাইউল্লাহ' বলে আত্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেও আত্তার সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করছিলেন না। তখন দরবেশ বললেন, 'হে খাজা, তুমি কীভাবে মৃত্যু কামনা কর?' জবাবে আত্তার বললেন, 'যেভাবে তুমি মৃত্যু কামনা কর।' দরবেশ বললেন, 'তুমিও আমার মতো করে মৃত্যু কামনা কর?' আত্তার বললেন, 'হ্যাঁ।' একথা শুনেই দরবেশ তাঁর সাথে থাকা কাঠের পাত্রটি স্বীয় মাথার নিচে দিয়ে দোকানের সামনে সটান শুয়ে পড়ে বললেন, 'আল্লাহ।' এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এই দৃশ্য অবলোকন করে আত্তারের মনের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় চিকিৎসাকেন্দ্র বন্ধ করে দিয়ে এবং জগৎসংসারের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োগ করেন।

অবশ্য ফারসি সাহিত্যের অনেক গবেষকই জামীর এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কারণ, আত্তারের *তাজকেরাতুল আওলিয়া* গ্রন্থের তথ্য মতে দেখা যায়, শৈশবকাল থেকেই আত্তার আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই পার্থিব জীবন তথা সংসার জীবনের প্রতি তাঁর তেমন মায়া ছিল না। তিনি ছিলেন স্বীয় পিতার শিষ্য কুতুব উদ্দিন হায়দারের শিষ্য। বাল্যকালেই আত্তার কুতুব উদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সুফি সাধনায় দীক্ষা লাভ করেন। তবে ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই বিধায় তিনি চিকৎসা পেশা এবং আধ্যাত্মিক সাধনা সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর *আসরার নামে* এবং *এলাহি নামে* গ্রন্থ দুটিও তিনি চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত অবস্থায়ই রচনা করেন। কালক্রমে একপর্যায়ে যখন তিনি সংসার জীবন তথা পার্থিব জীবনের মায়ামুক্ত হয়ে পার্থিব সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, সম্ভবত এই সময়েই জামীর গ্রন্থে বর্ণিত পূর্বোক্ত দরবেশের ঘটনাটি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

যদিও অধিকাংশ গবেষকের মতে আত্তার দির্নিষ্ট কোনো মুর্শিদের কাছ থেকে সুফিতত্ত্বে দীক্ষা লাভ করেন নি, তবে কোনো কোনো গবেষক এই মতের সাথে একমত নন। আত্তারের সবচেয়ে প্রাচীনতম জীবনীকার কবি ও সুফি নূরুদ্দিন আব্দুর রহমান জামী আত্তারকে শেখ নাজমুদ্দিন কোবরার শিষ্য শেখ মাজদুদ্দিন বাগদাদীর শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আত্তার তাঁর *তাজকেরাতুল আওলিয়া* গ্রন্থের শুরুর দিকে মাজদুদ্দিন বাগদাদীর সাথে স্বীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি যে মাজদুদ্দিনের শিষ্য ছিলেন সে বিষয়ে এখানে তিনি বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেন নি। সারকথা হচ্ছে, আত্তার জীবনের একটি বৃহৎ অংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান আরেফ তথা সুফি সাধকদের সান্নিধ্যে কাটান এবং এসব সাধকের সান্নিধ্যের উদ্দেশ্যে তিনি পবিত্র ভূমি মক্কা থেকে মাওয়ারাউন্নাহার পর্যন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এমনি এক সফরের এক পর্যায়ে মাজদুদ্দিন

বাগদাদির খেদমতে উপস্থিত হন। বলা হয়ে থাকে ভুবনবিখ্যাত সুফি কবি মাওলানা জালাল উদ্দিনের পিতা বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ, রুমির বয়স যখন পাঁচ বছর তখন সপরিবারে কুনিয়ার উদ্দেশে বাল্‌খ ত্যাগ করেন। বাহাউদ্দিন পথে ওয়াখশ এবং সমরকান্দে কিছুদিন কাটিয়ে নিশাপুরে আসেন। এখানে কবি ও আধ্যাত্মিক সাধক শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। আত্তার বালক রুমির জন্য বিশেষ দোয়া করেন এবং তাঁকে তাঁর রচিত *আসরার নামে* গ্রন্থের একটি কপি উপহার দেন। ভবিষ্যতে রুমি একজন কামিল ব্যক্তি বা আধ্যাত্মিক সাধক হবেন বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেন।

সুফিদর্শন মতে, আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে ইসলামি শরিয়াতের এমন স্তর যার মাধ্যমে বান্দা পার্থিব বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিতান্তই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের আশায় ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে। জ্ঞানের মাধ্যমে সঠিক পথ উপলব্ধি করে একজন সুফি-সাধক সাধনার সাতটি স্তর পার হয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে তথা 'বাকা'র স্তরে উপনীত হয়। নিরন্তর এই সাধনার নামই অধ্যাত্মবাদ। এশ্‌ক বা প্রেম হচ্ছে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য এবং জীবনের স্ফুরক (detonator) আর তাসাওউফ বা অধ্যাত্মবাদের উৎসের কাঁচামাল, জগতের মহান কর্মসমূহের উৎসস্থলের গোপন ভেদ এবং সাধক পুরুষের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার চূড়ান্ত অবস্থার মূল ভিত্তি। সুফিতত্ত্বের ভাষায় 'মোহাব্বত' বা ভালোবাসা যখন পূর্ণতায় পৌঁছে তখন তাকে বলা হয় 'এশ্‌ক' বা প্রেম এবং প্রেম যখন পূর্ণতায় পৌঁছে তখন 'আশেক' বা প্রেমিক 'মাশুক' বা প্রেমাস্পদের সত্তায় 'ফানা' বা বিলীন হয়ে যায়। পরম প্রেমাস্পদের প্রেমে প্রেমিকের বিলীন হওয়াই এশ্‌ক বা প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি। প্রেম আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই মাক্বাম বা পর্যায় কেবল ইনসানে কামেল বা একজন পরিপূর্ণ মানুষই, যে উন্নতি এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির সবগুলো স্তর অতিক্রম করেছে, উপলব্ধি করতে পারেন।

আত্তার নিজে অধ্যাত্মবাদের এই মহান সাধনায় আত্মনিয়োগের পাশাপাশি সুফি দর্শনের এই জটিল তত্ত্বকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে তোলার লক্ষ্যে সাবলীল ও সরল ভাষায় গদ্যে-পদ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। আত্তারের রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা নিয়েও ফারসি সাহিত্যের গবেষক-সমালোকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রেজাকুলি খান হেদায়াতের মতে, আত্তারের সম্পৃক্ত গ্রন্থাবলির সংখ্যা ১৯০টি। কাজি নূরুল্লাহ শোশতারির মতে এ সংখ্যা ১১৪টি এবং দৌলতশাহ্‌র মতানুসারে ৪০টি। আত্তারের রচনাবলি সম্পর্কে দৌলতশাহ্ বলেন : আত্তারের মানসাভি কাব্য ছাড়াও তাঁর দিওয়ানে চল্লিশ হাজার বেইত বা শ্লোক রয়েছে। এছাড়া তিনি বার হাজার রুবায়ি রচনা করেছেন এবং সুফি সাধকদের জীবনীভিত্তিক *তাযকিরাতুল আওলিয়া* গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : *আসরার নামে, এলাহি নামে, মসিবাত নামে, জাওয়াহেরুজ্জাত, ওসিয়াত নামে, মানতেকুত তেইর, বুলবুল নামে, হায়দার নামে, শুতুর নামে, মুখতার নামে, শাহনামে* প্রভৃতি। এর বাইরে তিনি আরও কিছু কাব্য রচনা করেছিলেন, যেগুলো কালের পরিক্রমায় হারিয়ে গেছে। কাসিদা, গজল, মোকাত্তায়াত, রুবায়ি এবং মাসনাভি মিলে এখনো আত্তার রচিত একলক্ষ বেইত বা শ্লোকের অধিক রচনা বিদ্যমান।

অবশ্য ইরানের খ্যাতিমান ফারসি সাহিত্য সমালোচক ও গবেষক সাইদ নাফিসি বলেন, যে ৬৬টি গ্রন্থ ফরিদ উদ্দিন আত্তার রচিত বলে প্রচলিত মত বিদ্যমান তন্মধ্যে মাত্র ১২টি গ্রন্থ তিনি নিজে রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত গ্রন্থ হচ্ছে নয়টি। যথা : *মানতেকুত তেইর, আসরার নামে, এলাহি নামে, পান্দ নামে, খসরু নামে, মুখতার নামে, মসিবাত নামে, তাযকিরাতুল আওলিয়া এবং দিওয়ানে আত্তার*।

দিওয়ানে আত্তার মূলত তাঁর কাসিদা এবং রুবায়ির সংকলন। এর বেইত সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। আত্তারের দিওয়ান তাঁর আবেগময় আধ্যাত্মিক কবিতাসমূহের ধারক। যেগুলোতে আত্তার স্বীয় প্রেমাস্পদ পরম স্রষ্টার রহস্যাবলি কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আত্তারের গজল আবেগ ও উদ্দীপনাপূর্ণ। তাঁর কাসিদার বেশিরভাগই উপদেশ ও নসিহতে পূর্ণ। এসব কাব্যে আত্তার শ্রোতা এবং পাঠকদের পার্থিব জগতের মোহ ত্যাগ করে পরকাল তথা আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হওয়ার আহ্বান করেছেন এবং পার্থিব জীবনের অসারতা ও নশ্বরতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আত্তারের গজলের বেইতগুলো পরস্পর সন্নিবেশিত। সাধারণত এগুলোর সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ চিন্তা-দর্শনের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর ভাষা সহজ-সহল ও সাবলীল। তবে বিশুদ্ধ শব্দসম্ভার ও অলঙ্কারপূর্ণ কাব্যবিন্যাস তাঁর কাব্যমানকে উন্নত শৈলীতে পৌঁছে দিয়েছে।

আত্তারের মাসনাভিগুলো নানা কাহিনী ও হেকায়াতে পূর্ণ। আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য উপস্থানের উদ্দেশ্যেই মূলত আত্তার এসব কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এসব কাহিনীর চরিত্রগুলোও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের। যার ফলে এসব চরিত্রের মাধ্যমে তদানীন্তন সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়।

গল্প বলার ক্ষমতা ছিল আত্তারের সত্তাগত প্রতিভা। তাঁর এই প্রতিভা প্রথমবার পরিলক্ষিত হয় তাঁর *খসরু নামে* মাসনাভিতে, যেটি তিনি যৌবন বয়সেই রচনা করেছিলেন। যদিও এই কাহিনীকাব্যে তুর্কি সম্রাটের পুত্র খসরু এবং খুজিস্তানের রাজকুমারী গুলরোখের ভালোবাসা এবং রোমাঞ্চের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তবে আত্তার এতে এতসব রূপকথা ও কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন যার ফলে এ কাহিনীকাব্যকে লোকসংস্কৃতি ও তুলনামূলক ইতিহাসের আধার হিসেবে অবিহিত করা যায়। গল্প বলার ক্ষেত্রে আত্তার ছিলেন সানায়ির চেয়েও সিদ্ধহস্ত।

আমরা যদি আত্তারের কবি-জীবনের প্রথম দিকের রচনা *খসরু নামে* থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর অন্যসব সাহিত্যকর্মের দিকে দৃষ্টি ফেলি তাহলে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে তিনটি যুগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম যুগের রচনাগুলোতে অধ্যাত্মবাদ ও গল্পবলার শৈলী, এ দুইয়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্য লক্ষ করা যায়, যেগুলোতে শৈলীগত সব ধারাই অনুসরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় যুগের রচনাগুলোতে দেখি সৃষ্টি-কাঠামো ও সাহিত্য-শৈলীর চেয়ে আবেগ, উদ্দীপনা ও স্রষ্টার একত্বের প্রতিই আত্তারের অধিক মনোযোগ। তৃতীয় যুগের রচনাগুলোতে কবি বয়োবৃদ্ধ। এসব রচনায় তাঁকে হজরত আলী (রা.)-এর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট দেখা যায়, তাঁর চৈন্তিক শৃঙ্খলা এবং বর্ণন-দক্ষতা তেমন একটা চোখে পড়ে না।

সাম্প্রতিক গবেষণায় এই তিন শ্রেণির মধ্যে শুধু প্রথম শ্রেণির রচনাগুলোকে (অর্থাৎ *মানতেকুত তেইর, এলাহি নামে, মসিবাত*

নামে এই শ্রেণির অন্যান্য রচনা) দ্বিধাহীনভাবে আত্তারের রচনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মনে করা হয়, তৃতীয় যুগের রচনাগুলোতে হয় বিকৃতি ঘটেছে অথবা এগুলো সুস্পষ্টভাবেই অন্য কারো রচনা। যেমন : *মাজহারুল আজায়েব*, *খাইয়াত নামে*, প্রভৃতি। সর্বশেষ গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, তৃতীয় যুগের রচনাগুলো নিশ্চয় ভিন্ন এক আত্তার কর্তৃক রচিত।

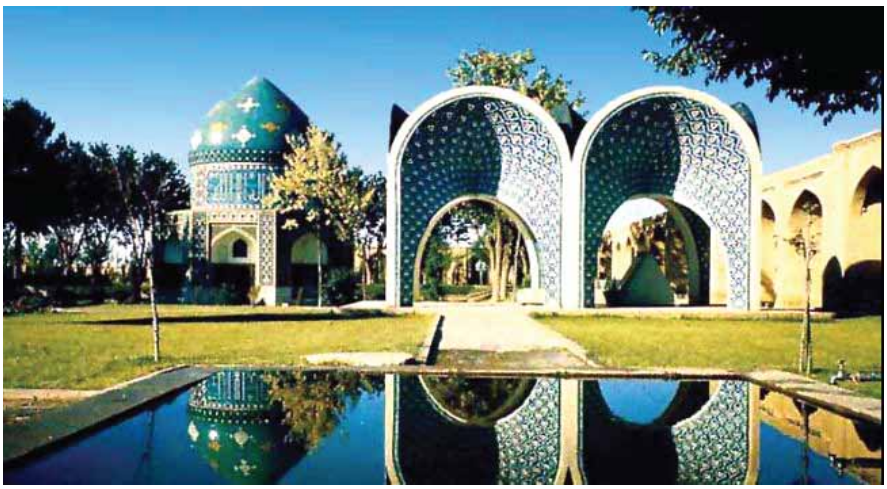

ইরানের খোরাসান প্রদেশের নিশাপুরে অবস্থিত আত্তারের সমাধিসৌধ

আত্তারের মাসনাভিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসনাভি হচ্ছে *এলাহি নামে*। প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনীকাব্য এমন কিছু ছোট ছোট গল্প ও কাহিনীর সমাহার, যেগুলো মূলত পিতা-পুত্রের কথোপকথনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পুত্র বেশকিছু অমূলক বিষয় সম্পর্কে পিতার কাছে জানতে চাচ্ছে। পিতা সেসব বিষয়ের বাস্তবতা পুত্রের কাছে সুস্পষ্ট করছেন। আত্তার এসব কথোপকথনের ফাঁকে ফাঁকে আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও সামাজিক অনেক বিষয়ই বর্ণনা করছেন।

তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীকাব্য হচ্ছে *মসিবাত নামে*। যেটিতে আত্তার আধ্যাত্মিক সাধকের নানা আত্মিক সমস্যা ও দুর্যোগ বর্ণনার পাশাপাশি বহু কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। মূলত এটি আত্মার পরিক্রমণের গল্প, যাতে সাধক অদৃশ্য জগৎ থেকে স্বীয় ভ্রমণ-পথ অনুধ্যান করে এবং মুর্শিদের পথনির্দেশনায় পথের নানা স্তর অতিক্রম করে।

সুফিদের নিকট আধ্যাত্মিক সাধনার সাতটি স্তর বিদ্যমান। আত্তার তাঁর আধ্যাত্মিক বক্তব্য সম্বলিত বিভিন্ন রচনাবলিতে এই সাতটি স্তরকে প্রেমের শহর তথা অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার পথ-পরিক্রমার সাতটি উপত্যকার সাথে তুলনা করেছেন। প্রথম উপত্যকা বা স্তর হচ্ছে 'তালব' বা অনুসন্ধান। যার মাধ্যমে সাধক বা বান্দা তার অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার পথ অনুসন্ধান করবে। দ্বিতীয় উপত্যকা বা স্তর হচ্ছে 'এশক' বা প্রেম। যে এশকের তাড়নায় সাধক তার গন্তব্যে পৌঁছতে দ্রুত পদক্ষেপ ফেলবে। তৃতীয় স্তর 'মারেফাত' বা অন্তর্দৃষ্টি, যার মাধ্যমে সাধক তার সাধ্যানুযায়ী স্বীয় গন্তব্যে পৌঁছার পথ খুঁজে পাবে। চতুর্থ স্তর হচ্ছে 'এস্তেগনা' বা স্বয়ম্ভরতা। সাধক বান্দা তার সাধনার এই স্তরে পৌঁছে স্বীয় প্রেমাস্পদ মহান আল্লাহ্‌র প্রতি এতটাই আস্থাশীল হয়ে উঠবে যে, জাগতিক কোনো কিছুর প্রতিই সে আর কোনো পিছুটান বা মুখাপেক্ষিতা অনুভব করবে না। এই সাধনার পঞ্চম স্তর হচ্ছে 'তাওহিদ' বা একত্ববাদ। আধ্যাত্মিক সাধক তার সাধনার এই স্তরে পৌঁছে যে দিকেই দৃষ্টি দেবে সর্বত্রই মহিমাময় স্রষ্টার একত্বের অস্তিত্বই প্রত্যক্ষ করবে। ষষ্ঠ স্তর হচ্ছে 'হায়রাত' বা বিস্ময়, বিহ্বলতা। বান্দা এই স্তরে পৌঁছে মহান স্রষ্টার প্রেম-ভালোবাসা ও ক্ষমতার অসীমতার বিপরীতে স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার সসীমতা, অপ্রতুলতা এবং সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়বে। এই সাধনার সপ্তম বা সর্বশেষ স্তর হচ্ছে 'ফানা' বা বিলয়, বিলুপ্তি, নিশ্চিহ্নতা, অনস্তিত্ব। এই স্তরে পৌঁছে বান্দা বা সাধকের যাবতীয় মানবীয় কামনা-বাসনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে আত্মপরিচয় ও আত্মসত্তাকে বিলীন করে দিয়ে প্রকৃত প্রেমাস্পদ মহান স্রষ্টার সত্তায় একাকার হয়ে মিলিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে সে 'ফানা' বা অনস্তিত্ব পার হয়ে 'বাকা' বা অস্তিত্বে পৌঁছে। নদী যেমন মোহনায় নিজেকে বিলুপ্ত করে সাগরে গিয়ে পৌঁছে।

সুফিতত্ত্বের এই জটিল দর্শনকে রূপক গল্পের মাধ্যমে আত্তার তাঁর মাসনাভি বা দ্বিপদী কাব্য *মানতেকুত তেইর*-এ অত্যন্ত সরল ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। এটি আত্তারের আধ্যাত্মিক মাসনাভিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যেটিকে আত্তারের শ্রেষ্ঠকর্ম হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। শুধু তাই নয়, এটি বিশ্বসাহিত্যেরও এক অমূল্য সম্পদ। আত্তার পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা আন-নামলের ১৬ নং আয়াত থেকে এ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে :

"وورث سليمن داود وقال يايها الناس علمنا منطق الطير"

[সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন এবং তিনি বললেন, হে লোকসকল, আমাকে 'মানতেকুত তেইর' বা পাখির ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে]

৪২০০-এর অধিক বেইত সম্বলিত এই মাসনাভিটি মূলত একটি রূপক কাহিনীকাব্য। 'সিমোরগ' নামের এক কিংবদন্তি পাখিকে কেন্দ্র করে পাখিদের আলোচনা বা সমাবেশ এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এসব পাখি দ্বারা আত্তার সত্যপথের সাধক পথিক এবং 'সিমোরগ' দ্বারা মহান স্রষ্টার অস্তিত্বকেই বোঝাতে চেয়েছেন। আত্তার তাঁর এ গ্রন্থে অধ্যাত্মবাদের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে মনোরম-মধুর গল্প-সূত্রে বর্ণনা করেছেন। গল্পের মূল পরিকল্পনা এরকম :

একদিন পক্ষিকুল তাদের বাদশাহ্ বা শাসক নির্বাচন ও অনুসন্ধানের জন্য একত্রিত হলো। তাদের সবার বক্তব্য হচ্ছে, এমন কোনো শহর নেই যে শহরের কোনো শাসক নেই। আমাদেরও আমাদের শাসক কে, তা অনুসন্ধান করা উচিত। সমবেত পাখিদের মধ্য থেকে হুদহুদ (কাঠঠোকরা)—পখিদের গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহক—বলে উঠল : আমি সেই বাদশাহ্‌র নাম জানি। তাঁর নাম 'সিমোরগ'। 'সিমোরগের' পাখিদের বাদশাহ্ হওয়ার উপযুক্ততাও বর্ণনা করল সে এবং এও বলল যে, 'সিমোরগ'-এর আবাস সাত উপত্যকার ওপারে। তার

সান্নিধ্যে যেতে হলে অবশ্যই আমাদের এই সাত উপত্যকা পাড়ি দিয়েই যেতে হবে। উল্লেখ্য, আত্তার এখানে পাখিদের দ্বারা সত্যপথের অনুসন্ধানী সাধকদের, হুদহুদ বা কাঠঠোকরা পাখি দ্বারা সেই পথের পথনির্দেশক মুর্শিদকে এবং 'সিমোরগ' দ্বারা চিরসত্য মহান স্রষ্টাকে বুঝিয়েছেন। আর সাত উপত্যকা দ্বারা উপরোল্লিখিত আধ্যাত্মিক সাধনার পথপরিক্রমার সাতটি স্তরকে বুঝিয়েছেন।

হুদহুদের কথা মতো নানা উজর-আপত্তি (পার্থিব জগতের প্রতি মানুষের ব্যাপক আসক্তি ও আগ্রহ, যেগুলোর প্রত্যেকটি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের অভিযাত্রার সাধনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়) সত্ত্বেও পাখিরা 'সিমোরগ'র সান্নিধ্য লাভের যাত্রায় যুক্ত হয়। এই অভিযাত্রার প্রাক্কালে আত্তার এ পথের বিপদসঙ্কুলতা এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে শেখ সানায়ানের কাহিনীরও অবতারণা করেছেন। হুদহুদ পথের বিপদাপদ সম্পর্কে পাখিদের অবহিত করে এবং তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিও দেয় যে, 'সিমোরগ'র আবাস পর্যন্ত সে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে তাদের পরিক্রমণ-আগ্রহ থাকতে হবে এবং দূর-পথ পরিক্রমণে যে নানা রকম কষ্টক্লেশ আসবে তাও সহ্য করতে হবে। কিন্তু পথিমধ্যে অধিকাংশ পাখিই নানা উজর-আপত্তি ও বাহানা উপস্থাপন করে এই কষ্টযাত্রা থেকে পালিয়ে যায়। যেমন : ফুলপ্রেমিক বুলবুল এই বলে অজুহাত পেশ করে :

درسرمازعشقگل،سودابساست
زانکهمطلوبم،گلرعنابساست
طاقتسیمرغ،ناردبلبلي
بلبلیرابسبود،عشقگلي

[আমার মাথায় ফুলের প্রেম, এই লেনদেনই যথেষ্ট
আমার উদ্দিষ্ট দৃষ্টিনন্দন ফুল এইতো যথেষ্ট
'সিমোরগ'-এর সান্নিধ্য-ক্ষমতা বুলবুলের নেই
বুলবুলের জন্য ফুলের ভালোবাসাই ছিল যথেষ্ট]

এর জবাবে হুদহুদ তাকে বলে :

گل اگرچه هست بس صاحب جمال
حسن او در هفته اي گيرد زوال
عشق چيزي كان زوال آرد پديد
كاملا را زان ملال آرد پديد
خنده گل گرچه در كارت فكند
روز و شب، در ناله زارت فكند
در گذار از گل، كه گل هر نوبهار
بر تو مي خندد، نه در تو، شرم دار

[যদিও ফুল যথেষ্ট সৌন্দর্যের অধিকারী
তবে তার সৌন্দর্য এক সপ্তাহেই হয় বিলীন
ভালোবাসা এমন বস্তু যা সৃষ্টি করে অবক্ষয়
সেই অবসাদ থেকেই সৃষ্টি করে পূর্ণতাকে
ফুলের হাসি যদিও তোমার কাজে নিক্ষিপ্ত
দিবানিশি, তোমার ক্রন্দনরোলে নিক্ষিপ্ত
ছাড় ফুলের কথা, ফুলতো প্রতি নববসন্তে
তোমার ওপর হাসে, তোমার ভেতরে নয়, লজ্জা কর (এমন অজুহাতে)]

ময়ূর এই বলে অজুহাত দেখায় :

كي بود سيمرغ را، پرواي من
بس بود فردوس اعلي، جاي من
من ندارم در جهان كاري دگر
تا بهشتم ره دهد، باري دگر

[কিসের পরোয়া ছিল আমার 'সিমোরগ'-অন্বিষ্ট
সুউচ্চ ফেরদৌসই আমার স্থান, এইতো ছিল যথেষ্ট
জগতে আমার আরতো নেই কোনো কারবার
যেন আমায় বেহেশতে স্থান দেয় পুনর্বার]

হুদহুদ তাকে উপদেশ দিয়ে বলে :

چون به دريا مي تواني راه يافت
سوي يک شبنم، چرا بايد شتافت ...

گر تو هستي مرد كلي، كل ببين
كل طلب، كل باش، كل شو، كل ببين

[যখন তুমি সমুদ্র-মুখে পথ পেতে পার
কেন তবে শিশির বিন্দু-মুখে ছোটাছুটি কর
যেহেতু তুমি পূর্ণতার অস্তিত্ব, তাই পূর্ণতাকেই দেখ
পূর্ণ অনুসন্ধান কর, পূর্ণ থাক, পূর্ণ হও, পূর্ণতাকেই দেখ]

কিন্তু যেসব পাখি নানা অজুহাত উপস্থাপন করছিল তাদের কেউই হুদহুদের জবাব এবং উপদেশে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এক এক করে তারা সবাই এই অভিযাত্রা থেকে সরে পড়ে। অবশিষ্ট পাখিদের মধ্য থেকে মাত্র ত্রিশটি পাখি (সি মোরগ) বিপদসঙ্কুল সাতটি উপত্যকা পার হয়ে 'সিমোরগ'র আবাসে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে তারা নিজেদের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে বিস্মিত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। মহাশক্তিধর 'সিমোরগ'-এর কাছে নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন (ফানা) করে দেয়। এভাবে বেশ ক'বছর কেটে যায়। তারপর তারা ফানা থেকে 'বাকা' বা অবিনশ্বরতার আভরণ পরে তাদের বাদশাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়। এখানে তাদের কাছে মনে হয় তারা যেন স্বচ্ছ পানিবেষ্টিত একটি উপত্যকা অথবা একটি আয়নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে। যখন তারা 'সিমোরগ'কে চাক্ষুস করতে চায় তখন তারা যে সি মোরগ বা ত্রিশ পাখি ছিল তাদেরকেই দেখতে পায়। যে দৃশ্যের বর্ণনা আত্তার তাঁর *মানতেকুত তেইরে* এভাবে দিয়েছেন :

چون نگه كردند آن سي مرغ زود
بي شک آن سيمرغ آن سي مرغ بود
در تحير جمله سرگردان شدند
مي ندانستند اين يا آن شدند
خويش را ديدند سيمرغ تمام
بود خود سي مرغ، سيمرغ مدام

[যখন সহসাই ওই ত্রিশ পাখি (সি মোরগ) তাকাল
(দেখে) সন্দেহাতীত ওই 'সিমোরগ' সেই ত্রিশ পাখিই (সি মোরগ) ছিল
বিহ্বলতায় সবাই বিস্ময়-বিমূঢ় হলো
তারা জানত যে, এ-ই অথবা সে-ই হয়েছে
নিজেদের দেখল তারা পূর্ণ 'সিমোরগ'
ছিল স্বয়ং ত্রিশ পাখি (সি মোরগ) অবিনশ্বর 'সিমোরগ']

বস্তুতপক্ষে তারা এটা উপলব্ধি করতে পারল যে, এই 'সিমোরগ' আসলে ওই ত্রিশ পাখিই। অর্থাৎ তারা অজ্ঞাতসারে বাইরের জগতে যে সত্তাকে অনুসন্ধান করছিল সেই সত্তাকে তারা স্বীয় অন্তরেই খুঁজে পেয়েছে।

এই গ্রন্থের চমৎকারিত্ব হচ্ছে, পাখিদের বাদশাহ্ কিংবদন্তি পাখি 'সিমোরগ' এবং অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছা ত্রিশ পাখি, ফারসিতে 'সি মোরগ', এই দুইয়ের চমৎকার অনুপ্রাস। যার দৃষ্টান্ত শুধু ফারসি সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। এই বিরল কাহিনীকাব্য, যা কবির উন্নত সৃজনদক্ষতা ও কবিকল্পনার ধারক এবং অধ্যাত্মবাদের নিগূঢ় রহস্যাবলির সহজ-সরল ও সাবলীল বর্ণনা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার আধার, ফারসি সাহিত্যের কালজয়ী শ্রেষ্ঠকর্মগুলোর অন্যতম। আত্তারের *মানতেকুত তেইর*-এর মূল শিক্ষা হিসেবে আমরা দেখি, শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেই নয়; বরং পার্থিব জীবনের নানারূপ সাফল্যে পৌঁছার ক্ষেত্রেও ব্যক্তির কঠিন সাধনা বাঞ্ছনীয়। আর সেই সাফল্যে পৌঁছার আগে লক্ষ্য স্থির করা অবশ্যম্ভাবী। আর লক্ষ স্থির করার পূর্বেই আসে ইপ্সিত লক্ষ্যের শুভাশুভ অনুসন্ধান। অধ্যাত্মবাদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'তালব'। সুতরাং একথা দৃঢ়চিত্তেই বলা যায় যে, আত্তারের *মানতেকুত তেইর* শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার পথের অভিযাত্রীদের জন্যই নয়; বরং জগতের সকল সাফল্যকামী মানুষের জন্যই অবশ্যপাঠ্য এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আর সেকারণেই হয়তো পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় *মানতেকুত তেইর* অনূদিত হয়ে পঠিত এবং সমাদৃত হচ্ছে।

নিঃসন্দেহে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে সুফিকবিদের মধ্যে আত্তারের নাম উজ্জ্বলতর। তাঁর ভালোবাসা ও আকুলতাপূর্ণ চিত্তাকর্ষক সরল বক্তব্য, একই সাথে যেগুলো চিরন্তন সত্য মহান প্রভুর সান্নিধ্যান্বেষী অভিযাত্রীদের জন্য পথনির্দেশক, অভীষ্ট গন্তব্যের পথ দেখিয়ে দেয়। তিনি অধ্যাত্মবাদের অমিয় বাণীগুলো সাধারণ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরাভরণ গতিশীল, সাবলীল ভাষাকেই নির্বাচন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ পারঙ্গমতার দৃষ্টান্ত অন্যান্য কবির মধ্যে বিরল। আত্তারই প্রথম সহজ-সরল ভাষা এবং প্রচলিত কেচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে অধ্যাত্মবাদের জটিল তত্ত্বকে সর্বসাধারণ্যে সহজবোধ্য করে তোলেন। সম্ভবত এ কারণেই আত্তারের অনুজ কবি ও তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত-অনুরক্ত, অধ্যাত্মবাদের সম্রাট মওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলেছেন :

عطار روح بود سنائي دوچشم او
ما از پي سنائي و عطار آمديم

[আত্তার ছিলেন (অধ্যাত্মবাদের) আত্মা আর সানায়ি তাঁর দুচোখ আমরা সানায়ি আর আত্তারের অনুগমন করেছি]

আত্তারের মৃত্যুতারিখ নিয়েও জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তাঁর মৃত্যুসাল ১২৩০ খ্রিস্টাব্দ বলেই সর্বাধিক মত পাওয়া যায়। ইবনুল ফাওতির বর্ণনা মতে, আত্তারের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেনি, তিনি মোঙ্গল সৈনিকের হাতে শাহাদাত বরণ করেন এবং তাঁকে নিশাপুরেই সমাহিত করা হয়। ঐতিহাসিক ইবনুল আসিরের বর্ণনায় পাওয়া যায়, সে সময়ে মোঙ্গলদের অত্যাচারে নিশাপুর এমন ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছিলো যে, সেখানে বসবাসের উপযোগী দুটি বাড়িও অবশিষ্ট ছিলো না। এ সময় আত্তার নিশাপুরেই অবস্থান করছিলেন। নিশাপুর ধ্বংসযজ্ঞের কালে একজন মোঙ্গল সৈনিক আত্তারকে হত্যা করতে চাইলে অপর একজন মোঙ্গল সৈনিক তাঁকে এক হাজার মুদ্রায় ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করে। আত্তার তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তাঁর মূল্য এর চেয়ে অধিক। কিছুক্ষণ পর অপর এক মোঙ্গল সৈনিক এসে তাঁকে একভার ঘাসের বিনিময়ে ক্রয় করতে চাইলো। এ কথা শুনে আত্তার বললেন, আমার মূল্য এরে চেয়ে কম। এর নিকটই আমাকে বিক্রি কর। এ কথা শুনে যে মোঙ্গল সৈনিক আত্তারকে বন্দি করেছিল সে ভাবল, আত্তার তার সাথে পরিহাস করছেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সে তলোয়ারের আঘাতে আত্তারকে হত্যা করে ফেলল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সে জানতে পারল যে, সে মূলত সমকালের শ্রেষ্ঠ সুফি সাধককে হত্যা করেছে, তখন তার ভেতর অনুশোচনাবোধ তৈরি হয় এবং সে দরবেশী পন্থা গ্রহণ করে আত্তারের মাজারের খেদমতে আত্মনিয়োগ করে। বাকি জীবন সে এখানেই অতিবাহিত করে।

ইরানের খোরাসান প্রদেশের রাজধানী মাশহাদ শহর থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে, নিশাপুওে ওমর খৈয়্যামের সমাধির কাছাকাছি আত্তারের মাজার অবস্থিত। দৌলতশাহ্র বর্ণনা মতে, কাজী ইয়াহইয়া বিন সাইদ সর্বপ্রথম আত্তারের কবরের ওপর সৌধের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নিজাম উদ্দিন আমীর আলী শের এর উপরিস্থ স্থাপনাটি নির্মাণ করেন। যেটি হযরত সাইয়্যেদ আরেফ কাসেম আনোয়ার এবং শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের রওজা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। দৌলতশাহ্র বর্ণনা মতে, কাজী ইয়াহইয়া বিন সাইদ আত্তারের মৃত্যুর পর ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে সৌধটি নির্মাণ করলেও কালক্রমে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আমির আলী শের ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে এটি পুনঃনির্মাণ করেন। কাচার সম্রাট মোহাম্মদ আলী শাহ্র শাসনামলের শেষ দিকে নিরুদ্দৌলা খোরাসানের প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত হলে আত্তারের কবরের ওপর একটি জাঁকজমকপূর্ণ সৌধ নির্মাণের নির্দেশ দেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি তেহরানে চলে আসায় এ কাজটি অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

বর্তমানে আত্তারের কবরের ওপর যে সৌকর্যমণ্ডিত স্থাপনাটি লক্ষ করা যায় তা নির্মিত হয় আন্জুমানে আসারে মিল্লিয়ে ইরান-এর উদ্যোগে। ১৯৫৩ এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পরপর দু'বার পূর্বের আকৃতি ও নকশাকে ঠিক রেখে এই সমাধিসৌধটি দৃষ্টিনন্দন কারুকাজে সুসজ্জিত করা হয়। প্রতিবছর ইরানি বর্ষপঞ্জিকার প্রথম মাস ফারভারদিনের ২৫ তারিখ (১৪ এপ্রিল) জাতীয়ভাবে আত্তার দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে নিশাপুরে তাঁর মাজার প্রাঙ্গণে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফারসি সাহিত্যের অধ্যাত্মচিন্তার আত্মা শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের পবিত্র মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নিশাপুরে আগমন করে।

লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাইকেল মধুসূদনের আত্মবিলাপ

সৌম্য সালেক

সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনে যেমন ক্রান্তিকাল আসে তেমনি ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ক্রান্তিকাল রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এমন এক পর্যায়ে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটে যখন বাংলা সাহিত্যের ক্রান্তিকাল। মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারা থেকে বের হবার চেষ্টা চলেছে তখন। যাঁরা মধ্যযুগীয় বিষয়বস্তু, বাক্য ও ছন্দপ্রবণতা থেকে বের হবার চেষ্টায় ছিলেন তাঁদের একজন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। আধুনিক কবিতা বা সাহিত্য বিষয়সীমা বর্জিত, সেখানে মানুষ এমনকি পরিপার্শ্বের প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুও সাহিত্যের অনুষঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আধুনিকতায় উত্তরণে কাজ করেছেন, তার 'পাঁঠা', 'আনারস', 'তাপসে মাছ' কবিতায় এবং কিছু বিদ্রূপাত্মক লেখায় সে স্বাক্ষাৎ পাওয়া যায়। স্বদেশ ও সমাজের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁর ভাষা, ছন্দ-অলংকার ছিল মধ্যযুগীয়– যার ফলে আধুনিকতার উত্তরণে তখনও পথ বাকি ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যের বিষয় ছিল প্রধানত ধর্মকাহিনী, ঐতিহাসিক বিজয়গাথা, পুরাণ, রাজা-বাদশার আখ্যান এবং স্তুতি-বন্দনা কেন্দ্রিক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেই সাহিত্য ব্যক্তিত্ব যিনি বিষয়, ভাষা ও প্রকরণগতভাবে বাংলা সাহিত্য বিশেষত বাংলা কবিতাকে আধুনিকতার সাথে পরিচয় ঘটান। মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী বলা হয়, তাঁর এই বিদ্রোহ ছিল যেমন ভাষাবিদ্রোহ, তেমনি সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়-নিরীক্ষার দিক থেকেও।

মধুসূদনের ভাষা-বিদ্রোহ এবং অগ্রগামী সৃজন প্রক্রিয়ার বিষয়টিকে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন লেখক গবেষক আহমদ রফিক, তাঁর 'নজরুলের বিদ্রোহ : বিদ্রোহের স্বরূপ-অন্বেষ' শীর্ষক রচনা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি। 'বিষয়গত ও প্রকরণগত উভয় দিকেই মধুসূদন তার বিদ্রোহী ভূমিকাটির সমাপন ঘটিয়েছেন এমন এক আবেগে, যার পেছন ছিল প্রচলিত মূল্যবোধ থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের সৎসাহস। এই বলিষ্ঠ মননশীলতাই মধুসূদনের কাব্যচেতনায় লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য যা প্রতীকী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জন্য নতুন এক দিকদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিল।'

আমরা মধুসূদনের কবিতায় বিচিত্র বিষয়ের স্বাক্ষাৎ পাই, যা আধুনিক সাহিত্যের প্রবণতা বলে বিবেচিত। 'ময়ুর ও গৌরি'; 'অশ্ব ও কুরঙ্গ'; 'সূর্য্য ও মৈনাক গিরি'; 'মেঘ ও চাতক'; 'সিংহ ও মশক'; 'পীড়িত সিংহ' ও অন্যান্য পশু এবং রসলা ও স্বর্ণ-লতিকা কবিতাগুলো যেমন মধুসূনের বিষয় নির্বাচনের সর্বমুখীতাকে প্রকাশ করে তেমনি এসবে প্রকাশিত ভাবনা-প্রবাহ, ভাষা ও আঙ্গিকগত নিরীক্ষা একজন আধুনিক শব্দ-শিল্পী হিসেবে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

মধুসুদন দত্ত বাংলা সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক নাটক (শর্মিষ্ঠা-১৮৫৯) ও প্রথম সার্থক প্রহসন রচিয়তা এবং বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার মাধ্যমে একজন সার্বিক ও সম্পন্ন সাহিত্যকার- শিল্পকার হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কবিতা ও নাটকের আঙ্গিকগত এসব উৎকর্ষের অন্তরালে ছিল তাঁর উৎসুক-অভিসন্ধিৎসা এবং বিষয়ের নিরীক্ষা, যা সেসময়ে বাংলা সাহিত্যের জন্য ছিল অভিনব ব্যাপার। মধুসূদনের সেই অগ্রবর্তী ভাবনা ও নিরীক্ষার ধারাবাহিক চর্চার ফল আজকের বাংলা কবিতা। মধুসূদন হোমেরিক স্টাইলে লেখার প্রবর্তন করেন– 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। তিনি হোমারের 'ইলিয়াড'কে জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলে মনে করতেন। 'হেকটর বধ' কাব্যে তিনি ইলিয়াড এর কাহিনী বিবৃত করতে আরম্ভ করেও শেষে করতে পারেন নি। অসমাপ্ত আকারে যা ১৮৭১ সালে গ্রন্থাকারে বের হয়, সেখানে উপহারপত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে তিনি লেখেন, 'আমাদিগের রামায়ন, মহাভারত রামচন্দ্রের পঞ্চপাণ্ডবের জীবন-চরিত্র মাত্র... কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এসকল কাব্য কোথায়?'

মধুসূদন ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের জীবন ও কর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর কবিতায় আমরা বায়রনের বেশ কিছু উদ্ধৃতির প্রয়োগ লক্ষ্য করি। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় রয়েছে বায়রনের বিখ্যাত উক্তি, 'My Native Land, good Night'– এর ব্যবহার। একটি অবাক বিষয় হলো বায়রন মারা যান ১৮২৪ সালে এবং সে বছরের ২৫ জানুয়ারি মধুসূদনের জন্ম হয়। মধুসূদনের বিপুল প্রতিভার আরেক পরিচায়ক তাঁর ভাষা দক্ষতা। বাংলা ছাড়া তিনি আরও বারোটি ভাষা জানতেন। ইংরেজি ভাষার বিশ্বব্যাপী প্রভাব এবং সে ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করে তিনি ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্য

ছিল ইংরেজিতে লেখা– 'The Captive Lady-1849' । নিজ ভাষার প্রতি তাঁর এ বিরাগ-অনুরাগের কারণ মূলত বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং সে ভাষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিতি। কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে বুঝতে সক্ষম হন যে, মাতৃভাষাই শেষ্ঠ এবং মূল্যবান। তিনি ফিরে আসেন। তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ছিল বাংলা সাহিত্যের বাঁক বদলের অন্যতম ঘটনা। মধুসূদনের কবিতায় আমরা শুনতে পাই ভাষাবন্দনার অনুপম উক্তি, 'মাতৃভাষা রূপখানি পূর্ণ মণিজালে।' তিনি নিজেকে 'বাঙ্গাল' পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। ঢাকায় প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে প্রকাশ করছি :

'আমার সম্বন্দের আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হইক আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা... বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি সুদ্ধ বাঙালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।'

মধুসুদনের কাব্যভাষা ঋজু, সংহত এবং আভিজাত্যপূর্ণ। পরবর্তী সময়ে বাংলা কবিতায় গীতি-কবিতার ব্যাপক চর্চা পরিলক্ষিত হয়, মধুসূদনীয় ভাষাভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কাব্যচর্চা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল ও অন্য গীতিকবিদের ভঙ্গিকেই নিজের কাব্যচর্চার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। গীতি-কবিতার অন্তর্মুখী নতবাক্ কাব্যভাষার বাইরে পরবর্তী সময়ে আমরা কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের কিছু কবিতায় মধুসূদনীয় ছন্দ, শব্দ ও বাক্‌রীতির সাক্ষাৎ পাই। উল্লেখ্য, 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অনুপ্রেরণায় অনেক কবি মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, গোলাম মোস্তফা এবং ফররুখ আহমাদের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। মধুসূদনের কাব্যভাষার শক্তি, স্বাতন্ত্র্য এবং অভিনবত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরছি : 'আপন শক্তির পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষার পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। বাংলা ভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতার দীক্ষা দিলেন, যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্ত্রিত করে তোলার জন্য সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে মধুসূদন নিঃসঙ্কোচে যেসব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নতুন, বাংলা পয়ারের সনাতন সমবিভক্ত আল ভেঙ্গে দিয়ে তার ওপরে অমিত্রাক্ষরের যে-বন্যা বইয়ে দিলেন সে-ও নতুন। আর মহাকাব্য, খণ্ড-কাব্য রচনার যে রীতি অবলম্বন করলেন, তাও বাংলা ভাষায় নতুন।'

(দুই)

কিশোরকাল থেকেই মধুসূদন ছিলেন দৃঢ়চেতা ও আত্মবিশ্বাসী। তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভা সর্বজনবিদিত। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব গঠনে হিন্দু কলেজের শিক্ষাপর্ব এবং এ কলেজের বহিষ্কৃত শিক্ষক ডিরোজিও'র চিন্তা-ভাবনার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। বড় কবি হবার জন্য তাঁর যে বাসনা তা কিংবদন্তিতুল্য, বিশেষত ভারতবর্ষে কেউ কবি হবার জন্যে এতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখান নি এবং এতদূর ত্যাগ স্বীকারও কেউ করেনি। বিশ্বখ্যাত কবি হবার জন্য ইংল্যান্ড যাবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি যে কতটা প্রবল ছিলেন, তা প্রকাশ পেয়েছে বন্ধু গৌরদাশকে লেখা চিঠিতে, তখন তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র।

'সূর্য উঠতে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আমি- আমি ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা ভুলব না, ভুলতে পারব না। আর একবার ইংল্যান্ডে যেতে পারলে শ্রেষ্ঠ কবি আমি হবই।' এতটাই প্রবল ছিল কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ। তিনি আইন পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেনও, সেটা ১৮৬২ সাল। সেখানে গিয়ে তিনি সহসা বুঝতে সক্ষম হন যে, ইউরোপীয় সমাজ কোন বহিরাগতকে সাদরে গ্রহণের জন্য বসে নেই। তাঁর জীবন ছিল বাধাহীন, অমিতব্যয়ী, উশৃঙ্খল ও দ্বন্দ্বমুখর যার ফলে মাত্র ৪৯ বছরের জীবনের মধ্যে দেখা যায় ভাঙ্গা-গড়া, উত্থান-পতনের অনেক ঘটনা। আসলে অধিকাংশ শিল্পী-কবির জীবনই এমন বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্বে ভরা। এ বিষয়ে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং এর বহুশ্রুত মন্তব্যটি স্মরণ করছি : 'শিল্পীর জীবন দ্বন্দ্বপূর্ণ না হয়ে পারে না, কারণ, দুটি বিপরীতমুখী শক্তি তাঁর ভিতর সংঘাতে লিপ্ত, একদিকে আনন্দ, তৃপ্তি ও সুরক্ষার জন্য সাধারণ মানবীয় বাসনা; অপরদিকে সৃষ্টির জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা, যার বাস্তবায়নের জন্য মানবীয় বাসনাগুলোকে অগ্রাহ্য করা আবশ্যক।' মধুসূদনের জীবনে দ্বী-মুখী সংকটের এই খেলা আমৃত্যু চলেছে, সে গল্প আমাদের অজানা নয়।

মাইকেল মধুসূদন তাঁর সাহিত্যকর্মে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যধারার শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলির মধ্যে তাঁর আধুনিক সাহিত্যভাবনার প্রকাশ ঘটেছে সবচেয়ে

নিবিড়ভাবে। বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি তাঁর মানস-ভ্রমণের নানা অনুভব ও অভিব্যক্তির প্রকাশ কবিতাগুলোর অন্তর্নিহিত সুর, যা সহজেই চোখে পড়ে। সনেটের বাইরে মধুসূদন বিভিন্ন বিষয়ে আরও বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন যা সেসময় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি, পরবর্তীকালে মধুসূদন রচনাবলিতে 'নানা কবিতা' শিরোনামে পত্রস্থ হয়েছে।

মধুসূদন রচিত গীতিকবিতাগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কবিতার নাম, 'আত্ম-বিলাপ'। এটিকে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা-স্মারক বিবেচনা করলে অত্যুক্তি হবে না। আধুনিক জীবন বোধের সাথে ছন্দে- প্রকরণে- বিশ্লেষণে, শব্দপ্রয়োগে, উপমা-উৎপ্রেক্ষার যথার্থ ব্যবহারে আত্ম-বিলাপ আধুনিক বাংলা কবিতার এক অনন্য পাঠ। জীবনব্যাপী অপচয় ও আকাশ-কুসুম কল্পনার পিছে ধেয়ে চলার অভিঘাত এবং অনুতাপ এই কবিতার মর্মভাষ হলেও যুগযন্ত্রণায় দগ্ধ নাগরিক মানুষের বিষণ্নতাও এই কবিতার বিভিন্ন স্তবকে প্রতিভাত। কবির 'বঙ্গভাষা', 'বঙ্গভূমির প্রতি'– এসব কবিতার মর্মার্থের সাথে এ কবিতার ভাবের মিল থাকলেও এখানে ভাষা বা দেশাত্মবোধের চেয়ে মুখ্য হয়েছে ব্যক্তির অন্তরগত অভিঘাত, যা ব্যক্তি হয়ে সমষ্টির একান্ত মানসকে স্পর্শ করেছে।

'প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে কি ফল লাভিলি?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি?
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি– এবে রে পরাণ কাঁদে!

সাত স্তবকের কবিতায় আশার ছলনা, প্রমত্ত মনের তৃষ্ণা, স্বপ্নের কুহক, প্রেমের ফাঁদ, অর্থ-অন্বেষণ, যশোলাভের বাসনা এবং শতমুক্তাধিক আয়ুর অপচয়– এসব শব্দভাষ্যে কবি অনিশ্চিত-অচিহ্নিত জীবনের হাহাকার এবং আধুনিক অবিমৃষ্য জীবনের সারাৎসারকে তুলে এনেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। সুচিন্তা ও সুপরিকল্পনা ব্যতিরেকে কেবল ধোঁয়াসার মতো স্বপ্নের পথে ছুটে যে প্রাপ্তির পাল্লা শূন্য থেকে যায় এবং মাঝখানে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, এই চৈতন্য-'আত্ম-বিলাপ' কবিতায় অনুপম পরিভাষা পেয়েছে। কবিতাটির শেষ স্তবক এমন :

'মুকতা ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্ পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক–ছলে!'

নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, ভাঙ্গনে-বিভ্রমে পর্যুদস্ত হলেও মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে যা করেছেন, তা অতুলনীয় এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত। অত্যধিক বাসনার ফলে একসময় তাঁর কাছে অন্য ভাষার সাহিত্য মহান বলে গণ্য হলেও তিনি সাহিত্যজীবনের প্রায় সর্বাংশ-জুড়ে বাংলা সাহিত্য নিয়েই খেটেছেন এবং সুকোমল বাংলা ভাষাকে অনুভব করেছেন হৃদয় দিয়ে এবং তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিভিন্ন লেখার ছত্রে ছত্রে। এখানে বাংলাভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগের কিঞ্চিৎ কথকতা তুলে ধরছি: 'যদি আমি মেঘ রূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞাত তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে সুকোমল মাতৃভাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ যে তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।'

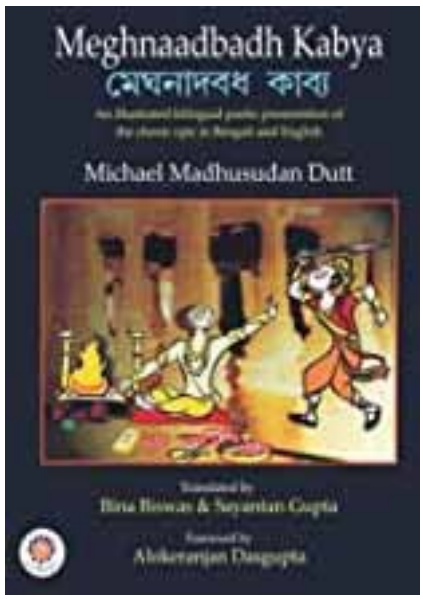

বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের অন্যতম প্রতিভূ মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বর্ণছোঁয়ায় আধুনিকতার পথে অগ্রবর্তী হয়েছে বাংলা কবিতা তথা বাংলা সাহিত্য। এটি সম্ভব হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের সুবাদে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ভাষা ও প্রকরণ কেমন হওয়া উচিত তা যথার্থরূপে তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যার ফলে পাল্টে গিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের দৃশ্যপট। সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন কবি-লেখকের বিভিন্ন নিরীক্ষা সত্ত্বেও মধুসূদনের হাতে বাংলা সাহিত্যের যে বাঁকবদল ঘটেছে, বোধ করি অন্য কারও দ্বারা সাহিত্যের এতটা পরিবর্তন সূচিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় তিনি যেমন অনিবার্য তেমনি বাংলা সাহিত্য অনুধাবনেও তাঁর কাব্য ও নাটক অবশ্য পাঠ্য। ভাষার আবর্তন-বিবর্তন প্রক্রিয়া অনুধাবনে একজন কবির জন্য যেমন মধুসূদন পাঠ জরুরি, তেমনি তাঁর সৃজন-কৌশল, জীবন ও সাহিত্য-কীর্তির নতুন নতুন তথ্য ও বিবৃতি উদ্ভাবনের মাঝে আজও সাহিত্যমোদীদের কাঙ্ক্ষিত রসদ রয়েছে।

মধুসূদনের জন্মের দুইশত বছর পূর্তি হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। চর্চা-পরিচর্যার মাধ্যমে এই মহান কবির সৃজন প্রতিভা ও সম্পন্নতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলেই তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ পাবে। আর এই চর্চা প্রয়োজন আমাদের নিজের জন্য, প্রয়োজন সমাজ ও সাহিত্যের প্রগতির জন্য।

কবি মধুসূদন রচিত একটি ইংরেজি কবিতার প্রথম স্তবক উপস্থাপনপূর্বক রচনা শেষ করছি।

This heart, dear maid ! that those sweet eyes
Have Conquered long ago,
Say, How can in rebellion rise
Against it's sovereign now?

পারভিন এতেসামির কাব্যে আধুনিকতা ও বিষয়বৈচিত্র্য

ড. তাহমিনা বেগম

ইরানের সাহিত্য আধুনিকতায় সম্প্রসারিত এবং সমাদৃত হতে দেখা যায় মূলত বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। সাংবিধানিক অধিকার আন্দোলন এই আধুনিক ধারাবাহিকতার একটি নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে। ইরানি তথা ফারসি কাব্য সাহিত্যকে দুটি ধারায় বিন্যাস করে, তা হলো ক্ল্যাসিক ও আধুনিক। এ সময় পাশ্চাত্যের প্রভাবে নতুন নতুন বিষয় ফারসি সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এগুলো হচ্ছে : স্বাধীনতার চেতনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাস, রাজনৈতিক সমঅধিকার চিন্তা, স্বাধীনতা চেতনার সমস্যা এবং সংবাদপত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম এবং অবৈধ বিদেশিদের অনুপ্রবেশের প্রতি ঘৃণা। এসব বিষয় গদ্য এবং পদ্য উভয় শাখায় ফারসি সাহিত্যকে উজ্জ্বল করেছে। পূর্ববর্তী সাহিত্য সাধারণ মানুষের জীবনবোধ ও রুচিবোধ থেকে যতটা দূরে ছিল ক্রমান্বয়ে সামাজিক প্রয়োজন ও মানুষের সচেতনতায় সেখানে নতুনত্বের নানাবিধ বিষয়ের উপস্থাপনায় ফারসি সাহিত্য আধুনিকতার এক উদাহরণ হয়ে ওঠে। উপযুক্ত শব্দ ও বাক্যের বিন্যাস একে সর্বজনীন করে তোলে। এ সময়ের একজন শক্তিমান কবি যিনি একই সাথে পুরাতন ও আধুনিকতাকে সাথে নিয়ে বিশ্বকে ফারসি সাহিত্যের নতুন দিগন্ত দিয়েছেন তিনি হলেন পারভিন এতেসামি। সাহিত্যে আধুনিকতায় বিষয় ও বৈচিত্র্যের সমন্বয় তাঁর কবিতাকে অনন্য করেছে, মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। হয়ে উঠেছেন তিনি সাধারণ মানুষের কবি।

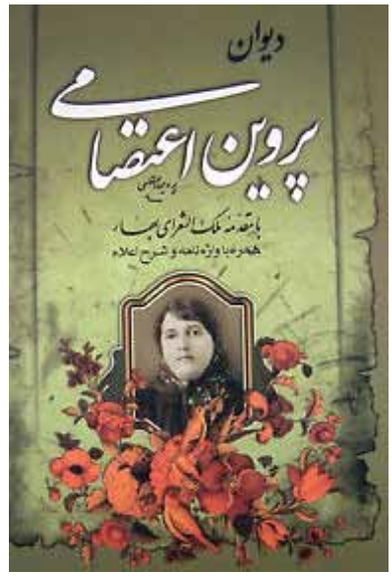

১৯০৭ সালে ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় তাবরিজ শহরে পারভিন এতেসামির জন্ম। বংশপরম্পরায় পারভিন মায়ের দিক থেকে আজারবাইজানি এবং বাবার দিক থেকে আশতিয়ানি ছিলেন। তাঁর পিতা ইউসুফ এতেসামি সমকালীন একজন বিখ্যাত জ্ঞানী, অনুবাদক ও লেখক হবার পাশাপাশি প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ছিলেন। মূলত বাবার সাহচর্যই পারভিনকে শৈশব থেকে আরম্ভ করে ফারসি পদ্য ও গদ্যবিষয়ক সম্যক জ্ঞানলাভে সহযোগিতা করে। পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকান গার্লস কলেজ থেকে ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষালাভ করেন। কলেজের বিদায় বেলায় প্রকাশিত স্মারকে পারভিনের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়– যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ কবিতার প্রথম দুটি লাইন ছিল ,

ای نهال آرزو خوش زی که بار آورده ای
غنچه بی باد صبا گل بی بهار آورده ای

'ফল বয়ে আনা এ আশার চারা গাছ সুখে থেক
হিমেল হাওয়া ছাড়াই কুঁড়িতে বিনা বসন্তেই এনেছ ফুল।'

আধুনিকতাকে বুকে ধারণ করা পারভিন ছিলেন স্বাধীনচেতা একজন কবি। ছাত্রজীবন হতেই পারভিনের ঝোঁক ছিল কবিতার প্রতি। ফলে যৌবনকাল কবিকে এক অনাড়ম্বর জীবন উপহার দেয়। সাহিত্য আসরে স্বরচিত কবিতাপাঠ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ তাঁকে নতুন বলয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তারুণ্যের উদ্দীপনায় সাহিত্য জীবন শুরু হলেও মাত্র ৩৫ বছরেই এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হয়েছিল এই কবিকে। স্বল্প বয়সেই এই কবি পাঁচ হাজার ছয়শ বেইত সম্বলিত *দিওয়ান* রচনা করে সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছেন।

শিল্পকে ধারণ করা কবি-জীবনের সাথে মিলেনি তাঁর চলার পথের সঙ্গীর মননশীলতা। ২৮ বছর সয়সে ১৯৩৪ সালে পেশায় সৈনিক আপন চাচাত ভাইয়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েও সংসারের শিল্পকলায় নিজেকে বাঁধতে পারেননি পারভিন। মাত্র তিন মাসেই বিচ্ছেদের মাধ্যমে একাকীত্বের পথ ধরেন এই কবি। ভালোবাসাময় যে সম্পর্ক বিয়ে তা কবিকে যন্ত্রণা, বঞ্চনা এবং বন্দিত্ব ব্যতীত কিছুই দিতে পারেনি। যা তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে প্রাণবন্তভাবে। কবি বলেন,

ای گل! تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟
جز سرزنش و بد سری خار چه دیدی؟

ای لعل دل افروز !تو با این همه پرتو
جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟

رفتی به چمن ، لیک قفس گشت نصیبت
غیر از قفس،ای مرغ گرفتارچه ، چه دیدی؟

হে পুষ্প, তুমি ফুলের আসরে কী দেখেছ?
কাঁটার রুক্ষতা আর ভর্ৎসনা ছাড়া কী দেখেছ?
বাগানে গমন করেছিলে কিন্তু ভাগ্যে জুটেছে খাঁচা
ওহে বন্দিনী পাখি! ফুলবনে ঢুকে কী দেখেছ?

পারভিনের *দিওয়ানে* কাসিদা, মসনবি ও কেতআসহ বিভিন্ন ধরনের কবিতা স্থান পেয়েছে। সমাজ ও সমাজের মানুষের বিভিন্ন চিত্র, যেমন : নারী, শিশু, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের দাবি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। একই সাথে নৈতিক শিক্ষার বিষয় ও সৎকর্মের অনুপ্রেরণাও তাঁর কবিতাকে অলংকৃত করেছে। আধুনিক বিষয়ের সাথে ইত্যকার বিষয়াবলি মানুষের মনের খোরাক জুগিয়েছে।

ইরানের সমস্যাসঙ্কুল গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার ভেতরেই বেড়ে ওঠা একজন কবি পারভিন। সমকালীন অন্যান্য কবির মতো তাঁর কবিতাতেও শ্বাসরুদ্ধকর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক নানা অসঙ্গতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সহজেই। পারভিন এতেসামি আত্মিক সৌন্দর্য এবং চিন্তার দৃঢ়তার মাধ্যমে এসব ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

পারভিনের কবিতার বিষয়বস্তু এবং কাব্যভাবনা যদিও আধুনিক ভাবধারায় রচিত তবুও তাঁর কাব্যসাহিত্যে চিরায়ত ধারার অনুসরণই দৃশ্যমান। তাঁর কবিতায় অনেক নামকরা কবিদের অনুকরণ দেখতে পাওয়া যায় যার মধ্যে নাসের খসরু, শেখ সাদি অন্যতম। অপরদিকে তাঁর কবিতায় অন্তর্নিহিত অর্থের দিক থেকে আরেফ ও সাধকগণের চিন্তারও সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। যা কবির আধুনিক কবিতায় একটি স্বতন্ত্র ভাব এনে দিয়েছে।

পারভিন যেমন নিপীড়ন, বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার তেমনি নির্দয় অর্থশালী, বিত্তবান অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। স্বৈরাচারী অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এবং মানবতার পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান। তাই পারভিনের চোখ নিপীড়িত মানুষের রক্তে গড়া রাজার রাজমুকুট ও সিংহাসনে মূলত বঞ্চিত মানুষের ঘামই চিকচিক করে জ্বলতে দেখে,

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق ز هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم:
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟

آن یک جواب داد:چه دانیم ماکه چیست؟
پیداست آن قدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیر زنی کوژ پشت و گفت
این اشک دیدهٔ من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سال هاست که با گله آشناس

একদা রাস্তা দিয়ে রাজা চলে যায়,
প্রতিটি অলি-গলি ও ছাদ থেকে ভেসে আসে ফরিয়াদ।
একটি অনাথ শিশু বলে ওঠে,
'রাজার মাথায় অমন মুক্তোর মতো কী সে চমকায়?'
অন্যজন স্বর তোলে, 'বলতে পারি না–
তবে জানি মূল্যবান বস্তু এক, তাই জ্বলে কি না!'
বৃদ্ধা এক ছুটে এসে বলে,
'ওটাতো আমার অশ্রু, তোমাদের রক্তের কণিকা
সমস্ত জমাট হয়ে রাজার পাগড়ি মাঝে জ্বলে।'
যেমন ভেড়ার দলে বাঘ এসে ভেড়া শেষ করে।

নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয় আধুনিক কবি পারভিনকে। যিনি সমাজে নারীর অবস্থা এবং মর্যাদা সম্পর্কে দৃঢ়তার সাথে কলম ধরেছেন। *ফেরেশতায়ে উনস* বা মায়ের ফেরেশতা নামের কবিতায় কবি মাকে একজন ফেরেশতার সাথে তুলনা করেছেন। অক্সিজেনবিহীন মানুষ যেমন নিষ্প্রাণ তেমনি নারীবিহীন একটি পরিবার। দৈহিক দিক থেকে নারীরা পুরুষদের অপেক্ষা দুর্বল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। এরপরও পারিবারিক জীবনে মায়ের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন,

در آن سرای که زن نیست ، انس و شفقت نیست
در آن وجود که دل مرد مرده است روان

به هیچ مبحث و دیباچه ای، قضا ننوشت
برای مرد کمال و برای زن نقصان

যে ঘরে নারী নেই, সেখানে প্রেম-মায়ার চিহ্ন নেই
যে দেহে মনের মৃত্যু হয়েছে, সেতো নিসাড় নিষ্প্রাণ।
কোথাও, কোন ভূমিকায় ভাগ্যলিপি এমন কথা লিখেনি
পুরুষের জন্য পূর্ণতা আর নারীর ভাগ্যে ত্রুটি-অপূর্ণতা।

শিক্ষা একটি জাতিকে উন্নত করে তোলে। এরপরও সমাজব্যবস্থায় এর অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় প্রবলভাবে। নারী-পুরুষ সকলের জন্যই শিক্ষা অপরিহার্য তবুও পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের শিক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকার দৃশ্য খুব সহজেই দৃষ্টি কাড়ে। যেখানে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে নারী সেখানে নারীদের এহেন দুরবস্থা সত্যিই ভাবার মতো। সমাজে বসবাসরত প্রতিটি মানুষের উচিত স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। একজন নারী যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সমাজের উন্নতি কোনভাবেই সম্ভব নয়। পারভিন এতেসামি নারীদের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, একটি জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন পুরুষের পাশাপাশি নারীও শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হবে। তিনি নারীদেরকে যার যার অবস্থানে থেকে শিক্ষা বা জ্ঞান আহরণের প্রতি উৎসাহিত করেন। শিক্ষার আলো ব্যতীত মানুষের জীবন অন্ধ। কবির ভাষায় উচ্চারিত হয়,

پستی نسوان ایران جمله از بی دانشی است
مردیازن برتری و رتبت از دانستن است
به که هر دختر بداند قدر علم آموختن
تا نگوید کس پسر هشیار و دختر کودن است.

ইরানের নারীদের হীনমন্যতা, সম্পূর্ণ জ্ঞানহীনতার কারণ
পুরুষ অথবা নারীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা জ্ঞানেরই অবদান
যদি প্রতিটি মেয়ে জ্ঞান শিক্ষার মর্যাদা জানত
তবে কেউ বলত না যে, পুরুষ বুদ্ধিমান ও নারী বোকা।

'শিশু' মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম। শিশুরা কোমলমতি স্বভাবের। ছোট্ট মনের পৃথিবীতে তাদের রয়েছে আলাদা এক ভূবন, যেটা খুব সহজ-সরল, হৃদ্যতা আর কল্পনা, কৌতুহল আর অনুভূতিতে ভরা। সকল শিশুই ভালবাসাপ্রিয়, তারা একদিকে যেমন বাবা-মার ভালবাসার প্রত্যাশী, অন্যদিকে তাদের আকাঙ্ক্ষা যেন মাঠে-ঘাটে, স্কুলে সকলেই তাদের স্নেহ করে। কিন্তু পিতৃহীন এক শিশুর রোনাজারি তার মায়ের মনকে বেদনায় নীল করে দেয়। বাবা না থাকাটা যেন এক অপরাধ। কবির ব্যথিত মন এই শিশুর কষ্টে প্রশ্ন রাখে, পৃথিবীর বুকে শিশুর অপরাধ কোথায়? কেন সে অন্য বাচ্চাদের

মতো নয়? এমনি এক অশ্রুভরা শিশুর কাহিনী কবি পারভিন এভাবেই বর্ণনা করেন,

دی، کودکی به دامن مادر گریست
کز کودکان کوی به من کس نظر نداشت
طفلی مرا ز پهلوی خود بیگانه راند
آن تیر طعنه، زخم کم از نیشتر نداشت
اطفال را به صحبت من، از چه میل نیست
کودک مگر نبود، کسی کاو پدر نداشت
امروز، اوستاد به درسم نگه نکرد
مانا که رنج و سعی فقیران، ثمر نداشت
دیروز، در میانهٔ بازی، ز کودکان
آن شاه شد که جامهء خلقان به بر نداشت
من در خیال موزه، بسی اشک ریختم
این اشک و آرزو، ز چه هر گز اثر نداشت؟
جز من، میان این گل و باران کسی نبود
کو موزه ای به پا و کلاهی به سر نداشت
آخر تفاوت من و طفلان شهر چیست؟
آیین کودکی، ره و رسم دگر نداشت؟
هرگز درون مطبخ ما هیزمی نسوخت
وین شمع، روشنایی ازاین بیشتر نداشت
همسایگان ما بره و مرغ می خورند
کس جز من و تو، قوت ز خون جگر نداشت
بر وصله های پیرهنم خنده می کنند
دینار و درهمی، پدر من مگر نداشت؟

গতরাতে এক ছেলে মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে
কেঁদে কেঁদে নালিশ করল, 'মা!
পাড়ার ছেলেরা আমার দিকে তাকায়নি কেউ
আমাকে করেনি তাদের খেলার সাথি।
সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে একটি ছেলে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে
তার পাশে থেকে। তার ভর্ৎসনা
তীর-বর্শার চেয়েও তীক্ষ্ণ বিষাক্ত ছিল।
ছেলেরা আমার সাথে কথা বলতে চায় না কেন মা?
তাহলে কি যার বাবা বেঁচে নেই, ছেলে হিসেবে
গণ্য হওয়ার অধিকার তার নেই?
আজ ওস্তাদজি ক্লাসে আমার পড়া দেখেননি।
গরীব হওয়াতে পরিশ্রমের যেন কোন মূল্য নেই।
গতকালের খেলায় ছেলেদের মাঝে সেই 'রাজা' হলো
যার পরনে পুরনো কাপড় ছিল না।
আমি জুতার চিন্তায় অনেক অশ্রু ঝরালাম,
এই অশ্রু ও আকাঙ্ক্ষা কখনো কি প্রভাব ফেলবে না?
কাদা ও বৃষ্টির দিনে আমি ছাড়া এমন কেউ ছিল না,
যার পায়ে জুতা আর মাথায় টুপি ছিল না।
অবশেষে শহরের ছেলেদের সাথে আমার পার্থক্য কোথায়?
ছোট ছেলেদের নিয়মনীতির কি কোন বালাই নাই?
পাশের বাড়ির লোকেরা মুরগি-ভেড়া প্রতিদিন খায়
কলিজার রক্ত চুষে বাঁচি আমি আর তুমি ছাড়া এমন তো কেউ নেই।
আমার জামার সেলাই দেখে তারা হাসাহাসি করে
দিনার-দিরহাম বলতে আমার বাবার কি কিছুই ছিল না?'

সমাজে ধনী-গরীবের বৈষম্য যত বেশি হয় সামাজিক অস্থিরতাও তত বেড়ে যায়। একদিকে ধনীদের বিত্ত-বৈভব ও বিলাসিতাপূর্ণ জীবন অন্যদিকে হত-দরিদ্রদের ছিন্নবস্ত্র-অনাহারক্লিষ্ট জীবন। একদিকে ধনীদের প্রাসাদ-অট্টালিকা, অন্যদিকে গরীবদের কুঁড়ে ঘর অথবা গাছের নিচে কিংবা পথে প্রান্তরে ঠিকানাবিহীন জীবন। একদিকে বহু মূল্য সুদৃশ্য বেশভূষার চমক এবং রকমারি খাদ্যের বাহারি আয়োজন অপরদিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, ক্ষুধিত মানুষের অশ্রুসজল মলিনমুখ। একদিকে জীবনকে সুন্দর করার স্বপ্ন এবং অন্যদিকে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনাহারী মানুষদের এক মুঠো অন্নের সন্ধানে আমৃত্যু সংগ্রাম। পারভিন এতেসামি মানুষকে পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি পরিহার করে সমাজের এতিম, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, ক্ষুধিত মানুষদের দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকানোর জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। কবির ভাষায়,

به سر خاک پدر، دخترکی — صورت و سینه به ناخن می خست
که نه پیوند و نه مادر دارم — کاش روحم به پدر می پیوست
گریه ام بهر پدر نیست که او — مرد و از رنج تهیدستی رست
زان کنم گریه که اندر یم بخت — دام بر هر طرف انداخت گسست
شصت سال آفت این دریا دید — هیچ ماهیش نیافتاد به شست
پدرم مرد ز بی دارویی — و اندرین کوی، سه داروگر هست
دل مسکینم از این غم بگداخت — که طبیبیش به بالین ننشست
سوی همسایه پی نان رفتم — تا مرا دید، در خانه ببست
همه دیدند که افتاده ز پای — لیک روزی نگرفتندش دست
آب دادم به پدر چون نان خواست — دیشب از دیدهء من آتش جست
هم قبا داشت ثریا هم کفش — دل من بود که ایام شکست
این همه بخل چرا کرد، مگر — من چه می خواستم از گیتی پست؟
سیم و زر بود، خدایی گر بود — آه از این آدمی دیو پرست!

পিতার কবরের পাশে এক ছোট্ট বালিকা
নখের আঁচড়ে বুক আর মুখ বিক্ষত করছিল।
'নেই কোনো আত্মীয়, নেই আমার মা
হায় আমার প্রাণ যদি বাবার কাছে উড়ে যেত।
আমার কান্না বাবার জন্য নয়। কারণ, তিনি তো
মরে বেঁচে গেছেন অভাবের যন্ত্রণা হতে।
কাঁদছি- কারণ, ভাগ্যের বিশাল সাগরে
যতদিন জাল ফেলেছি ছিঁড়ে গেছে বারে বাবে।
তিনি (পিতা) ষাট বছর এ (ভাগ্যের) সাগরের দুর্বিপাক দেখেছেন,
এর (সাগরের) কোনো মাছই ধরা পড়েনি বড়শিতে।
বাবা আমার মারা গেছেন বিনা ঔষধে, বিনা চিকিৎসায়
অথচ তিনজন চিকিৎসক আমাদের পাড়ায় ছিল বিদ্যমান
জানেন কি? আমার হতভাগা হৃদয় কাঁদছে কেন?
অসুস্থ বাবার শিয়রে আসেনি ডাক্তার কোনো
পড়শির কাছে গিয়েছিলাম আমি রুটির খোঁজে

আমাকে দেখে দুয়ার আটকে দিল অবজ্ঞা করে,
সবাই দেখেছে, তিনি পড়ে আছেন, অসহায় নিরুপায়
আসেনি কেউ দু'হাত বাড়িয়ে, হয়নি তাঁর সহায়।
রুটি চেয়েছিলেন বাবা, আমি দিয়েছিলাম পানি
গত রাত ভর জ্বলেছে সেই দুঃখের অগ্নি।
সুরাইয়ার তো জামাও ছিল তার পায়ে জুতাও ছিল
এই জগতে বঞ্চিত কেবল আমিই, আমার কপাল মন্দ ছিল।
এই সকল কার্পণ্য কেন করল? তবে
আমি হীন ধরণির কাছে কি চেয়েছি?
খোদার কর্ম যদি করত স্বর্ণ-রৌপ্যের তো কমতি নেই
হায়! (যদি) এ দৈত্য স্বভাবের মানুষ হতে রেহাই পেতাম।'

আধুনিকায়ন বিশ্বসাহিত্যে মানুষের হৃদয়কে বিশেষভাবে পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। এমনকি মানুষের যাপিত জীবনকে খুব কাছ থেকে মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়। পারভিন ছিলেন পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে সমধিক পরিচিত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে বেড়ে ওঠা এই কবির কবিতায় তৎকালীন বিশ্বব্যাপী সাহিত্যিক বিপ্লবের ধারার নিদর্শন দেখা যায়। এ জাতীয় কবিতার মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেন,

اگر فلاطن و سقراط، بوده اند بزرگ
بزرگ بوده پرستار خردیِ ایشان
به گهوارهٔ مادر، به کودکی بس خفت
سپس به مکتب حکمت، حکیم شد لقمان
وظیفهٔ زن و مرد، ای حکیم دانی چیست
یکی ست کشتی و آن دیگری کشتیبان
چو نا خداست خردمند و کشتی اش محکم
دگر چه باک ز امواج و رطبه و طوفان

প্লেটো-সক্রেটিস যদি মহান ছিলেন, শৈশবে তাঁদের
লালন পালন করেছে যে সেই তো মহান নির্দ্বিধায়
মায়ের দোলনায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটি শিশু
জ্ঞান-মনীষার পাঠশালায় পড়ে হয়েছেন লোকমান হাকিম।
ওহে জ্ঞানী, জান কি নারী ও পুরুষের দায়িত্ব কী?
একজন হলো জাহাজ আর একজন কাপ্তান।
কাপ্তান যদি বিজ্ঞ হয় আর জাহাজ মজবুত
তুফান, তরঙ্গের শঙ্কা কিসের? তুমি নির্ভয়।

পারভিনের কাব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেহ ও আত্মা। তাঁর দৃষ্টিতে, মানুষের আত্মাই হচ্ছে মৌলিক বস্তু। মানুষের রূহ বা আত্মাকে মুখ্য বিষয় এবং দেহকে আনুষাঙ্গিক বিষয় হিসেবে অভিহিত করেন। হিংসা-বিদ্বেষ ও লোভ-লালসা প্রভৃতি অসৎ গুণাবলি মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে। কেননা, সুখ ও দুঃখ সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে, তাই সবই একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভরশীল। দেহ ও প্রাণের আবেদনের সমন্বয়ে তিনি উপমা ও রূপকের মাধ্যমে কবিতাতে সংযোজন করেন।

পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় মানুষকে অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। পারভিনের দৃষ্টিতে, পার্থিব জীবন হচ্ছে ব্যবসার মতো লাভ-ক্ষতি নিয়েই একটি জীবন। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হয় আবার কেউ লাভ নিয়ে এগিয়ে থাকে। বস্তুবাদী এ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস পরিত্যাগ ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখার উপদেশ দিয়েছেন তিনি। কুরআনে কারিমের বিভিন্ন কাহিনী কাব্যাকারে উপস্থাপনের মাধ্যমেও কিছু শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকি তাঁর *দিওয়ানে* হজরত মূসা (আ.) ও ফেরআউনের কাহিনীও অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এর কিয়দংশ তুলে ধরা হলো :

مادر موسی، چو موسی را به نیل
خودزساحل کرد با حسرت نگاه
گر فراموشت کند لطف خدای
گر نیارد ایزد پاکت به یاد
وحی آمد کاین چه فکر باطل است؟
پردهٔ شک را بر انداز از میان
ما گرفتیم آنچه را انداختی
در تو،تنها عشق و مهر مادری ست
نیست بازی، کار حق، خودرا مباز

در فکند، از گفتهٔ رب جلیل
گفت کای فرزند خرد بی گناه!
چون رهی زین کشتی بی نا خدای؟
آب ، خاکت را دهد ناگه به باد
رهرو ما اینک اندر منزل است
تا ببینی سود کردی یا زیان
دست حق را دیدی و نشناختی
شیوهٔ ما، عدل و بنده پر و ری ست
آنچه بردیم از تو، باز آریم باز

মূসার মা যখন আল্লাহর হুকুমে
মূসাকে ফেলে দিলেন নীল নদে।
নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ভীষণ মর্মপীড়ায়
বলল: 'হে আমার নিষ্পাপ শিশু!
আল্লাহর দয়া যদি ভুলে যায় তোমার কথা
মাঝি-মাল্লাহীন এ ডিঙি থেকে কীভাবে রক্ষা পাবে?
মহান রব যদি তোমাকে রহমতের ছায়া না দেন
পানি তোমার সর্বনাশ ঘটাবে, অস্তিত্ব করবে বিপন্ন।'
অহি আসল, 'এ কেমন বাজে কল্পনা তোমার
আমার পথিক তো এখন পৌঁছেছে তার গন্তব্য।
সংশয়ের পর্দা তুলে নাও সম্মুখ হতে এবার
তাহলেই দেখতে পাবে মুনাফা করেছ না লোকসান।
তুমি ফেলেছ যা, আমি তা তুলে নিয়েছি
আল্লাহর হাত দেখেছ কিন্তু চেননি তা।
তোমার মাঝে রয়েছে শুধু মায়ের স্নেহ ও মমতা
আমার নীতি ইনসাফ ও বান্দার প্রতিপালন।
আল্লাহর কাজ খেল তামাশা নয়, প্রতারিত হয়ো না নিজে
তোমার কাছ থেকে যা নিয়েছি, ফিরিয়ে দেব তোমার কাছে।'

নৈতিক অধঃপতন একটি সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। ক্ষণস্থায়ী এই পার্থিব জগৎ হিংসা-বিদ্বেষ ও লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ। একমাত্র সঠিক জ্ঞানই পারে ভুল হতে দূরে সরিয়ে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের দিকে ধাবিত করতে। মানবজীবন পুনর্গঠনে নৈতিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়সমূহের অবতারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারভিন এতেসামি তাঁর কবিতায় সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনের শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরে বলেন,

مشو خود بین، که نیکی با فقیران
زمحتاجان خبر گیر، ای که داری
به وقت بخشش و انفاق، پروین

نخستین فرض بوده ست اغنیارا
چراغ دولت و گنج غنا را
نباید داشت در دل جز خدارا

আত্মঅহংকারী হয়ো না, দরিদ্রদের প্রতি কল্যাণকামী হও
ধনীদের এটাই প্রধান করণীয় তাদের প্রতি।
অভাবীদের খবর নাও, হে সম্পদশালী!
ধনীর ধনভাণ্ডার এতে নিয়োজিত কর।
বদান্যতা ও দানের ক্ষেত্রে হে পারভিন!
আল্লাহর ভয় ছাড়া কোনো কিছু স্থান দিও না হৃদয়ে।

মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির চাহিদার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যে যত পায় সে তত বেশি পেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রাপ্তির পাহাড়ও মানুষকে সুখ-শান্তি দিতে সক্ষম নয়। প্রকৃত সুখ নির্ভর করে অল্পে তুষ্টির উপর। এমনকি পার্থিব বিষয়ে মানুষ যদি অপেক্ষাকৃত কম বিত্তবানদের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং নিজের প্রাপ্ত সম্পদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে সেই প্রকৃত ধনী, সেই সুখী। আধুনিক এই কবি পারভিন এ জাতীয় লোভ থেকে দূরে থেকে সন্তুষ্টচিত্তে জীবন অতিবাহিত করার শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর লেখনীতে। তিনি বলেন,

کار مده نفس تبه کار را در صف گل جا مده این خار را
جرخ و زمین بندهٔ تدبیر توست بنده مشو درهم و دینار را
همسر پرهیز نگردد طمع باهنر انباز مکن عار را

বিনাশী প্রবৃত্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করো না
পুষ্পের সারিতে এ কাঁটাকে স্থান দিও না।
পৃথিবী ও গতিশীল জীবন সবই তোমার অধীনে
তুমি দিরহাম ও দিনারের গোলামে পরিণত হয়ো না।
পরহেজগারের স্ত্রী কখনো লোভী হয় না
শিল্পের সাহচর্য লাভে সঙ্কোচ করো না।

ফারসি কাব্যচর্চায় সমকালীন এই মহিলা কবি মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে ১৯৪১ সালে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আধুনিকতার সমন্বয়ে বৈচিত্র্যময় অনুভূতি খুবই হৃদয়গ্রাহীভাবে তিনি সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। পিতার কবরের পাশে কোম শহরে তাঁকে সমহিত করা হয়। তাঁর কবরের ওপর খোদাই করে লিপিবদ্ধ রয়েছে–

این که خاک سیهش بالین است اختر چرخ ادب، پروین است
گر چه جز تلخی از ایام ندید هر چه خواهی، سخنش شیرین است
صاحب آن همه گفتار، امروز سائل فاتحه و یاسین است
دوستان به که ز وی یاد کنند دل بی دوست، دلی غمگین است
خاک در دیده، بسی جانفرساست سنگ بر سینه، بسی سنگین است
بیند این بستر و عبرت گیرد هر که را چشم حقیقت بین است
هر که باشی و ز هر جا برسی آخرین منزل هستی این است
آدمی هر چه توانگر باشد چون بدین نقطه رسد، مسکین است
اندر آنجا که قضا حمله کند چاره، تسلیم و ادب، تمکین است
زادن و کشتن و پنهان کردن دهررا رسد و ره دیرین است
خرم آن کس که دراین محنت گاه خاطری را سبب تسکین است

কালো মৃত্তিকা আজ যার শিয়রের ঠিকানা
সাহিত্যাকাশের নক্ষত্র সে সপ্তর্ষি।
জীবনকালে যদিও জোটেনি তিক্ততা ছাড়া কিছু
যতই চাইবে তার কথায় পাবে মধু অপার।
এতসব কথার শিল্পী যিনি, তিনি তো আজ
সূরা ফাতেহা ও ইয়াসিনের কাঙ্গাল।
বন্ধুদের জন্য উত্তম হবে, যদি তাকে স্মরণ করেন কবরে
বন্ধুহীন অন্তর সে তো চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়।
চোখের ওপরে চাপা মাটি বড় হৃদয়বিদারক
বুকের ওপর চাপা এ পাষাণ অসহনীয় সংহারক।
দেখুক এ বিছানা, উপদেশ নিয়ে যাক
সত্যকে দেখার চোখ যার আছে, উপলব্ধি করুক।
যে-ই হও, আর যেখানেই যাও বা আস
জীবন-জগতের শেষ মনযিল এইতো ঠিকানা।
মানুষ যতই সম্পদশালী আর হোক ধনী
এখানে যখন আসে সে তো দরিদ্র ও মিসকীন।
নিয়তির বিধান হামলা করে সেখানে যখন
একমাত্র উপায় বিনয়, আনুগত্য, আল্লাহতে সমর্পণ।
জন্মদান, গুম করা আর প্রাণ হরণ
জগতের এ যে চিরায়ত নিয়ম, বিধির বাঁধন।
কষ্ট-ক্লেশের এই নিবাসে আনন্দিত শুধু সেই লোক
যার আছে প্রশান্তচিত্ত, হৃদয়ে আলোক।

পারভিন এতেসামির বাসগৃহ

কবিরা মানুষের হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশে দক্ষ শিল্পী। শিল্প বলতে মূলত কল্পনা ও রহস্যের সমন্বয়ে সৌন্দর্যতত্ত্বের আকৃতিতে সুশৃঙ্খল বর্ণনাকে বুঝায়। কবিতায় শিল্প হচ্ছে কল্পনা, রহস্য এবং ভাষার সমন্বয় সাধন। শিল্পের অভ্যন্তরীণ সেই নির্দিষ্ট ভাষা ঐ শিল্পীর বিশেষ ভাষা হিসেবে পরিগণিত। পারভিনের কাব্যের মধ্যেও দেখা যায় কল্পনা, রহস্য এবং ভাষার সমন্বয়ে মূল বক্তব্য বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে গভীর থেকে গভীরতার দিকে ধাবিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্যের সাবলীল ভাষা ও গতিশীলতা হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ ও ঝংকার সৃষ্টি করে পাঠককুলে। মানবতাবাদী এই মহান কবি সর্বান্তকরণে মানুষের তরে সাহিত্যচর্চা করেছেন যেখানে আধুনিকতায় বৈচিত্র্যময় আবেগ-অনুভূতি ও কল্পনার গাঁথুনী তাঁর কাব্যমানকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতা শুধু ইরানেই নয়; বর্তমান বিশ্বের নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে যুগান্তকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ। পারভিন এতেসামি স্বীয় রচনার মাধ্যমে পাঠককুলের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অনন্তকাল।

লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় সংগীত

অনুবাদ : শেখ মোহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম

سر زد از افق مهر خاوران
فروغ دیده ی حق باوران
بهمن فر ایمان ماست
پیامت ای امام، استقلال، آزادی، نقش جان ماست
شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران

উদিত হলো দিগন্তে প্রাচ্যের সুরুজ
সত্যে বিশ্বাসীদের নয়নের দ্যুতি
বাহ্‌মান্ আমাদের ঈমানের রওনক্
হে ইমাম! বাণী তব স্বাধীনতা-মুক্তি মোদের জীবনের ছবি
হে শহীদান! তোমাদের আহ্বান বাজিতেছে যমানার কর্ণকুহরে
হও স্থায়ী ও অমর, হে
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান!

দিওয়ানে উবায়দি, গযল নম্বর ৩০

অনুবাদ : শেখ মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম

দেখো চেয়ে কীভাবে ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত হয়েছে এই বুস্তান
প্রতিটি পাতায় সমীরণ করেছে তার রহস্য স্থাপন
সকল কপটতা পরিবর্তিত হয়েছে নতুন বাহারে
এই সকল কপটতা তারই দ্বারা হয়েছে দূরীভূত
ইতিপূর্বে ফুলের এই মুখের হাসি কখনো লাগেনি জোড়া
সমীরণ তার কর্ণকুহরে এমনি কি বলেছে অমরত্ন
শিশির দ্বারা মাকড়শার জালগুলো
মুক্তার ছিদ্রের ন্যায় কতই না সুন্দর বন্ধনী
পতিত হও হে মেঘ বাঁশবনেরই খুশির অশ্রু হয়ে
ফুলের শাহের দোলনা যেন করেছে বাগানে প্রস্থান
ধরণীতে নব আইনের ঘটেছে উত্থান এবং বুস্তান
পাখির সুমিষ্ট স্বরে ফুর্তিতে হয়েছে মাতোয়ারা
এই নতুন বাহারে হে উবায়দি
কেউ কি এইভাবে শুনেছে কি কোন দাস্তান?

বিপ্লবের প্রতীক নিউজলেটার

সিরাজুল হক

[সাবেক সম্পাদক, নিউজলেটার।]

কালকালান্তরে চলেছ তুমি বহন করে হাজারো স্মৃতি
চলেছ তুমি হে *নিউজলেটার*! বহন করে মানুষের প্রীতি।
তোমার রঙিন পাতায় পাতায় রয়েছে কত সুপ্ত ইতিহাস
জীবন্ত হয়ে উঠেছে কত মহাবিপ্লবের স্নিগ্ধ সুবাতাস।

ইমামের দানের ফসল তুমি আজ ঘরে ঘরে শোভা পাও
বিচিত্র পুষ্পের সৌরভ যেন চারিদিকে ছড়িয়ে দাও।
জ্ঞান-মনীষা-ধর্ম-সংস্কৃতি শিল্পকলার অপূর্ব সমাহার
প্রতিটি পত্রে হচ্ছে রচিত যেন সুশোভিত মুক্তার হার।

হাফেজ সা'দী রুমী জামী খৈয়াম নিশাপুরী
ঘরে ঘরে বাঙলার বিলায়েছে যাঁরা প্রেমের গান ভূরিভূরি;
মহাবিপ্লবের মহাগাথা তুমি বিলায়েছ বাঙলার ঘরে ঘরে
ভুলবে না তোমার এই মহাদান রেখেছে সবাই স্বীয় অন্তরে।

তুমি কালোত্তীর্ণ কালের সাক্ষী মহাবিপ্লবের জাগরণী বাণী
তোমার কথা কী করে ভুলবে বাঙলার সুধী আর আছে যত জ্ঞানী।
নিউজলেটার! তুমি ঐক্যের প্রতীক, তুমি 'ফারভারদিনের' মিষ্টি মধুর বায়ু
স্রষ্টার কাছে এই প্রার্থনা দীর্ঘজীবী হোক তব আয়ু।

তুমি লক্ষ শহীদের পুণ্য ভূমি ইসলামী ইরানের প্রতীক
ছড়িয়ে দিবে আলোর মশাল বিশ্বের চারিদিক।
দু'টি দশক করেছি সেবা দিবস বিভাবরী এক ঠাঁই
নিরবচ্ছিন্ন সেই ক্লেশের তুলনা কিছুই যেনো নাই।
তবু ছিল মনে প্রগাঢ় শান্তি উৎফুল্ল নিশি-দিন
এমন দিন কি আসবে ফিরে
জীবনে এ অধমের আর কোনো দিন।

সভ্যতা বিনির্মাণে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানববিদ্যার ভূমিকা

[গত ১৩ মার্চ ২০২১ বাংলাদেশে অবস্থিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে 'সভ্যতা বিনির্মাণে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানববিদ্যার ভূমিকা' শীর্ষক একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে পঠিত প্রবন্ধসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিচে উপস্থাপিত হলো।]

সভ্যতা বিনির্মাণে তুলনামূলক সাহিত্যের ভূমিকা : জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে

অযাদেহ্ মেহেরপুইয়ান্
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ,
ভেলায়াত্ বিশ্ববিদ্যালয়, ইরান্‌শাহ্‌র্, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান

তুলনামূলক সাহিত্য স্বীয় উচ্চ সক্ষমতা ও ধারণ ক্ষমতার কারণে ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ধারণাকে সীমান্ত অতিক্রমী করে তোলে, আর এভাবেই তা বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে জাতীয় ও গোষ্ঠীগত পরিচিতির পুনরুজ্জীবনে ও উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পর্যায় পর্যন্ত সংস্কৃতিসমূহ ও সভ্যতাসমূহের ক্ষেত্রে তুলানমূলক সাহিত্য একটি অনন্য প্রভাবের অধিকারী। এ ধরনের সাহিত্য অন্যান্য মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি যোগাযোগ ও মত বিনিময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। অধিকন্তু এ ধরনের সাহিত্য বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তুলানমূলক সাহিত্যের বিশেষ ধরনের গতিশীলতা সংশ্লিষ্ট যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। এ ধরনের আন্দোলনকে জাতীয় ও গোষ্ঠীগত পর্যায়ের সাহিত্যে বিরল ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় তথা পুরনো জাতিসমূহের মধ্যে বীরত্বগাথা, রসরচনা, অনুবাদ ইত্যাদির বিনিময়ের ক্ষেত্রে এবং সেই সাথে বিশ্ব সাহিত্যের অবদানসমূহের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তুলনামূলক সাহিত্য সফরনামা, গল্পরচনা, প্রবন্ধ রচনা, ইতিহাস লিখন, জীবনচরিত ইত্যাদি আকারে জাতিসমূহের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। তাই তুলনামূলক সাহিত্যের ব্যবহার, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে এর উপস্থাপনা এবং সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিচিতির হেফাযত ও উন্নয়নসহ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পর্যায় পর্যন্ত তুলনামূলক সাহিত্যের গতিশীল ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

[ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ[১] করে উপস্থাপন করা হলো]

ইসলামি সভ্যতা বিকাশে আধুনিক ফারসি কাব্যের ভূমিকা

ড. তাহমিনা বেগম
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সৃষ্টিলগ্ন হতে পর্যায়ক্রমে নানাবিধ সভ্যতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সময়ের স্রোতে মানবতার উৎকর্ষ সাধনে প্রতিটি সভ্যতারই কিছু না

কিছু অবদান ছিল। মানবসৃষ্ট এ সভ্যতা বিশ্লেষণে যদিও দৃশ্যমান হয় প্রবৃত্তির চাহিদা তৈরির উপকরণ, যা কালক্রমে ভয়াবহতার চিহ্নবহ। অথচ মানবতার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজন একটি ত্রুটিমুক্ত, উন্নত ও সর্বজনীন সভ্যতার, যা মানবসৃষ্ট সভ্যতার উপকারী বিষয়গুলোর ধারক হওয়ার পাশাপাশি জনজীবনকে পরিশীলিত একটি জীবনের প্রতি প্রত্যক্ষ ইংগিত বহন করে। যা কেবল মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে ইসলামি সভ্যতার মাধ্যমেই প্রতিভাত হয়ে উঠবে। ইসলামি সভ্যতা ভৌগোলিক গণ্ডির সাথে, কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো মানব সম্প্রদায়ের মাঝে অথবা ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট বলয়ে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রভাব সর্বজনীন এবং বিশ্ববিস্তৃত। সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে চলেছে আদিকাল হতেই। ফারসি সাহিত্য একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য যার গুরুত্ব বহন করছে কবিতা। কবিতা এমন একটি শিল্প যেখানে স্বল্প শব্দ অধিক অর্থ বহন করে বিষয়কে স্পর্শকাতর করে তোলে। কবিতা তখন জীবনের কথা বলে। ইতিহাস ধারাবাহিকতায় কবিতায় প্রাচীন

বিষয়বস্তুর জায়গায় নতুনত্বের জন্ম হয়। এ লক্ষণ স্পষ্ট হয় উনিশ শতাব্দীর শেষার্ধ্ব থেকে এবং পূর্ণ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। আধুনিক ফারসি কবিতায় চলমান ঘটনাবহুল জীবন প্রকাশের পাশাপাশি উন্নত জীবন গঠনে নৈতিক মূল্যবোধের চিত্রায়ণ হয়েছে সাবলীলভাবে। ইসলামি সভ্যতা বিকাশে কবি-সাহিত্যিকেরা তাঁদের অনবদ্য অবদানের মাধ্যমে সাহিত্যকে উঁচু মর্যাদায় অভিহিত করেছেন। যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালনে দৃঢ়।

বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের অবদান

নাজমুল হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র

পুরো পৃথিবীতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অবদান বহুল আলোচিত বিষয় হিসেবে সমাদৃত। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বিশ্বে অবদান মধ্যযুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। আমরা বর্তমান পৃথিবীতে পশ্চিমা বিশ্বের যে সমৃদ্ধি দেখতে পাই তার পথ মূলত মুসলমানদের হাত ধরেই মধ্যযুগে সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিম মনীষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান অপরিসীম।

সভ্যতার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রকাশ

মোঃ আবদুল হামিদ মিয়া

বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ

আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খাবাসপুর, মানিকগঞ্জ

সভ্যতা-শান্তি আর সংস্কৃতি পাশাপাশি অবস্থান করে। যেখানেই রয়েছে সভ্যতা সেখানেই বিরাজ করে শান্তি। স্থিতিশীলতার পথে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয় সভ্যতা আর সংস্কৃতি। সভ্যতাই মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠি। যোগ্য মানুষগুলোই এ বিশ্ব সৃষ্টিজগৎকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে, দীর্ঘস্থায়ী হবে মানুষ্য বসতি। মহান স্রষ্টা এ বিশ্ব সৃষ্টিজগৎকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই গুণাবলির সঠিক ও যুগপোযোগী বহিঃপ্রকাশ ঘটানোই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাজ।

মানবিক সভ্যতার বিকাশে বাংলা গান

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃতির চলমান প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে প্রবহমাণ ধারার বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই সভ্যতার ভিত গড়ে ওঠে। তাই সংস্কৃতির মূল্যবোধভিত্তিক তরঙ্গের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে মানবিক সভ্যতার ইতিহাসে খানিকটা বাঁক-মোহনা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা-সংস্কৃতির মাধ্যম দিয়েই মানুষের মানবিক গুণের সমাহার ঘটে। এ প্রক্রিয়ায় বাংলার জনগোষ্ঠীর জীবন পরিক্রমায় মানবিক মূল্যবোধ তৈরিতে বাংলা গানের প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এই জনপদের মানুষের আবেগ অনুভূতির একটি বড় অংশ দখল করে আছে বাংলা গান। গানের কথা, সুর এবং গায়কীর মধ্য দিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই মানবসভ্যতার বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালিত হয়ে এসেছে। সময়ের সাথে সাথে গানের ধরন-ধারণ এবং গায়কীর উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সাধিত হলেও মানবিক সভ্যতার বিনির্মাণে সমভাবেই অবদান রেখে চলেছে বাংলা গান।

ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং তার অন্তরায়

অধ্যাপক ড. মো ওসমান গনী

সভাপতি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

বিশ্বের সম্মৃদ্ধতম সভ্যতাগুলোর অন্যতম হচ্ছে ইসলামি সভ্যতা। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের (৬১০ খ্রি.) মধ্য দিয়ে এই সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে। ইসলাম ধর্ম বিশ্বকে এমন এক সমৃদ্ধ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা উপহার দিয়েছে যা গোটা মানবজাতি বিশেষ করে মুসলমানদেরকে চির ঋণী করে রেখেছে। কিন্তু সমৃদ্ধ এই ইসলামি সভ্যতার অবদান সম্পর্কে বর্তমান তরুণ সমাজ খুব একটা অবহিত নয়। এ কারণে তরুণ সমাজসহ বিশ্বের জ্ঞান অন্বেষীদের জন্য ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে তুলে ধরার গুরুত্ব অপরিসীম।

নিজেদের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাও প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। পূর্বসূরিগণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে কোন্ পর্যায়ে এবং কোন্ অবস্থানে ছিলেন, সে সম্পর্কে জানতে পারলে সামনের দিকে পথচলা আরও সহজতর হয়। যা নতুন প্রজন্মের ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কারণ, উপনিবেশবাদীরা গত দুই শতাব্দী ধরে সব সময় বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী বিশেষ করে মুসলমানদের মৌলিকত্ব, মর্যাদা ও কর্মক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অন্য দেশগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো, প্রাচ্যের দেশ ও জাতিগুলোর নানা অর্জনকে অস্বীকার করে তাদের সব উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অর্জনকে নিজেদের অর্জন হিসেবে তুলে ধরা। পাশাপাশি মুসলমানদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঠেকানোও তাদের অশুভ উদ্দেশ্যের অংশ। তারা বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে উন্নত প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এখন তারা এই প্রযুক্তি ও শক্তি দিয়ে গোটা বিশ্বে নিজেদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

পাশ্চাত্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রাচ্যের উপর তাদের রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। তাদের এসব অপতৎপরতা মোকাবেলা করার জন্য ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস এবং এর অন্তরায়সমূহ তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

সভ্যতার বিকাশে ফেরদৌসি, রুমি ও শেখ সাদি'র কবিতা

ড. মো. কামাল উদ্দিন
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পারস্য সভ্যতা-সাহিত্য, ইতিহাস-সংস্কৃতি মানবেতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফারসি সাহিত্যের অন্তরলোকের মৌল চেতনার প্রভাব দেশ-কাল-ভাষাগত ও ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে। সাহিত্যলোকের আলোকচ্ছটায় বিভাষিত হয়ে ওঠে সভ্যতার নানা অনুষঙ্গ। ফারসি সাহিত্য ইতিহাসের পাতা অলঙ্কৃত হয় বৈচিত্র্যময় কাব্যের পরশে। ফেরদৌসি, রুমি, শেখ সাদি, হাফিজ, আত্তার, খৈয়াম ফারসি কাব্যকলার প্রোজ্জ্বল শৈল্পিক প্রতিভা। মানবিকতা, নান্দনিক চেতনা, শিল্পরূপ, চিত্রকলা, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাকার অনুষঙ্গে ভাস্বর ফারসি কবিতার অন্তরলোক; যা মানবসভ্যতার বিকাশে ঐতিহ্যময় ভূমিকা পালন করে এসেছে। ফেরদৌসির বীরত্বগাথা মহাকাব্য 'শাহনামা' পুনরুজ্জীবিত করে পারস্যের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা-সাহিত্যকে। সভ্যতার মূল উৎস জ্ঞান-প্রজ্ঞার শক্তি বর্ণনার মাধ্যমেই 'শাহনামা'র সূচনা। ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বীরত্বপূর্ণ শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে সঙ্গে মানবসৃষ্টি রহস্য, সত্য-সুন্দর ও ন্যায়ের জয়গান, প্রেমময় অনুভূতির চিত্রায়ণে 'শাহনামা'র কাব্যদ্যোতনা প্রাণময় হয়ে ওঠে। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির কাব্য মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন ভালোবাসার রূপায়িত শৈল্পিক অবয়ব। শাশ্বত প্রেমের এক অনুপম নিদর্শন তাঁর 'মসনবি' ও 'দিওয়ানে শামস তাবরিজি'। ঐশ্বিক প্রেমের অনুভূতি, পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, বৈষয়িক লোভ-লালসার প্রতি অনাগ্রহ, প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের বাসনা তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য। সত্য, সুন্দর, পরিশীলিত, সভ্য সমাজের বিকাশে তাঁর কবিতার প্রভাব প্রবল। শেখ সাদি ফারসি সাহিত্যের অপর এক প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র। গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় তাঁর সফল পদচারণা। মানুষের জীবনধারাকে পরিশীলিত ও উন্নত করার নৈতিক শিক্ষা তাঁর কাব্যের মূল সুর। শাসকশ্রেণি থেকে সাধারণের মনন মূল্যবোধ ও নান্দনিকতায় অনুপ্রাণিত হয় তাঁর কবিতার পরশে। মানবিক মূল্যবোধ ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রেরণায় তাঁর কবিতা মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করে।

ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারণা ও চেতনা

ড. মো. নূরে আলম
সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সভ্যতা হলো সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা যা সামাজিক শৃঙ্খলা, আইনি শাসন ও জনকল্যাণের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব লাভ করে। জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ফসল হচ্ছে সভ্যতা। পৃথিবীর সভ্যতাগুলোর মধ্যে ইসলামি সভ্যতা অন্যতম। ইসলাম ধর্মের আগমনের মধ্য দিয়ে এ সভ্যতার উৎপত্তি। ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির জনক হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)। পবিত্র চিন্তা-চেতনা ও যুক্তির উপর ভিত্তি করেই ইসলামি সভ্যতা গড়ে উঠেছে। ইসলামেই প্রকৃত সভ্যতা ও সংস্কৃতি লুকিয়ে রয়েছে। তরুণ সমাজসহ বিশ্বের জ্ঞান অন্বেষীদের জন্য ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামি সভ্যতায় জাতিগত বৈষম্য, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির স্থান নেই। এটি কোনো বিশেষ জাতি বা শ্রেণির সাথে সম্পর্কিত নয়। ইসলাম মানুষকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে ধাবিত করে। ইসলামি জ্ঞান-প্রজ্ঞাভিত্তিক শিক্ষা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের শিকড় উপড়ে ফেলেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। নিজ ব্যক্তিত্ব ও পরিচিতি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো স্বীয় অতীত সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞান লাভ। ইসলামি সভ্যতা হচ্ছে জীবন্ত ও গতিময় এক সভ্যতা যা সময়ের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। ইসলামি সভ্যতা বিভিন্ন ঘাত, প্রতিঘাত ও বিজাতীয় আগ্রাসনের মধ্যে পাশ্চাত্যের কাছে মাথা নত করে নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী নিজ নিজ সংস্কৃতি ও সভ্যতা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মুসলমানদের মৌলিকত্ব, মর্যাদা ও কর্মক্ষমতাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বুঝাতে চেষ্টা করেছে যে, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ধারণ করা ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো উপায় নেই। মুসলমানদের সব উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অর্জনকে নিজেদের বলে চালিয়ে দেয়াও পাশ্চাত্যের প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি মুসলমানদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঠেকানোও তাদের উদ্দেশ্যের অংশ। ইসলামি সভ্যতার মতো এত বিস্ময়কর সভ্যতা দ্বিতীয়টি নেই। ইসলাম যদি গতিময় না হতো এবং অন্যান্য সংস্কৃতিকে বিলীন করার চেষ্টা চালাত তাহলে ইসলামি সভ্যতা আরব ভূখণ্ডের গণ্ডি পেরোতে সক্ষম হতো না। এসব গুণের ফলেই ইসলাম এক শতাব্দীরও স্বল্প সময়ের মধ্যে অন্যান্য সভ্যতাকে আকৃষ্ট করে বিশাল এক সভ্যতায় পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফসল হচ্ছে সভ্য সমাজ। প্রতিটি মানুষের চারিত্রিক ও মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সভ্য সমাজ প্রয়োজন। যে সমাজ সামাজিক শৃঙ্খলা সাধন করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন, অগ্রগতি, মানবকল্যাণ ও মর্যাদার কথা ভাবে, মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রাধান্য দেয় সেই সমাজই সভ্য সমাজ। সুস্থ ধারার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে গতিশীল করা সম্ভব।

বাংলাদেশে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে বঙ্গবন্ধুর অবদান

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
সভাপতি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ বিশ্বের এশিয়া মহাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশভুক্ত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে মরুময় আরবে ইতিহাসের 'আইয়ামে জাহেলিয়া' তথা জেহালত বা অজ্ঞতার অন্ধকার যুগে বিশ্বমানবতার সামগ্রিক শান্তি, নিরাপত্তা ও মুক্তির লক্ষ্যে পবিত্র ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী এক শতকের মধ্যেই তৎকালীন বঙ্গীয় অঞ্চল ইসলামের সুমহান বাণী-বাহকদের পদধূলিতে ধন্য হয়

বলে ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদি রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আরব, পারস্য ও তুর্কি থেকে ইসলাম প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে সুফিয়ায়ে কেরাম এতদঞ্চলে আগমন করেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫ খ্রি.)-এর পূর্ব পুরুষগণও সুদূর ইরাক থেকে এদেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের কাজে; দরবেশ শেখ আউয়াল (রহ.) ছিলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন বংশধর। এছাড়া 'শেখ' কথাটিও ইসলামেরই প্রতিনিধিত্ব করে; কেননা, যাঁরা শুধু ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলে এসেছিলেন তাঁরাই 'শেখ' হিসেবে অভিহিত। সুতরাং আমরা দেখি নাম, উপাধি ও বংশ পরম্পরাগত ঐতিহ্যের দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধু কথায়-কাজে, আচার-আচরণে ও মনে-প্রাণে একজন খাঁটি মুসলিম ছিলেন। নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য আর অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত মূলনীতি; যা তিনি সর্বাবস্থায় আমৃত্যু অকপটে ধারণ করেছেন। তাঁর কীর্তিময় জীবন, অবিসংবাদিত নেতৃত্ব আর জনগণের উপর অবিশ্বাস্য প্রভাব বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের পাশাপাশি ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি যে অসাম্প্রদায়িক ও মানবিকতার বীজ বপন করেছিলেন, তা রাষ্ট্র-কাঠামো পরিচালনায় সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। বিশেষ করে ইসলামি মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধু সরকারের অনুকরণীয় পদক্ষেপসমূহ আজো এক্ষেত্রে যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্যও তিনি আবশ্যকীয় কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিশেষ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, কার্যক্রমে, বক্তৃতা-ভাষণে, আন্দোলন-সংগ্রামে আমরা তাঁর মাঝে ধর্মীয় চেতনার এক শাণিত রূপ দেখতে পাই।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, বৈষম্যের অবসান, জুলুমের প্রতিবাদ, সাম্য-মৈত্রীর জয়গান, অপরিসীম মানবপ্রেম, অসম সাহসিকতা, অকুতোভয় নেতৃত্বের গুণাবলি, হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা, জনগণের বিজয় প্রশ্নে আপোস না করা, সত্য-সততার স্থানকে কলুষিত করতে না দেয়া, আলেমদের সান্নিধ্যে গমন ও তাঁদের সাহচর্য গ্রহণসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এসব বৈশিষ্ট্যের পরতে পরতে তাঁর মাঝে আমরা আশৈশব বিরাজমান ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। এছাড়া বঙ্গবন্ধু রচিত ও অতি সাম্প্রতিক প্রকাশিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *আমার দেখা নয়াচীন* এবং *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থত্রয়েও তাঁর জীবনমানে ইসলামি চেতনা-সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নানা আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে।

সভ্যতা বিনির্মাণে শেখ সা'দীর *গুলিস্তান*

ড. মো. শফিউল্লাহ
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে সভ্যতার রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতায় মানুষ সাহিত্য পাঠের অবকাশ পায় না; কিন্তু সভ্যতার স্বরূপ, প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য সাহিত্য পাঠ অত্যাবশ্যক। সাহিত্যে সভ্যতা পালিত হয়। তাই সভ্যতার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জানতে সাহিত্য পাঠের বিকল্প নেই। মানবসভ্যতা বিনির্মাণে ও ক্রমবিকাশে সবচেয়ে বড় অবদান হলো সাহিত্যের। সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয় জাতির সংস্কৃতি ও সমাজ সভ্যতা। যে জাতির সাহিত্য যত বেশি সমৃদ্ধ, সে জাতি তত উন্নত। কারণ, সাহিত্য জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। সাহিত্য একটি জাতির জীবনের কথা বলে। সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যই হচ্ছে একটি জাতির জীবনাচরণের দলিল। এটি কেবল একটি জাতির বর্তমান চিন্তা ভাবনাকেই প্রকাশ করে না; বরং এটি একটি জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। প্রত্যেক জাতির গড়ে ওঠা, তাদের প্রত্যাশা ও চাওয়া-পাওয়া ও তাদের বেড়ে ওঠার রূপায়ণের দায়িত্ব পড়ে সে জাতির কবি-সাহিত্যিকদের ওপর। তাঁরা নানাভাবে শিল্পসম্মত উপায়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সাহিত্য বলতে আমরা সমাজে মানুষের হাসি-কান্না, আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, বিভিন্ন রীতি-রেওয়াজ ইত্যাদির বাস্তব রূপকে জানি ও বুঝি। সাহিত্য যে দেশে যত বেশি শক্তিশালী সে জাতির জীবনবোধ তত গভীর। যে সকল কবি-সাহিত্যিক তাঁদের সময়ের সকল মানুষের মনের কথা শিল্পসম্মতভাবে লিখনির মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম তাঁরা যুগের কবি। আর যাঁরা গোটা মানবতাকে লিখনির মাধ্যমে জীবন চলার পথের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন তাঁরা শুধু যুগশ্রেষ্ঠ কবি নন; বরং তাঁরা যুগস্রষ্টাও। এ সমস্ত কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে ইরানের বিখ্যাত কবি শেখ সা'দী এক

জ্বলন্ত প্রতিভা। তিনি ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইরানের শিরাজ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্বলন্ত প্রতিভার আলোকচ্ছটায় আলোকিত হয়েছে ফারসি সাহিত্যজগৎ। তাঁর সৃজনশীল কাব্যপ্রতিভা শুধু ফারসি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি; বরং তাঁর সাহিত্যকর্ম বিশ্বসাহিত্য পরিমণ্ডলে এক গৌরবোজ্জ্বল আসনে সমাসীন হয়। তাঁরই চির অমর দু'টি গ্রন্থ হলো *গুলিস্তান* ও *বোস্তান*। এ *গুলিস্তান* গ্রন্থটি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের সমন্বয়ে রচিত একটি নৈতিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি ৬৫৬ হিজরি মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। এ গ্রন্থে একজন ফকির-মিসকিন ও দরবেশের জীবনাচরণ থেকে আরম্ভ করে একজন রাষ্ট্রনায়ক ও রাজা-বাদশাহ এর জীবনাচরণ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আকর্ষণীয় ঘটনাবলি বর্ণনার মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে চমৎকার উপস্থাপনায় কল্যাণকর উপদেশাবলি ব্যক্ত করা হয়েছে। এটি ফারসি সাহিত্যের মডেল গ্রন্থ হিসেবে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় সাহিত্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে ইরানি কবি-সাহিত্যিকদেরকে যুগ যুগ ধরে যেমন সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে আসছে, ঠিক তেমনিভাবে অপরদিকে বিশ্বের সাহিত্যমোদী পাঠকদের হৃদয় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে ও বিশ্বের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পঠিত হয়ে আসছে।

সভ্যতাসমূহের সংঘাত বা আদান-প্রদান : সংস্কৃতি, ধর্ম ও পরিচিতি চিন্তা

ড. শেখ মেহেদী হাসান

সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

হান্টিংটন 'সভ্যতাসমূহের সংঘাত' শীর্ষক যে বহুল আলোচিত তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন তাতে সভ্যতা বিনিময়ের সর্বাত্মক ভূমিকাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেন এবং সমগ্র মানব প্রজাতিকে সংঘাতে লিপ্ত দু'টি ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর এ তত্ত্বে এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন যে, ঔপনিবেশিকতা থেকেই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে– যে ঔপনিবেশিক পরিকল্পনাসমূহের মাধ্যমে ইউরোপীয়, বিশেষত বৃটিশ উপনিবেশসমূহের জনগণকে মানবেতর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় এবং পাশবিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে ন্যূনতম মানবিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। সুতরাং ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার– যা ইউরোপীয় সভ্যতার সমার্থক– এ অন্ধকার দিকটির প্রতি বিশ্বের সমকালীন সভ্যতাসমূহের প্রতি পর্যালোচনামূলক আলোকপাতের ভিত্তিতে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। মোট কথা, সভ্যতাসমূহের প্রতি ভারসাম্যমূলক দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন যাতে সভ্যতাসমূহের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, পার্থক্য ও 'অন্যের' উপস্থিতিকে পছন্দনীয় দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আন্তঃক্রিয়া ও সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক আদান-প্রদান ত্বরান্বিত হয়।

[ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ করে উপস্থাপন করা হলো]

আধুনিক ইসলামি সভ্যতার উৎস ও বিকাশ : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ হারুনুর রশীদ

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং সভ্যতা হচ্ছে সামাজিক মানুষের জীবন যাপনের ধরনের প্রতীক। প্রকৃতপক্ষে ইসলামি সভ্যতা কোরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূলের (সা.) অনুসরণে প্রদত্ত শিক্ষা থেকে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের ওপর ভিত্তিশীল। ইসলামের যাত্রা শুরু হয় হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সময় মক্কায় ও মদিনায় এবং পরে তা বনি উমাইয়্যা ও বনি আব্বাসের আমলে বিস্তার লাভ করে। ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে আরব সংস্কৃতিতে এবং পরে বিভিন্ন মনীষী ও প্রচারক তার বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কালের প্রবাহে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচার ব্যপদেশে মুসলমানদের বিভিন্ন দেশে গমনের ফলে এবং বিভিন্ন দেশের লোকদের সাথে তাঁদের মত বিনিময়ের মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই বর্তমানে মুসলিম জাহান হিসেবে পরিচিত ভূখণ্ডসমূহে ইসলামি আদর্শের দিকনির্দেশনার সাথে ইসলামি সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। বর্তমান মুসলিম জাহানের ইসলামি সভ্যতার এটাই পটভূমি।

[ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ করে উপস্থাপন করা হলো]

তাছাওওফ্ এবং ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতার গতিশীলতা বিধানে এর ভূমিকা : রোমান সালাজুক্বী যুগের তাছাওওফ্

শাহ্‌লা বাখ্‌তিয়ারী

আয্-যাহ্‌রা (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ইতিহাস বিভাগের সদস্য।

ও

মানীজ্বা কুদ্‌রাতী ভইক্বান্

আয্-যাহ্‌রা (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের ডক্টরেটের ছাত্রী

যদিও ইসলামে তাছাওওফের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে এবং অনেকে একে ইসলামি সভ্যতার অধঃপতনের কারণসমূহের অন্যতম হিসেবে গণ্য করেছেন, তা সত্ত্বেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এটা সুনিশ্চিত যে, ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতার রওনক্ব বিস্তারে ও এর আয়ুষ্কালের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে তাছাওওফের প্রভাবশালী ভূমিকার বিষয়টি অনস্বীকার্য।

বর্তমানে যেসব তথ্যসূত্র মওজূদ আছে তার ভিত্তিতে জানা যায় যে, সূচনাতে তাছ্ছাওওফের নীতিগত অবস্থান ছিল পুরোপুরি ইসলামানুগ এবং তা ছিল আল্লাহ্‌র কিতাব এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সুন্নাত ও আহ্‌লে বাইতের মা'ছুম ইমামগণের (আ.) শিক্ষার ওপর ভিত্তিশীল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ। বিশেষত রোমান সালাজূক্বী যুগের আনাতোলিয়ায় তাছ্ছাওওফ্ মানুষের মধ্যে অন্তঃক্রিয়ার ক্ষেত্রে এমন এক সামর্থ্য ও সম্ভাবনার অধিকারী ছিল যে, তার ফলে সেখানকার সামাজিক বিক্ষিপ্ততা রোধ করা সম্ভব হয়েছিল এবং ঐ ভূখণ্ডে ইসলামের প্রভাব বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। এ ধরনের সুফিবাদী আবেদনের ফলে সেখানকার বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে – যাদের মধ্যে বড় ধরনের অমিল ছিল – মিল ও সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে লোকদের মধ্যকার ভাষাগত ও গোত্রীয় ব্যবধান দূরীভূত হয়েছিল এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিভিন্ন শাখা ও দিগন্তের মাঝে সংযোগ প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে যেসব ঐতিহাসিক তথ্য ও দলিল-দস্তাভেয মওজূদ আছে তার ভিত্তিতে রোমান সালাজূক্বী আমলে আনাতোলিয়ায় ইসলামি সভ্যতার বিকাশ ও রওনক্ব বিস্তারে তাছ্ছাওওফের সমন্বয় সাধনকারী ভূমিকার ও তার প্রভাব বিস্তারের ধরনের প্রমাণ মিলে।

বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, রোমান সালাজূক্বী যুগে আনাতোলিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সুফিবাদী তরীকা, বিশেষত মাওলাভীয়াহ্, আওহাদীয়াহ্, ও বাখ্‌তাশীয়াহ্ তরীকা শাসকদের মোকাবিলায় জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিকারী নীতিগত অবস্থান গ্রহণ, সমাজের খেদমত, জাতি-গোষ্ঠীগত ও সাংস্কৃতিক বহুত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং আত্মিক ঐক্যর অনুভূতিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সে যুগের আনাতোলিয়ার জনগণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং ইসলামি সভ্যতায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল– যার ফলে খৃস্টান অধ্যুষিত পাশ্চাত্যে পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতার প্রভাব বিস্তার সম্ভবপর হয়েছিল।

[ফারসি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ করে উপস্থাপন করা হলো]

সাসানি সভ্যতার উত্তরাধিকার ইসলামি সভ্যতার কাছে হস্তান্তরে ও এর বিকাশে জুন্দী শাপুর্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

সাইয়্যেদ তাওফীক্ব হোসেইনী

আয্-যাহ্‌রা (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ইতিহাস বিভাগের সদস্য।

এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই যে, নতুন সভ্যতা বিনির্মাণে ও তার কাঠামোর বিকাশের ক্ষেত্রে পুরনো সভ্যতার ভিত্তি ও সাংস্কৃতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে যে, যে কোনো নতুন সভ্যতাই প্রাচীনতর সভ্যতার রয়ে যাওয়া ভিত্তির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। এ বিষয়টি বিশেষভাবে ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাচীন সভ্যতার রয়ে যাওয়া ভিত্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা থেকে ও ইসলামি যুগের ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য থেকে খুব ভালোভাবে ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামি যুগের প্রথম দিককার নব-উদ্ভূত ইসলামি সভ্যতার কাঠামো রোমান সভ্যতা ও সাসানি সভ্যতার প্রভাব নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে সভ্যতার এ উপাদানসমূহের হস্তান্তরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রসমূহের ভূমিকা। ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে জুন্দী শাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

প্রকৃতপক্ষে, পারস্য সাম্রাজ্যের সাসানি শাসনামলের শেষের দিকে জুন্দী শাপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রাচীনকালীন বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রসমূহের অন্যতম যেখানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে তৎকালীন অনেক শীর্ষস্থানীয় মনীষী গড়ে উঠেছিলেন এবং এভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয় সাসানি যুগের দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিষয়ক অর্জনসমূহ ইসলামি সভ্যতার নিকট হস্তান্তর করেছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী এ মনীষীদের মধ্যে সুরিয়ানি বংশসমূহের মনীষিগণ ছিলেন অন্যতম যাঁরা কয়েক প্রজন্ম ধরে ইরানিদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফসলকে ইসলামি দুনিয়ার নিকট হস্তান্তর করে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে যেসব সুরিয়ানি বংশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁদের মধ্যে বাখ্‌তিশু', হুনাইন্ ও মাস্‌ভীয়াহ্ বংশ অন্যতম। এসব বংশের মনীষিগণ যে কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে ইসলামি জাহানের খেদমত করেন তা নয়; বরং তাঁরা গ্রীক গ্রন্থাবলি অনুবাদ ও তা বিস্তারের মাধ্যমেও বিজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ করে তোলার মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দেন। এছাড়া তাঁদের দ্বারা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রীক গ্রন্থাবলির অনুবাদ ও প্রসারের ফলে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাবলি অনুবাদের আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে–যা ছিল ইসলামি সভ্যতার যুগের ব্যাপক বিকশিত বিষয়াবলির অন্যতম–বিরাট সহায়তা হয়।

জুন্দী শাপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও এ বিশ্ববিদ্যলয় থেকে গড়ে ওঠা সুরিয়ানি মনীষিগণ কোন্ পদ্ধতিতে ইসলামি সভ্যতার বিকাশে ও সাসানি যুগের সভ্যতার অর্জনসমূহ ইসলামি সভ্যতার নিকট হস্তান্তরে ভূমিকা পালন করেন সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে এ উপসংহারে উপনীত হতে হয় যে, জুন্দী শাপুর বিশ্ববিদ্যলয়ের মনীষিগণ ও সেখানকার শিক্ষার্থিগণ শুধু যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার অর্জনসমূহের বিস্তার সাধনের মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতায় বৈজ্ঞানিক রওনক্ব প্রদানে সাহায্য করেন তা নয়; বরং বিশেষ ধরনের বৈজ্ঞানিক ও চৈন্তিক আবেদনের বিস্তার সাধনের মাধ্যমেও ইসলামি সভ্যতার রওনক্ব বিস্তারে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেন।

[ফারসি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ করে উপস্থাপন করা হলো]

সভ্যতা বিকাশে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা

ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের অভ্যুদয় মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বিপ্লব হিসেবে পরিচিত। ইসলামকে কেন্দ্র করেই সভ্যতার ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে এক নবতর অধ্যায়। ইসলামি সভ্যতাকেই আধুনিক বিশ্বসভ্যতার পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মানবতার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে ইসলামি সভ্যতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশ্বসভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ ও উন্নতিতে একমাত্র ইসলামের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। এগুলোর অন্যতম হলো- ব্যক্তির উন্নয়ন, মানবতার বিকাশ, নৈতিকতার জাগরণ, বৈষয়িক কলা-কৌশল, আবিষ্কার ও প্রয়োগবিদ্যা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ। ইসলামের সোনালি যুগে বিশ্বসভ্যতা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রসায়ন, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অবদান এক গৌরবময় ঐতিহ্যের ইতিহাস গড়ে তুলেছে। সভ্যতা বিকাশে ইসলাম তথা মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে অধ্যাপক হিট্টি বলেছেন, 'অষ্টম শতকের মাঝামাঝি হতে ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত আরবি ভাষাভাষী লোকেরা (মুসলিম) সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান আলোর দিশারী ছিলেন। তাদের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শন এমনিভাবে পুনর্জীবিত, সংযোজিত ও সম্প্রসারিত হয়েছিল, যার ফলে পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁর উন্মেষ সম্ভবপর হয়। এ সময়ে মুসলিম পণ্ডিতদের সৃজনশীল মেধা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক অনন্য সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটন করে। তাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছিল।' সভ্যতা বিকাশের অন্যতম হাতিয়ার হলো শিক্ষা। ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের সর্বপ্রথম বাণী হলো : 'পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' শিক্ষার প্রতি ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করে থাকে। পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে শিক্ষার অনুপ্রেরণা পেয়ে মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এবং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিস্তারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মুসলিমগণ সমগ্র বিশ্বের আলোকবর্তিকারূপে আবির্ভূত হয়। শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারে নবি (সা.), চার খলিফা, উমাইয়্যা ও আব্বাসি খলিফাদের অবদান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যে সকল মুসলিম মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন- উমাইয়্যা যুগের মাসার যাওয়াহ, আবু হাশেম, খালেদ বিন ইয়াযিদ, আব্বাসি যুগের আলী ইবনে আব্বাস, ইবনে সিনা, ইবনে দুহর, ইবনে রুশ্‌দ, ওমর বিন খলদুন, মাশা আল্লাহ, সেন্দা বিন আলী, ইয়াহিয়া বিন মনসূর, আবূ মাসার, জোতির্বিদ আবূ জাফর মুহাম্মাদ বিন মূসা, খাওয়ারিজমী, আবুল ওয়াদা, আল-বিরুনি ও কবি ওমর খৈয়াম প্রমুখ।

আয়াতুল্লাহ্ নাঈনী ও আয়াতুল্লাহ্ ত্বালেক্বানীর দৃষ্টিতে মুসলমানদের পতনের কারণ

হুজ্জাতুল্লাহ্ জাভানী
সহযোগী অধ্যাপক, ধর্ম ও তাছাওওফ্ বিভাগ
আয্-যাহ্‌রা বিশ্ববিদ্যালয় (সালামুল্লাহি 'আলাইহা), ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, মুসলমানদের পতন সম্পর্কিত আলোচনা সাম্প্রতিক শতাব্দীতে মুসলিম চিন্তাবিদ ও সংস্কারকগণের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। সর্বপ্রথম সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন আসাদাবাদী[২] ইসলামি সভ্যতার পতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তিনি মুসলিম জাহানের উপনিবেশে পরিণত হওয়াকে এর কারণ হিসেবে গণ্য করেন। দৃশ্যত মনে হয় যে, ইসলামি সভ্যতার পতনের কারণ সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদগণ ও সংস্কারকগণের সকলে অভিন্ন মত পোষণ করেন না। আয়াতুল্লাহ্ নাঈনী মুসলিম একনায়ক ও স্বৈরাচারী শাসকদেরকে মুসলমানদের পতনের মূল কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর আয়াতুল্লাহ্ ত্বালেক্বানী ইসলামের ভুল শিক্ষা ও একনায়ক শাসকদের শাসনকে এ জন্য দায়ী করেন।

[ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ করে উপস্থাপন করা হলো]

সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলামি সাহিত্যের ভূমিকা: সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত

হুসাইন সুলতান মোহাম্মাদী
মুফিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটের ছাত্র

সভ্যতা একটি সামাজিক বিষয় এবং তা এর পিছনে লুক্কায়িত চিন্তাসমূহের ফসল। সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য সভ্যতা সৃষ্টিকারী চিন্তাধারার অস্তিত্ব শুধু জরুরিই নয়; বরং অপরিহার্য। ইসলামি চিন্তাধারার মূল মর্মে সভ্যতা বিনির্মাণকারী ভূমিকা নিহিত আছে, নাকি নেই? এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে, যেহেতু প্রকৃত ইসলাম সুউচ্চ পর্যায়ের সক্ষমতার অধিকারী সেহেতু ইসলাম প্রতিটি যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম। আর অতীতে ইসলাম তার এ সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা এ ক্ষেত্রে ইসলামের যেসব সভ্যতা বিনির্মাণকারী উপাদান ও রচনার সাক্ষাৎ পাই তার মধ্যে রয়েছে : বুদ্ধিবৃত্তিক ('আক্বলী), বিশ্বজনীন, সুবিচারকামী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তারমুখী, সমাজমুখী, মানবতাবাদী ও চরিত্র গঠনকারী রচনাবলি।

[ফারসি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ করে উপস্থাপন করা হলো]

১ ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলোর সার-সংক্ষেপগুলো অনুবাদ করেছেন জনাব নূর হোসেন মজিদী।

২ যিনি বাংলাভাষীদের নিকট সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন আফগানী নামে পরিচিত।

বই পরিচিতি

বইয়ের নাম : হৃদয়ের যে রক্ত হলো চুনিরত্ন [ইসলামি বিপ্লবের আন্দোলনের দিনগুলোতে কারবরণ ও নির্বাসিত জীবন সম্পর্কে হযরত আয়াতুল্লাহ আল-উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (মুদ্দাজিল্লুহু)-এর স্মৃতিকথা]

সংকলন : মোহাম্মাদ আলী অযারশাব

বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলাম বালী

সম্পাদনা : ড. এম আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

তত্ত্বাবধান : ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত কালচারাল কাউন্সেলর

প্রকাশনা : রিয়াজ খান, রোদেলা প্রকাশনী

প্রকাশকাল : ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

১৯৮৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মহান স্থপতি ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর অন্তর্ধানের পর ইসলামি আন্দোলনের আরেক পুরোধা ব্যক্তিত্ব হযরত আয়াতুল্লাহ আল-উযমা খামেনেয়ী এই বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন যা তিনি এখনো পালন করে যাচ্ছেন। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিপ্লবপূর্ব দিনগুলোতে নিজের কারাবরণ, নির্যাতন ও নির্বাসিত জীবনের বর্ণনা দিতে আরবি ভাষায় লিখেছেন 'ইন্না মায়াসসাবরু নাসরা' নামক বই যেটি লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই স্মৃতিকথা আয়াতুল্লাহ আল-উযমা খামেনেয়ী আরব যুবকদের প্রতি উৎসর্গ করেছেন।

ইসলামি বিপ্লবের চল্লিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইরানে বইটির ফারসি অনুবাদ 'খুনে দেলি কে লা'ল শোদ' নামে প্রকাশিত হয় এবং চলতি বছর ইসলামি বিপ্লবের বিয়াল্লিশতম বিজয় বার্ষিকী উপলক্ষে এই বইটি বাংলাদেশস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে 'হৃদয়ের যে রক্ত হলো চুনিরত্ন' নামে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রকাশিত হলো।

এ বইয়ে ইসলামি আন্দোলনের দিনগুলোতে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী হোসেইনী খামেনেয়ীর কারাভোগ ও নির্বাসিত জীবনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই মূল্যবান গ্রন্থে এই মহান নেতার জীবনের এমন এক সময়কার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় তৎপরতা চিত্রায়িত হয়েছে যে যুগে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো ইরানও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ইরানের ইসলামি বিপ্লব এমন সব জনগোষ্ঠীকে জাগিয়ে তুলেছিল যারা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল এবং এমন সব অন্তরকে উজ্জীবিত করেছিল যেসব অন্তর রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিল।

ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাসের সেই সময়কার স্মৃতিকথা নিঃসন্দেহে শাহ সরকারের অত্যাচার-নিপীড়নের ব্যাপারে এই মহান নেতার চিন্তাধারা এবং বিপ্লবপন্থীদের প্রতিরোধ ও বীরত্বগাথার সঙ্গে পরিচিত হতে সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের সাহায্য করবে। এই বইয়ের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে তখনকার যুগের সার্বিক ঘটনা তুলে ধরার পাশাপাশি শাহ সরকারের শাসনামলের অন্ধকার দিকগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বইয়ে হযরত আয়াতুল্লাহ উজমা খামেনেয়ীর ব্যক্তিত্ব ও জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, অধ্যবসায়, চারিত্রিক গুণাবলি, সহনশীলতা, সংগ্রাম, সাহসিকতা, জিহাদ, সাধারণ জীবনযাপন, ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা, ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, ইজতিহাদ, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের উন্নত গুণাবলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ১৫ অধ্যায়বিশিষ্ট এই মূল্যবান গ্রন্থে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার চিন্তাধারা, আধ্যাত্মিকতা ও সংগ্রামী জীবনের নানা দিক ফুটে উঠেছে। বইটি ইসলামি বিপ্লবী সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা (সর্বোচ্চ নেতার লেখা সংরক্ষণ ও প্রকাশবিষয়ক দপ্তর) সমন্বয় ও পুনর্বিন্যাস করেছে।

এই স্মৃতিকথার লেখক হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী হোসেইনী খামেনেয়ী ইসলামি বিপ্লবের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। ইমাম খোমেইনীর মতো তিনিও শাহ সরকার বিরোধী আন্দোলনের বছরগুলোতে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে নিজের বিপ্লবী তৎপরতাকে কেন্দ্রীভূত রেখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী তরুণদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তরুণ সমাজ যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করত সেসবের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার ছিল অনেক মিল। তরুণ সমাজের কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল সম্মান ও মানবীয় মর্যাদা, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর নির্ভরশীলতার অবসান ও তাগুতি শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই এবং আমেরিকা ও ইহুদিবাদী শত্রুকে অপমানিত করা। তরুণ সমাজ একটি স্বাধীন ও মর্যাদাবান ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার যে স্বপ্ন দেখত তাঁর চিন্তাধারায় সে স্বপ্নের প্রতিফলন দেখা যেত।

বন্দি জীবনে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের হুমকি-ধমকি ও নির্যাতনের সামনে সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় প্রদর্শন এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মতৃপ্তির গণ্ডি থেকে মুক্ত থাকা ছিল এই মহান নেতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জীবনের সুউচ্চ লক্ষ্য অর্জনে তিনি এতটা মনযোগী ছিলেন যে, একদিনের জন্যও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ বা মনের মূল্যহীন স্বাদগুলো পূরণের চেষ্টা করেননি।

তিনি এই বই রচনার বিশ বছর আগে থেকে দায়িত্বের গুরুভার ও প্রচণ্ড ব্যস্ততা সত্ত্বেও সাপ্তাহিক ক্লাসগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে আরবি ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন এবং আধুনিক আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন বই থেকে পাঠদান করে এসেছেন। এসব ক্লাসে কখনো কখনো তিনি নিজের কারাভোগ ও নির্বাসিত জীবন সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছেন যা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ।

এ ধরনের ক্লাসগুলোতে ছাত্ররা তাঁকে এই বিষয়গুলো বই আকারে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ করেন যাতে সর্বস্তরের পাঠক মহল তা থেকে উপকৃত হতে পারে। তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করেন এবং নিজের জীবনের ছোট ছোট কিছু ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে লিখতে শুরু করেন। যে বইটি এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাতে তাঁর বন্দিজীবনের ঘটনাবলিই কেবল বর্ণিত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, এই স্মৃতিকথা আরবি ভাষায় লিখিত হয়েছে; কাজেই সর্বপ্রথম আরবি ভাষাভাষী মানুষের হাতে এই বই পৌঁছেছে। আরবি ভাষার এই চর্চা থেকে পবিত্র কুরআনের ভাষার প্রতি লেখকের গভীর অনুরাগ ফুটে উঠেছে। সেইসঙ্গে তিনি মুসলমানদের মধ্যকার ভৌগোলিক, জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব না দিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এই ভাষার দক্ষতা ও শক্তি ফুটিয়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাস ও এর নেতা সম্পর্কে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকথায় এমন কিছু খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে যা সমসাময়িক ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের চাহিদা মেটাবে। পাশাপাশি যাঁরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছেন তাঁদের জন্য এই বই বিভিন্ন বিষয়ে এমন কিছু অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে যা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, এই পথে দুঃসাধ্য কষ্ট ও অবর্ণনীয় দুর্দশা সত্ত্বেও যদি সংকল্প দৃঢ় ও একনিষ্ঠ হয় তাহলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। বইয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা যেকোনো পাঠকের জন্য হবে উপভোগ্য ও উপকারী।

বাংলাদেশে ইরান স্টাডিজ : একটি পর্যালোচনা

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ফেব্রুয়ারি আমাদের মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাস। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা তাঁদের ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে গিয়ে অকাতরে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন; তারই ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছিলাম মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার ও মর্যাদা। এ বছর ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম দশকেই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'বাংলাদেশে ইরান স্টাডিজের অবস্থান' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বৃহত্তর পরিসরে ইরান স্টাডিজ বিষয়ে এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমিক আয়োজনের মূল অনুঘটক ছিলেন ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ঢাকাস্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মান্যবর কালচারাল কাউন্সেলর ড. হাসান সেহাত।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ৪২তম ইসলামি বিপ্লবের বিজয় বার্ষিকী ও নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এ গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনারের আয়োজন করে; যাতে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাস, ইরানের বুনিয়াদে ইরানশেনাসি, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের ইরানশেনাসির শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে ইরানশেনাসির শিক্ষার্জন ও শিক্ষাদানের ইতিহাস দীর্ঘদিনের হলেও এ ওয়েবিনারের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলতে গেলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইরানশেনাসির উপর অনুষ্ঠিত এ ওয়েবিনার বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট অঙ্গনে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে; যা থেকে উপকৃত ও লাভবান হবে বর্তমান ও অনাগত শিক্ষার্থী ও গবেষকরা।

বস্তুত বাংলাদেশ হলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানশেনাসি শিক্ষার জন্য এক উর্বর ভূমি। বাংলা ভাষা বহু ফারসি শব্দ ধারণ করে শক্তিশালী ও গতিশীল হয়েছে। অনুরূপভাবে এতদঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ফারসি সাহিত্যের অনেক উপাদান গ্রহণ করে সমৃদ্ধ ও উপকৃত হয়েছে। প্রায় দশ থেকে বার হাজার ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। একইভাবে বাঙালি কবিদের উপর ফারসি কবিদের অবিশ্বাস্য প্রভাব রয়েছে। তাই আমরা বলি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের রয়েছে ব্যাপক অবদান। এতদ্ব্যতীত বাংলা ও ফারসির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধন বঙ্গীয় অঞ্চলে হাজার বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে এবং এর মাধ্যমে ইরানশেনাসির অধ্যয়ন ও চর্চা ক্রমশ বেগবান হচ্ছে।

বাংলাদেশে মোটাদাগে দুই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। একটি সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা আর অন্যটি ধর্মীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানশেনাসি এতদুভয় পদ্ধতির শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই পড়ানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহ এবং দ্বিতীয়ত, দেশের সরকারি শিক্ষা-ব্যবস্থায়; যেমন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। আমরা বলতে পারি, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ফারসি ও ইরানশেনাসির রয়েছে এক অনবদ্য ঐতিহ্য; যা আমাদের জন্য খুবই গৌরবের। সেটি হলো, দেশের সর্বপ্রাচীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানশেনাসির অধ্যয়ন ও চর্চা। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয় তার শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে। ১৯২১ সালের ১ জুলাই যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করে তখন থেকেই ফারসি বিভাগ ছিল; যাতে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ফারসি ও ইরানশেনাসি পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগে উর্দুর প্রাধান্য চলে আসে। কিন্তু বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে আবারো ফারসি ও ইরানশেনাসির পুরনো ঐতিহ্য ফিরে আসতে থাকে এবং ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লব বিজয়ের পর থেকে ইরানের ঢাকাস্থ দূতাবাস ও কালচারাল সেন্টারের সর্বাত্মক সহযোগিতায় সর্বোতভাবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানশেনাসির চর্চা, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক নবজোয়ার প্রবহমাণ থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়; যা ফারসি ভাষা ও ইরানশেনাসির মাতৃপ্রতিম দেশ ইরানের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। সেদিক বিবেচনায় আমরা বলতে পারি, এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, উচ্চশিক্ষায় ফারসি ও ইরানশেনাসির যাত্রা খোদ ইরানের আগেই আমাদের এই বাংলায় শুরু হয়েছিল!

বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানশেনাসি বিষয়ে বিএ, এমএ, এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের তিনটি সরকারি আলিয়া যথাক্রমে মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও বগুড়া সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য রয়েছে এবং বেসরকারি কওমি মাদ্রাসায়ও ফারসি এবং ইরানশেনাসির উপর কতিপয় বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের

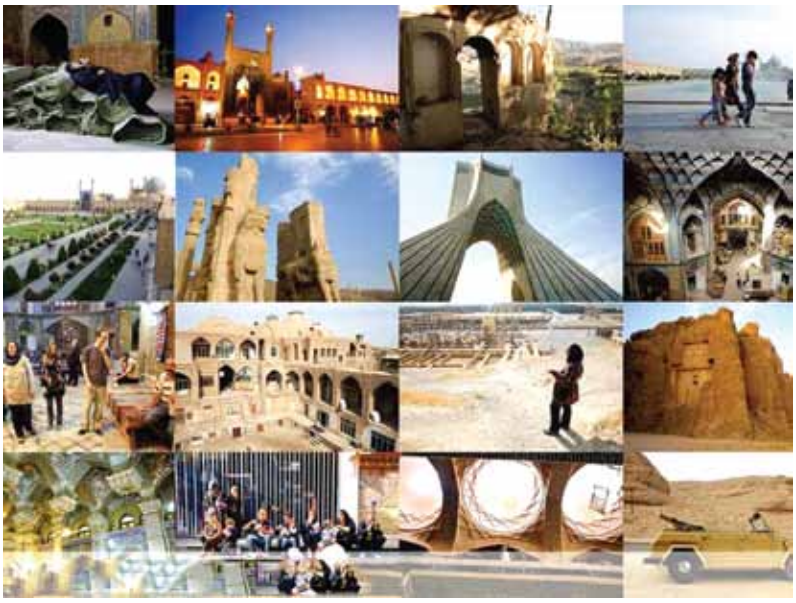

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটেও ফারসি ভাষা কোর্স চালু আছে; যেগুলোতে অল্প-বিস্তর ইরানশেনাসি সম্বন্ধে ধারণা লাভের সুযোগ রয়েছে। এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানশেনাসি বিষয়ে বর্তমানে পড়াশোনা ও গবেষণাকর্মে নিয়োজিত আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশসহ গোটা পৃথিবীতে করোনা মহামারি চলছে। গত ৪ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে দেশের সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সরকারিভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়; আজ পর্যন্ত সেগুলো খোলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুদিন আমরা করোনা পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। এসময় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে মে এবং জুন মাস হতে আমরা অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম শুরু করি আর এভাবেই করোনা মহামারিতে দেশের ফারসি পরিবারও যথারীতি তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

দেশব্যাপী চলমান মহামারিতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানশেনাসির শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকরা তাঁদের অ্যাকাডেমিক জীবন সচল রাখতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকেন। এক্ষেত্রে আমাদের ছাত্র-শিক্ষকদের সামনে অনেক সমস্যা এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আমরা সেগুলোর সমাধানে সাধ্যমতো আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। এমতাবস্থায় ইরানশেনাসির উপরে আয়োজিত এ ওয়েবিনার থেকে আমরা ইরানি কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরেছি, যাতে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকবৃন্দ কিছুটা হলেও প্রণোদনা পেয়ে নতুন উদ্দীপনায় মনযোগী হতে পারেন।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ফারসি ভাষা ও সাহিত্য পরিবারের জন্য মাতৃপ্রতিম দেশ। একইভাবে জ্ঞানচর্চা, মেধার বিকাশ ও সংস্কৃতির লালনের ক্ষেত্রেও ইরান আমাদের সুযোগ্য অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক। আমাদের দেশে যে কোনো কারণে ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির শিক্ষা বিপদাপন্ন হলে ইরান আমাদের পাশে থাকবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। অতীতে সবসময়ই আমরা ইরানের কাছ থেকে গবেষণা ও শিক্ষা-বিষয়ক সহযোগিতা পেয়েছি, এজন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞ। বর্তমানে

করোনা মহামারিতে আমাদের ফারসি ও ইরানশেনাসির শিক্ষার্থীরা অনেকটাই বিপদগ্রস্ত, এক্ষেত্রেও ইরানি জাতি আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবে; এটা আমাদের বিশ্বাস। আমাদের দেশে ইরান কালচারাল সেন্টার ও দূতাবাস রয়েছে এবং যোগ্য ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গ সেখানে তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রতিও আমাদের দৃঢ় আস্থা রয়েছে, বিপদসঙ্কুল এ পরিস্থিতিতে মহান ইরানি জাতির পক্ষ থেকে তাঁরা বরাবরের মতোই আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী ও গবেষকদের পাশে থাকবেন।

এ পর্যায়ে আমি বাংলাদেশে ইরানশেনাসি শিক্ষাদানের এক সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের কথা বলতে চাই। এটি শুরু হয়েছে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর ড. হাসান সেহাতের মাধ্যমে। ড. সেহাত মূলত বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী একজন আলোকিত ও জ্ঞানী মানুষ। তিনি বছরখানেক পূর্বে হোয়াটস আপ-এ একটি গ্রুপ সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে নিয়মিত ইরানশেনাসি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করে চলেছেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি খুবই সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী। প্রতিটি ক্লাসে তাঁর বর্ণনাভঙ্গি, তথ্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও কণ্ঠের যাদুময়ীতা আমাদের সত্যিই মুগ্ধ করে। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মনীষীদের বাণীর সমন্বয়ে প্রতিটি ক্লাসে তাঁর উপস্থাপনা খুবই শ্রুতিমধুর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়ে থাকে। ইরানশেনাসির ছাত্র, শিক্ষক, ইরানপ্রেমী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহীদের তিনি একই মোহনায় একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশে ইরানশেনাসির এক অভূতপূর্ব ও বিরাট খেদমত সম্পন্ন করে চলেছেন। ড. সেহাতের জন্য আমাদের আন্তরিক দোয়া ও নিরন্তর শুভকামনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে একটি 'ইরান স্টাডিজ' রুম রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, এটি বর্তমানে ব্যবহারের উপযোগী নয়। আমি এই সুযোগে ইরানি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব, 'ইরান স্টাডিজ' রুমের প্রতি তাঁরা সদয় দৃষ্টি দেবেন। আমরা নতুন উদ্যমে এ 'ইরান স্টাডিজ' রুম থেকে ইরানশেনাসির অধ্যয়ন ও চর্চাকে অধিকতর বেগবান করে তুলতে চাই এবং এটিকে বাংলাদেশে ইরানশেনাসির জন্য সত্যিকার অর্থে একটি অনুকরণীয় মারকায হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

বাংলাদেশে ইরানশেনাসির শিক্ষার্জন ও শিক্ষাদান আরো বিকশিত হোক। এ বিকাশের পথে অন্তরায় যা কিছু আছে সেগুলোর নিরসন করা এবং প্রয়োজনীয় অ্যাকাডেমিক ও আর্থিক সহায়তা বরাদ্দ করা সময়ের দাবি। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

বাংলাদেশ-ইরান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হোক, ইরানশেনাসির শিক্ষা ও গবেষণা স্থায়িত্ব লাভ করুক (আমিন)।

লেখক : চেয়ারম্যান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্মরণীয় দিবস

১ জানুয়ারি : ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.) ১৯৮৯ সালের এ দিনে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের কাছে এক ঐতিহাসিক চিঠি প্রদান করেন।

১০ জানুয়ারি : মীর্যা তাকী খান আমীর কাবীর এর শাহাদাত বার্ষিকী।

১২ জানুয়ারি : ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর নির্দেশে ইসলামি বিপ্লবী পরিষদ গঠন দিবস এর বার্ষিকী।

১৭ জানুয়ারি : নবীকন্যা হযরত ফাতেমা (আ.) এর ওফাত বার্ষিকী (একটি রেওয়ায়াত অনুযায়ী)

* ১৯৭৯ সালের এ দিনে ইরান থেকে রেযা শাহ পাহলভী পলায়ন করেন।

* নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর ৯২তম মৃত্যুবার্ষিকী।

২৬ জানুয়ারি : বাংলা ভাষার সনেট কাব্যের জনক ও 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মবার্ষিকী।

২৯ জানুয়ারি : আততায়ীর গুলিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী নিহত হন।

১ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ ১৫ বছর নির্বাসনে থাকার পর ইসলামি বিপ্লব বিজয়ের প্রাক্কালে এ দিনে বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেইনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

৩ ফেব্রুয়ারি : নবীকন্যা হযরত ফাতেমা (আ.)-এর পবিত্র জন্মদিবস। বিশ্ব নারী ও মা দিবস।

* ইরানে বিমান বাহিনী দিবস।

১১ ফেব্রুয়ারি : ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিপ্লবের বিজয়বার্ষিকী। ইরানে আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের পতন।

১৪ ফেব্রুয়ারি : মহানবী (সা.), অন্যান্য নবী (আ.) এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি করার দায়ে ১৯৮৯ সালের এ দিনে ইমাম খোমেইনী সালমান রুশদীর মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া প্রদান করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি : নবীবংশের ১০ম ইমাম আলী নাকী (আ.)-এর শাহাদাত দিবস।

২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এ দিনে বাংলা ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জাব্বার, শফিকসহ বেশ কয়েকজন বাঙালি তরুণ।

২২ ফেব্রুয়ারি : নবীবংশের নবম ইমাম তাকী (আ.)-এর পবিত্র জন্মদিবস।

২৪ ফেব্রুয়ারি : খাজা নাসিরউদ্দিন তূসী স্মরণে দিবস। এটি ইরানে প্রকৌশল দিবস হিসেবেও উদযাপিত হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি : আমীরুল মুমিনীন ইমাম আলী (আ.)-এর পবিত্র জন্মদিবস।

২৮ ফেব্রুয়ারি : মহানবী (সা.)-এর নাতনী হযরত যায়নাব (আ.)-এর ওফাতবার্ষিকী।

৯ মার্চ : বিশ্বনন্দিত ইসলামি ব্যক্তিত্ব জামালুদ্দিন আফগানী (আসাদাবাদী) স্মরণে দিবস।

১০ মার্চ : নবীবংশের সপ্তম ইমাম মূসা কাযিম (আ.)-এর শাহাদাত দিবস।

১২ মার্চ : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দিবস।

* ইরানে ইসলামি বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেইনীর নির্দেশে এই দিনে শহীদ-পরিবারের কল্যাণে শহীদকল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়।

১৫ মার্চ : ইরানের সমকালীন বিখ্যাত কবি পারভীন এহতেসামী স্মরণে দিবস।

১৯ মার্চ : নবীবংশের চতুর্থ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর পবিত্র জন্মদিবস।

২১ মার্চ : নওরোয। ইরানি বর্ষ ১৩৯৬ এর শুরু।

২২ মার্চ : বিশ্ব পানি দিবস।

২৩ মার্চ : বিশ্ব আবহাওয়া দিবস।

২৬ মার্চ : বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস।

১ এপ্রিল : ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র দিবস। এ দিনে ৯৮ শতাংশ জনগণের ভোটের মধ্য দিয়ে ইরান ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২ এপ্রিল : বিশ্ব প্রকৃতি বা পরিবেশ দিবস।

৭ এপ্রিল : বিশ্ব স্বাস্থ্য সচেতনতা দিবস।

৯ এপ্রিল : পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনে ইরানের জাতীয় দিবস।

১৪ এপ্রিল : ১লা রমযান।

* পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ।

* ইরানি মরমি কবি ও দার্শনিক আত্তার নিশাবুরী স্মরণে দিবস।

১৮ এপ্রিল : ইরানের সশস্ত্রবাহিনী ও সেনাবাহিনী দিবস।

২১ এপ্রিল : বিশ্ববিখ্যাত কবি শেখ সাদী স্মরণে দিবস।

২২ এপ্রিল : ইসলামি বিপ্লবের পর সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘোষণা দিবস।

২৩ এপ্রিল : বিখ্যাত কালামশাস্ত্রবিদ শেখ বাহায়ী স্মরণে দিবস।

* ইরানে বিপ্লবী গার্ডবাহিনী প্রতিষ্ঠ দিবস।

২৩ এপ্রিল : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদীজা (সা. আ.)-এর ওফাত দিবস।

২৩-২৭ এপ্রিল : আন্তর্জাতিক সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ।

২৮ এপ্রিল : মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হাসান (আ.)-এর পবিত্র জন্ম দিবস।

২৫ এপ্রিল : ১৯৮০ সালের এই দিনে ইরানের তাবাস মরুভূমিতে আমেরিকার কমান্ডো বাহিনী অনুপ্রবেশ করে, কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরতে বিমানগুলো মরুঝড়ে বিধ্বস্ত হয়।

৩০ এপ্রিল : পারস্যোপসাগর দিবস।

১ মে : মে দিবস।

২ মে : ইমাম আলী (আ.)-এর আঘাত প্রাপ্তির দিন। এদিনে আলী (আ.) অভিশপ্ত ইবনে মুলজিম কর্তৃক মাথায় তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত হন।

৪ মে : ইমাম আলী (আ.)-এর শাহাদাত দিবস।

৬ মে : লাইলাতুল কদর (আহলে বাইতের সূত্র অনুযায়ী)।

৭ মে : জুমআতুল বিদা। বিশ্ব আল-কুদ্স দিবস।

১০ মে : লাইলাতুল কদর (আহলে সুন্নাতের সূত্র অনুযায়ী)।

১৪ মে : ঈদুল ফিত্র।

২২ মে : প্রখ্যাত দার্শনিক মোল্লা সাদরা স্মরণে দিবস।

২৫ মে : (১১ জ্যৈষ্ঠ) বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী।

২৮ মে : আহলে বাইতের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-এর শাহাদাত দিবস।

৪ জুন : ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা ও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী এবং আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর নেতৃত্ব (রাহবারি) শুরু হয়।

১০ জুন : ইরানে হস্তশিল্প দিবস হিসেবে পালিত হয়।

১৯ জুন : আধুনিক ইরানের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ড. আলী শরীয়তী ১৩১২ ফারসি সালে খোরাসান শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

২১ জুন : ইরানের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মোস্তফা চামরানের শাহাদাত দিবস।

২৬ জুন : আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ ও মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ দিবস।

২৮ জুন : আয়াতুল্লাহ বেহেশতীসহ ইসলামি বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় আরো ৭২ ব্যক্তির শাহাদাত দিবস। বিপ্লববিরোধী মুজাহেদীনে খাল্ক কর্তৃক বোমা হামলায় তাঁরা শহীদ হন।

শিশু-কিশোরদের জন্য

মহান আল্লাহর পরিচয়

গোলাম রেযা হায়দারী আবহুরী
অনুবাদ : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

বান্দাদের কর্তব্য

‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ‘ইবাদত কর.....।’ –সূরা বাকারাহ্, আয়াত নং ২১

আল্লাহর সামনে আমাদের মানুষদের কর্তব্য কী?

এ প্রশ্নের সবচেয়ে উত্তম উত্তর হলো সূরা বাকারার ২১ নং আয়াত। ঐ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে : ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।’

আল্লাহর সম্মুখে মানুষের কর্তব্য কী– এ আয়াতে সংক্ষেপে তা বলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে আমাদের কর্তব্য হল ইবাদত-বন্দেগি করা। অবশ্য আল্লাহর বন্দেগির মানে শুধু নামায পড়া ও দোয়া করা নয়। তুমি আল্লাহর যে কথাটাই মেনে চলবে সেটাই হবে একটি বন্দেগি। যখন সকালে তুমি ঘুম থেকে উঠবে এবং পরিবারের প্রত্যেককে সালাম দেবে, যখন তোমার প্রিয় সহপাঠীদের প্রতি মিষ্টি হেসে কথা বলবে, যখন কাউকে কিছু জিনিস শিখিয়ে দেবে, যখন জ্ঞান অর্জনের জন্য তুমি কষ্ট স্বীকার করবে, তখন এ সবগুলো কাজেই তুমি আল্লাহর বন্দেগিতে নিয়োজিত রয়েছ। হ্যাঁ, ইবাদত মানে শুধু নামায পড়া ও রোযা রাখা নয়। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাণী অনুসারে এমনকি পিতামাতার দিকে আমাদের সদয় দৃষ্টিপাতও ইবাদত বলে গণ্য হয়। তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে, ইবাদতের সীমানা কতই না বিস্তৃত!

আল্লাহর সামনে আমাদের কর্তব্য হলো এটা যে, তাঁর সব কথা আমরা মেনে চলব। তিনি আমাদের কর্তব্যকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। আসলে আল্লাহ পবিত্র কুরআনকে তো এজন্যই নাযিল করেছেন, যাতে আমরা আমাদের কর্তব্যগুলো ভালোভাবে জেনে নিতে পারি।

তুমি পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি পাতা খুললেই আল্লাহর কয়েকটি উপকারী উপদেশ এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেখতে পাবে। মানুষের উচিত হলো এসব উপদেশ ও নির্দেশ মেনে চলা।

তুমি যদি ‘সূরা হুজুরাত’ খোল তা হলে দেখবে যে, মহান আল্লাহ বলছেন : ‘তোমরা একে অন্যের গীবত কর না।’

যদি ‘সূরা বাকারাহ্’ খোল তা হলে দেখবে যে, মহান আল্লাহ বলছেন : ‘মানুষদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বল।’

যদি ‘সূরা আ‘রাফ’ খোল তা হলে দেখবে মহান আল্লাহ বলছেন : ‘তোমরা খাও ও পান কর, তবে অপচয় কর না।’

‘সূরা নূর’ যদি খোল তা হলে দেখবে এ আয়াত সেখানে রয়েছে : ‘নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করে চল।’

‘সূরা লোকমান’ এর মধ্যে দেখতে পাবে যে, এ মহাপুরুষের ভাষ্য থেকে বলা হয়েছে : ‘মানুষদের থেকে অবজ্ঞা করে মুখ ঘুরিয়ে নিও না।’

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, মহান আল্লাহ আমাদের সকলের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর পরে আর কেউ কিয়ামতের দিনে অজুহাত দেখাতে পারবে না যে, আমি জানতাম না কী কাজ করা আমার কর্তব্য ছিল?

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (সা. আ.)

সরকার ওয়াসি আহমেদ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মহান আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে সত্যধর্মের পথে আহ্বান করা শুরু করেন। কাফির-মুশরিকরা তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। এমন অবস্থায় রাসূলের পুত্রসন্তানরা মারা গেলে তারা রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করতে থাকে। আস ইবনে ওয়ায়েল রাসূলকে 'আবতার' (লেজকাটা) বা 'নির্বংশ' বলে গালি দেয়। সে বলত, 'আরে মুহাম্মাদের তো কোনো পুত্রসন্তান নেই, সে মরে গেলে তার নাম নেয়ার মতোও কেউ থাকবে না।' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথায় খুব কষ্ট পেতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর এ কষ্ট দূর করার জন্য যে অমূল্য নেয়ামত তাঁকে দান করেন তিনিই হলেন হযরত ফাতিমা (আ.)। তিনি মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পাঁচ বছর পর ২০ জমাদিউস সানী পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মগ্রহণের প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনের সূরা কাওসার নাযিল হয়।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, হযরত ফাতিমার শানে এ সূরা নাযিল হয়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, অনেক অত্যাচার সত্ত্বেও হযরত ফাতিমার বংশধারা পৃথিবীতে টিকে আছে, অন্যদিকে বনু উমাইয়্যা ধ্বংস হয়ে গেছে।

হযরত ফাতিমার মর্যাদা

পবিত্র কুরআনের কয়েকখানা আয়াতে হযরত ফাতিমার মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : একটি আয়াতে তাঁকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পোষ্য উমার ইবনে আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘরে নবী (সা.)-এর ওপর এ আয়াত নাযিল হয় : হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে (সূরা আহযাব : ৩৩), তখন নবী (সা.) ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনকে ডাকেন এবং তাঁদেরকে একখানা চাদরে ঢেকে নেন। আলী তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি তাঁকেও চাদরে ঢেকে নেন। অতঃপর বলেন : হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত। অতএব, তুমি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং তাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র কর। তখন উম্মে সালামা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন, তুমি স্বস্থানে আছ এবং তুমি কল্যাণের মধ্যেই আছ।– বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৭২৫

সূরা আলে ইমরানের ৬১ নম্বর আয়াত অনুযায়ী (আয়াতে মোবাহিলায়) হযরত ফাতিমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষী করেছেন। পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতটি হলো : "অতঃপর তোমার নিকট যখন জ্ঞান আমার পর যে কেউ এই বিষয়ে তোমার সংগে তর্ক করে, তাকে বলো, আসো আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারিগণকে ও তোমাদের নারিগণকে আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে; অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর সেই আল্লাহর লানত।"

ঘটনাটি এরূপ : নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের সাথে যখন মোবাহিলা (পারস্পরিক অভিশাপ বর্ষণ) করার জন্য মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি হযরত ফাতিমা, হযরত আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনকে সাথে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কুরআনে বর্ণিত পুত্রদের স্থানে তিনি নিজের দুই নাতি ইমাম হাসান ও হুসাইনকে, নারীদের স্থানে নিজ কন্যা হযরত ফাতিমাকে এবং নিজেদের স্থানে হযরত আলীকে নিলেন এবং দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! প্রত্যেক নবীর আহলে বাইত থাকে, এরা আমার আহলে বাইত। এদের সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত ও পাক-পবিত্র রেখ।' তিনি এভাবে ময়দানে পৌঁছলে খ্রিস্টানদের নেতা আকব তা দেখে বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি এমন নূরানী চেহারা দেখছি যে, যদি এ পাহাড়কে নিজ স্থান হতে সরে যেতে বলেন, তবে অবশ্যই সরে যাবে। সুতরাং মুবাহিলা হতে হাত গুটিয়ে নেওয়াই কল্যাণকর, অন্যথায় কিয়ামত অবধি খ্রিস্টানদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।' পরিশেষে তারা জিযিয়া কর দিতে সম্মত হলো। (তাফসীরে জালালাইন, ১ম খণ্ড, পৃ.৬০; বায়যাভী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮, তাফসীরে দুররুল মানসুর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯, মিশর মুদ্রণ) এভাবে হযরত ফাতিমা তাঁর পিতার নবুওয়াতের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও হযরত ফাতিমার মর্যাদা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। যেমন : তিনি বলেন : 'চারজন নারী সমগ্র নারী জাতির মধ্যে সর্বোত্তম : মারইয়াম বিনতে ইমরান, আছিয়া বিনতে মুযাহিম, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ফাতিমা।'– যাখায়েরুল উকবা, পৃ. ৪৪

বুখারী শরীফের একখানা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেন : 'ফাতিমা আমার অস্তিত্বের অংশ। যে তাকে রাগান্বিত করে সে আমাকে রাগান্বিত করে।'– বুখারী, কিতাবুল বাদাউল খাল্‌ক

হযরত ফাতিমার শৈশবকাল

ধর্ম প্রচারের কারণে রাসূলের ওপর কুরাইশরা নানাভাবে নির্যাতন শুরু করে। এভাবে হযরত ফাতিমার দুই বছর অতিক্রান্ত হয়। হযরত ফাতিমার জন্মের মাত্র দুই বছর পর তাঁরা সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় পড়েন। বনু হাশিমের সাথে কুরাইশরা সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়। তখন বনু হাশিমের নেতা ছিলেন হযরত আবু তালিব। তিনি বনু হাশিমকে নিয়ে শেবে আবি তালিবে (আবু তালিবের গিরিগুহা) আশ্রয় নেন।

দিনের পর দিন তাঁদেরকে না খেয়ে থাকতে হতো। এতে মহিলাদের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। সন্তানরা দুধ না পেয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে যেত। হযরত ফাতিমা শিশু বয়সেই এমন এক অবস্থার মধ্যে পড়েন। দীর্ঘ তিন বছর তাঁরা এ অবস্থার মধ্যে কাটান। অবশেষে তিন বছর পর তাঁরা এ অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এতো কষ্ট সহ্য করার পর সেই বছরই হযরত ফাতিমার প্রাণপ্রিয় মা হযরত খাদিজা ইন্তেকাল করেন। যে বয়সে তাঁর মাতৃস্নেহের প্রয়োজন, যে বয়সে তাঁর লালিত-পালিত হওয়ার কথা, সে বয়সেই তাঁর ওপর রাসূলের দেখাশুনার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ। তিনি রাসূলকে মায়ের মতোই যত্ন করতেন, তাঁর দিকে খেয়াল রাখতেন। শুধু ঘরের মধ্যে নয়, ঘরের বাইরেও তিনি রাসূলের বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। অন্যান্য শিশুর মতো তিনি খেলাধুলা করতেন না। সেই ছোট বেলাতেই তিনি একজন দায়িত্বশীল নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যখনই তিনি জেনেছেন যে, কাফির-মুশরিকরা রাসূলকে নির্যাতন করছে, তখনই তিনি সেখানে ছুটে গেছেন এবং পিতাকে উদ্ধার করে এনেছেন। একবার আবু জেহেল ও তার সঙ্গীরা রাসূলের সিজদাবনত অবস্থায় মাথার ওপর উটের নাড়িভূঁড়ি চাপিয়ে দেয়। যখন হযরত ফাতিমা এ ঘটনার কথা শোনেন তখনই তিনি দৌড়ে সেখানে চলে যান এবং পিতার মাথার ওপর থেকে সেগুলো সরিয়ে ফেলেন। তিনি আবু জেহেলকে এজন্য তিরস্কার করতে থাকেন।

তিনি রাসূলের প্রতি এতটাই যত্নশীল ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে 'উম্মু আবিহা' (তার পিতার মা) বলে আখ্যায়িত করেন।– উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২০

বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত ফাতিমার সাথে হযরত আলীর বিয়ে হয়। তাঁর বিয়ের বিষয়ে ইতিহাসে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তাঁর মর্যাদা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। অনেক খ্যাতনামা সাহাবী হযরত ফাতিমাকে বিয়ে করার জন্য রাসূলের কাছে প্রস্তাব দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের কারও প্রস্তাবই গ্রহণ করেননি। তিনি হযরত ফাতিমার সম্মতি নিয়ে হযরত আলীর সাথে বিয়ে দেন।

সন্তানদের প্রতিপালন

হযরত ফাতিমার বিয়ের দুই বছরের মধ্যেই ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী নিশ্চিন্তে হযরত ফাতিমার ওপর সন্তান লালন-পালনের ভার দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বেরিয়ে পড়তেন হয়ত কোনো সফরে, না হয় কোনো যুদ্ধে। আর হযরত ফাতিমা একাকী দুই সন্তানকে গড়ে তোলেন 'বেহেশতের যুবকদের নেতা' রূপে।

হযরত ফাতিমার জীবনযাপন

হযরত ফাতিমা খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি নিজের হাতে করতেন। তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য কোন দাস-দাসী ছিল না। মশক দিয়ে পানি উত্তোলনের ফলে তাঁর শরীরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি যাঁতার মাধ্যমে এত পরিমাণ আটা তৈরি করতেন যে, তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। আর তিনি সেই আটা দিয়ে রুটি তৈরি করে মদীনার দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করতেন। হযরত ফাতিমা কাপড়ে তালি লাগিয়ে সেই কাপড় পরিধান করতেন। পার্থিব কোনো বস্তুই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারত না। আর এজন্যই রাসূল (সা.) তাঁকে 'বাতুল' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

হযরত ফাতিমার ইবাদাত-বন্দেগি

যখন রাত্রিতে চারিদিকে নিস্তব্ধতা নেমে আসত, সকলেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত, তখন হযরত ফাতিমা নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদাত-বন্দেগিতে মগ্ন হতেন। তিনি সারারাত জেগে নামায পড়তেন, মহান আল্লাহ্‌র যিকির করতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতের জন্য দো'আ করতেন। তিনি এত বেশি নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত।

ইমাম হাসান (আ.) বলেন, 'আমার আম্মা বছরের অধিকাংশ দিন নফল রোযা রাখতেন আর রাত্রির অধিকাংশ সময়ই তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'হাত তুলে দো'আ করে এমনভাবে কান্নাকাটি করতেন যে, চোখের পানিতে বুক ভিজে যেত।' সংসারের কাজ করার সময়ও তাঁর মুখে আল্লাহ্‌র যিকির থাকত।

হযরত ফাতিমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) অপরিসীম ভালবাসতেন। তিনি তাঁকে কতটা ভালোবাসতেন তা তাঁর কথায় বারবার প্রকাশিত হয়েছে। হযরত ফাতিমার তাকওয়া, তাঁর দুনিয়াবিমুখতা, তাঁর দায়িত্বশীলতা সব মিলিয়ে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর যে অবস্থান সে কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ভালবাসতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে হযরত ফাতিমা আগমন করলে তিনি তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানাতেন। আলেমগণ এ বিষয়ে যথার্থই বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ ছিল 'খাতুনে জান্নাত– বেহেশতের নারীদের নেত্রী'র প্রতি মহান আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন।

পথিক ও ঘোড়সওয়ার

মূল : মাহ্‌দী অযার ইয়াযদী

অনেক দিন আগের কথা। এক কাপড় ব্যবসায়ী নিজের গ্রামের মানুষের মধ্যে কাপড় বিক্রয় করতো। প্রতিদিনের কিছু অংশে এক বার শহর থেকে বিভিন্ন ধরনের কাপড় কিনে গ্রামের চতুর্দিকে ঘুরে সেগুলো বিক্রি করে পুনরায় শহরে আসতো।

একদিন ব্যবসায়ী কাপড় বিক্রয়ের জন্য দূরে ঘুরতে গিয়েছিলো। এক গ্রাম থেকে মাইল খানিক দূরে অন্য একটা গ্রামে গেলো। সে গ্রাম থেকে বের হতেই এক বনের মধ্যে পৌঁছলো। হঠাৎ এক ঘোড়সওয়ারকে সে রাস্তায় আস্তে আস্তে যেতে দেখলো। ব্যবসায়ীর কাপড়ের বস্তা তার কাঁধে ছিলো বলে সে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। তাই তাকে আস্তে আস্তে যেতে দেখে বললো : 'জনাব, আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। আমার এই পুটলি কাঁধে পাথরের মতো ভারি লাগছে। যেহেতু আমরা দুই জন একই রাস্তায় যাচ্ছি আর আমি আপনার সাথে হেঁটেই যেতে পারব, সেহেতু সম্ভব হলে এই বস্তাটাকে আধা ঘণ্টা ঘোড়ার উপর আপনার সামনে রাখেন। এতে আমার ক্লান্তি কিছুটা দূর হবে। আপনার মতো যুবকের জন্য আনন্দের সাথে দোয়া করবো।'

সওয়ারি উত্তর দিলো : 'জানি না কীভাবে কথাটা বলবো। এটা তোমার অধিকার। আগন্তুককে সাহায্য করা পছন্দনীয় কাজ, এতে সওয়াবও আছে। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, কাল আমার ঘোড়ার যত্ন নেওয়া হয় নি। খড় ও যব তার প্রতিদিনের খাবার, সেটাও খাওয়ানো হয় নি। এই জন্য রাস্তায় চলাচলের শক্তি তার নেই। তার উপর বোঝা চাপানো অন্যায় হবে। এতে খোদা হয়তো অখুশি হবেন, আমি এ ভয় পাচ্ছি।'

ব্যবসায়ী বলল : 'ঠিক আছে, এটা আপনার অধিকার।'

সে আর কোনো কথা না বলে কয়েক কদম পেছনে গেলো। হঠাৎ এক কাঁটার ঝোঁপ থেকে একটা খরগোশ বের হয়ে দৌড় দিয়ে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে বসলো। ঘোড়সওয়ার খরগোশকে দেখে ঘোড়াকে চাবুক মেরে খরগোশের পেছনে দৌড়াতে শুরু করলো। খরগোশ আবার দৌড় দিলো। সে সামনে এবং ঘোড়সওয়ার তার পেছনে। অবশেষে সে কাপড় বিক্রেতার থেকে দুই মাঠ পরিমাণ দূরে চলে গেলো।

কাপড় বিক্রেতা যখন ঘোড়াকে দৌড়াতে দেখল তখন চিন্তা করলো : 'সওয়ারি আমার পুটলি না নিয়ে ভালোই করেছে। নইলে তখন তার ঘোড়াকে দৌড় দেওয়াতে চাইলে আমি তার সাথে হেঁটে যেতে পারতাম না। আর আমার পুটলি নিয়ে পালালে তাকে ধরতেও পারতাম না।'

অন্যদিকে ঘোড়সওয়ার কিছুদূর যাওয়ার পর নিজে নিজে ভাবল : 'আমার ঘোড়া এত ভালো যে, কোনো সওয়ারি তার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। ব্যবসায়ীর ভারী বস্তাটা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলে ভালোই হতো...'

সওয়ারি এই চিন্তা করে ঘোড়াকে ঘুরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসলো। বস্ত্র বিক্রেতার কাছে পৌঁছে বললো : 'আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে, তোমাকে একা রেখে খরগোশ ধরার জন্য গিয়েছিলাম। সেটাও কপালে ছিল না, পেলাম না। সত্যিই গ্রাম পর্যন্ত যেতে এখনও অনেক পথ বাকি। আমার মন একা যেতে সায় দিল না। খোদাও খুশি হবেন না যে, তুমি ক্লান্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছ আর আমি ঘোড়ায় চড়ে আছি, তবুও তোমাকে সাহায্য করছি না। এখন তোমার কাপড়ের বস্তাটা আমাকে দাও। তোমার জন্য বয়ে নিয়ে যাব, এতে তুমি ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাবে। ঘোড়াও গ্রামে পৌঁছার এই পথটুকুর জন্য ভারীতে মরে যাবে না। বাড়িতে পৌঁছে যব খেলে তার দেহ থেকে ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।'

ব্যবসায়ী বললো : 'আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আমি সাহায্য চেয়ে ভুল করেছিলাম। খরগোশ আর ঘোড়ার দৌড়ানো থেকে একটা শিক্ষা পেয়েছি যে, নিজের বোঝা অবশ্যই নিজের কাঁধে বহন করা উচিত। এতে কিছুটা ক্লান্ত হলেও বিপদের ভয় থাকে না।'

[আব্দুর রউফ সালাফী, মো. মেহেদী হাসান, উম্মে সাদিয়া ও মো. ইকবাল হোসেন কর্তৃক অনূদিত *পারস্যের ঘুম পাড়ানোর গল্প* গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

জোনাকপোকার আলো

বিএম বরকতউল্লাহ

আমার মায়ের চোখের আলো কে নিয়েছে কেড়ে
অন্ধ মায়ের চোখের আলো ফিরিয়ে দিবে কে রে?
পূর্ণিমা চাঁদ দিলে না ভাই তোমার কিছু আলো;
সুয্যি মামা রোদের কণা দিলেই হতো ভালো।

কেউ দিলো না কেউ দিলো না ফিরে এলাম শেষে,
অন্ধকারে জোনাকপোকা উঠলো তখন হেসে।
ছুটে গেলাম বনের ধারে জোনাকপোকার কাছে
আলোর পিদিম জ্বেলে পোকা উঠল গিয়ে গাছে।

ভাইটি আমার একটু আলো দিবি আমার মাকে?
দেখ না চেয়ে অন্ধ মা-টি ঘরের কোণায় থাকে।
চোখের আলো দিলে আমায় দেখতো পরাণ ভরে
দিবিরে ভাই একটু আলো যাই নিয়ে আজ ঘরে।

আমার হাতে একটু আলো দিলো জোনাকপোকা
সেই আলোতে দৃষ্টি পেয়ে ডাক দিলো মা, খোকা।
ছুটে গেলাম মায়ের কাছে দেখলো আমায় চেয়ে
জোনাকপোকার আলোতে মা'র ভুবন গেল ছেয়ে!

করিম আলীর তিনটি ছেলে

মিতুল সাইফ

করিম আলীর তিনটি ছেলে
অশিক্ষিত দুই
একটা করে লেখা-পড়া
দুইটা চষে ভূঁই।

ভূঁই চষে আর টাকা পাঠায়
ঢাকায় পড়ে ভাই।
গৌরবে সে করিম আলীর
কষ্ট বুকে নাই।

শিক্ষিত সে ছেলে আলীর
এম এ করে পাশ,
কমি আলীর বুকের সাথে
আনন্দ একরাস।

www.iranmirrorbd.com

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েব সাইট

দেখুন ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েব সাইট www.iranmirrorbd.com। এতে রয়েছে বাংলায় ডাবিংকৃত ইরানি চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি, ইরানের শিল্প, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসহ নানা তথ্য। তাছাড়া থাকছে ফারসি ভাষা শিক্ষা, পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইসলামি দর্শনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমূহ। কাজেই আর দেরি না করে ভিজিট করুন এই ওয়েব সাইট। ওয়েবসাইট সম্পর্কে মতামত জানাতে যোগাযোগ করুন info@iranmirrorbd.com এই ঠিকানায়।

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচালিত কোর্সসমূহ

ফারসি ভাষা শিক্ষা কোর্স

কোর্সের নাম : জুনিয়র, সিনিয়র, ডিপ্লোমা
মেয়াদ : ৬ মাস (প্রতিটি কোর্স ৩ মাস করে ২টি পর্বে বিভক্ত)

ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং ডেভলপমেন্ট কোর্স (আরবি বাংলা ক্যালিগ্রাফি)

মেয়াদ : ৬ মাস
প্রথম দুই মাস : বাঁশের কলমে বর্ণমালা পরিচিতি; দ্বিতীয় দুই মাস: ডাবল পেন্সিলে ক্যালিগ্রাফি কম্পোজিশন; তৃতীয় দুই মাস : ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং
কোর্সের শিক্ষণীয় বিষয় : ওয়াটার কালার অন পেপার, ক্যালিগ্রাফি এক্রেলিক কালার অন ক্যানভাস, ক্যালিগ্রাফি অয়েল কালার অন ক্যানভাস।

ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি কোর্স

১. **ট্রাভেল ফটোগ্রাফি,** মেয়াদ : দুই মাস (৪৮ ঘণ্টা);
২. **ফটোগ্রাফারদের জন্য ফটোশপ,** মেয়াদ : দুই মাস (৩৬ ঘণ্টা);
৩. **ডিজিটাল ফিল্মমেকিং,** মেয়াদ : দুই মাস (৪৮ ঘণ্টা);
৪. **স্ক্রিনপ্লে রাইটিং,** মেয়াদ : দুই মাস (৪৮ ঘণ্টা)।

স্থান : ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
বাড়ি # ১৭, সড়ক # ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
যোগাযোগ: ৯৬১১৯৮৭, ৯৬১১৮৬৪, ওয়েবসাইট: iranmirrorbd.com

রেডিও তেহরান

আইআরআইবি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ইরান।

Website: parstoday.com/bn Email:radiotehran@ws.irib.ir Tel:+98-21-22013764

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার (আইআরআইবি) বিশ্ব কার্যক্রমের অধীনে বাংলা অনুষ্ঠানের সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৮২ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে। আর রেডিও তেহরানের অনলাইন সংস্করণ পার্সটুডে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে মূলধারার গণমাধ্যম হিসেবে কাজ শুরু করে।

অনুষ্ঠান সূচি

অধিবেশনের শুরুতে বাংলা অনুবাদসহ কুরআন তেলাওয়াত। এরপর বিশ্বের সর্বশেষ খবরাখবর নিয়ে পরিবেশিত হয় বিশ্বসংবাদ। এতে থাকে ঢাকা ও কোলকাতা থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্ট। এরপর সংবাদভাষ্যের অনুষ্ঠান দৃষ্টিপাতে দুটি প্রতিবেদন প্রচার হয়। দৃষ্টিপাতের পর নিচের তালিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

শনিবার	ইরান ভ্রমণ	কথা-বার্তা	ইরান-ইরাক যুদ্ধের ইতিহাস
রোববার	পারস্যের প্রতিভা বিশ্বের গর্ব	কথা-বার্তা	প্রাচ্যবিদদের চোখে মহানবী (সা.)
সোমবার	চিঠিপত্রের আসর প্রিয়জন	কথা-বার্তা	জীবনশৈলী
মঙ্গলবার	দর্পন	কথা-বার্তা	ইরানি পণ্য-সামগ্রী
বুধবার	স্বাস্থ্যকথা	কথা-বার্তা	কুরআনের আলো
বৃহস্পতিবার	রংধনু আসর	কথা-বার্তা	
শুক্রবার	চিঠিপত্রের আসর প্রিয়জন	কথা-বার্তা	আলাপন (সাক্ষাৎকার)

* বিশেষ দিবস উপলক্ষে নিয়মিত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

ফ্রিকুয়েন্সি

সান্ধ্য অধিবেশন	৩১ মিটার ব্যান্ডে	৯৮১০ কিলোহার্টসে (বাংলাদেশ ও ভারতে)
সান্ধ্য অধিবেশন	৩১ মিটার ব্যান্ডে	৯৪৬৫ কিলোহার্টসে (সৌদি আরবে)
নৈশ অধিবেশন	৪১ মিটার ব্যান্ডে	৭৩০৫ কিলোহার্টসে (বাংলাদেশ ও ভারতে)

প্রচার সময়

ইউটিসি সময়	সান্ধ্য অধিবেশন	১৪:২০-১৫:২০	নৈশ অধিবেশন	১৬:২০-১৬:৫০
বাংলাদেশ সময়	সান্ধ্য অধিবেশন	২০:২৩-২১:২৩	নৈশ অধিবেশন	২২:২৩-২২:৫৩
ভারত সময়	সান্ধ্য অধিবেশন	১৯:৫৩-২০:৫৩	নৈশ অধিবেশন	২১:৫৩-২২:২৩
সৌদি আরব সময়	সান্ধ্য অধিবেশন	১৭:২৩-১৮:২৩	পুনঃপ্রচার	০৩:৫০-৪-৫০

* আমাদের অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাদ্‌র-৫ স্যাটেলাইটেও প্রচারিত হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

www.facebook.com/groups/radiotehran	www.facebook.com/RadioTehranBN
www.instagram.com/parstodaybangla	twitter.com/RadioTehranBN

চিঠি লেখার ঠিকানা

ইরান	বাংলাদেশ	ভারত
Bangla Program Radio Tehran Post Box No- 6767-19395 Tehran, Iran	বাংলা অনুষ্ঠান রেডিও তেহরান জি. পি. ও বক্স নম্বর : ৪০০২ ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ	Bangla Program Radio Tehran Post Box no : 4222 New Delhi :110048, India